সন্ধ্যার জ্যোৎস্না সকালের রোদ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ

৩ মাঘ ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : আর. মল্লিক। সাহিত্যতীর্থ ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট কলিকাতা-৬

মুদ্রক : তুলসীচরণ বক্সী। ন্যাশানাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস ৩৩ডি মদন মিত্র লেন কলিক

শ্রদ্ধেয়া সুলেখিকা
শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী
অগ্রজপ্রতিমাসু

রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের

উপন্যাসের বই

প্রথম ফাল্গুন

সন্ধ্যার জ্যোৎস্না সকালের রোদ

ছোটগল্পের বই

শাল্মলী

কাব্যনাটিকা ও নৃত্যনাট্যের বই

যুদ্ধজিজ্ঞাসা সুভদ্রা ও মিনি

কবিতার বই

মিষ্টিমন

আকাশপিপাসা

ললিতলাবণ্য

পুষ্পিত প্রকাশ ও আরো আঘ্রাণ

সন্ধ্যার জ্যোৎস্না সকালের রোদ

আসন্ন সন্ধ্যায় আকাশ ভরা অসংখ্য তারার জোনাকি ফুটবে—ঝিলমিলে নীলাভ আলোর বুঝি দেওয়ালীর উৎসব আসন্ন—হঠাৎ সেই নীল আকাশের পূবের দিকে হেসে ওঠে এক ফালি চাঁদ। মনের গভীর প্রান্তে হয়তো বেপথু স্বর সাহানা কি বেহাগ তখনই অনুরণিত হতে থাকবে।

কলকাতার অফিস ফেরত বাবুদের ভিড়ে ট্রামে বাসে বড় বেশি ঘেঁষাঘেঁষি তবু কারো কারো চোখের চাউনিতে এখনও তারার আলো আসে, চাঁদের হাসি বাঁধ না ভাঙ্‌লেও রঙ্‌ ধরায় যেমন মরা নদীতে বন্যা আসে কি না জানি-না তবে মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও জল একটু থাকে সীমিত হয়ে—মহাকালের গোস্পদে। হাজার বছরের যেন সহস্র স্রোতের স্তব্ধতা। সমস্ত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সে অতন্দ্র প্রহরী হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের এক কণামাত্র শিশিরে।

যেখানে জীবন একটি মাধুর্যের সৌন্দর্য-সম্ভোগে উদ্ভাসিত, সেই বোধিমূলে মানসলোকের রসবিহার ও রূপবিহার। জগতের তুচ্ছ সাংসারিকতার বন্ধন ও বেদনাকে উপেক্ষা করেই মানুষ মানসীর স্বপ্নবাসর রচনা করে অথবা বললে ভালো হয় কল্পনায় জাল বুনে যায় সুখসন্ধ্যার।

কলকাতার জীবনযাত্রায় হয়তো হাড়ভাঙা খাটুনির চাপে হৃদয়রাজ্য বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য বাধাপ্রাপ্ত ও বন্ধ্যা-প্রায় কিন্তু তারও চোখে ধূলি ছড়িয়ে অবশ্য যাঁরা চোখে ঠুলি দিয়ে থাকেন না, তাঁদের কেউ কেউ তলিয়ে যেতে পারেন কোনো এক কল্পরাজ্যের রত্নসাগরে। যদি পাকা ডুবুরি হন তিনিই তুলে আনবেন মুক্তো ভরা অজস্র শুক্তি—সেখানেই খুঁজে পাবেন আসল মুক্তি—মনের মুক্তি, দেহের মুক্তি।

তাঁরই তো এক আকাশ তারার মতো জীবনের নভলোকে মুক্তোর বেল-কুঁড়ি ঐশ্বর্যবিস্তার করবে অভিজ্ঞতার আর অভিনিবেশের কষ্টিপাথরে। সোনার আঁচড়ে আখর রচনা হয়ে যেতেও পারে বর্ণাঢ্যবিভায়।

ছুটন্ত ট্রাম বা বাসের বাইরে ঝুলন্ত অথবা মধ্যে দাঁড়ান্ত বা বসন্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে চমকে দেয় টিং টিং ঘণ্টা ধ্বনি—চলতে চলতে থামে, কিছু লোক ঠেলেঠুলে নামতে চায় আর কিছু লোক উঠতে চেষ্টা করে—এমনি একটা ঠেলাঠেলির টানা পোড়েন দিয়ে বোনা হয় যাত্রীর যাত্রারম্ভ আর যাত্রা বিরতির

পালায় আধুনিক কলকাতার যন্ত্রণাজটিল নাগরিক জামদানি জমিন। মহিলা-যাত্রিণীরাও ঠেলাঠেলিতে সমান অংশীদারী হতে বাধ্য হয়েছে। কারণ মহিলাদের সংরক্ষিত গাড়ি আর কটা?

হঠাৎ এরই মধ্যে দিয়ে জীবনস্রোত প্রবাহিত থাকতে থাকতে এবং থাকতে থাকবে, এবং একদিন হীরে পান্না আর চুনির জেল্লাও ফুটবে; যেমন সন্ধ্যার বুকে আসে শুক্লপক্ষের চাঁদ অজস্র জ্যোৎস্না নিয়ে। দুধ-ধোয়া জ্যোৎস্নায় পবিত্র পৃথিবী, হাসিখুসিতে ঝল্‌মলে পৃথিবী।

অমাবস্যার দিন-ফেলে-আসা মন। মনের দিগন্তে তাই রঙের ছোপ লাগা চাই, রঙিন জীবনের নেশাকে যৌবনের কালধর্মে উজ্জীবিত করতে। একটি ফুল তার মিষ্টিগন্ধ আর বর্ণসুষমায় মনের সমস্ত পাপড়ি মেলে ধরে সৌন্দর্যের আনন্দ-নিকেতনে। দর্শন ও ঘ্রাণের যৌথ সাহচর্যে উপলব্ধির উপকূলে মানসমাধুর্য রূপৈশ্বর্য চেতনায় ফিরে পাবে যৌবন জীবনের প্রকৃত চাঞ্চল্য।

—ঠিক হয়ে দাঁড়ান না।

কথাটা শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জলে যায়। বলে ওঠে ঝাঁঝালো স্বরে—ঠিক হয়ে নেই তো কি বেঠিক ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছি?

লোকটি খেঁকিয়ে ওঠায় সবাই হতবম্ব। তখন তার উত্তর হয়—ঠিক-বেঠিকের তর্ক নয়। স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে রয়েছি, আপনার বুট জুতোর দাবানিতে পায়ের পাতাটা যে প্রায় চেপ্‌টে যাবার অবস্থা। এটা কি আপনার ঠিক হয়ে দাঁড়ানো?

—অত যদি পা বাঁচিয়ে চলতে চান তো ট্যাক্সি করে যাতায়াত করা ভালো। ফোড়ন ছাড়েন অন্য যাত্রী।—তেজপাতা হয় নি তো?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হয়—সে পয়সা থাকলে স্যাণ্ডেল না পায়ে দিয়ে বুট জুতোই পায়ে দিয়ে চলা হতো, উপদেশ দেওয়া···

কথায় কথা বাড়ে।

কণ্ডাক্টার তারই মধ্যে এসে যায় টিকিট চাইতে। বুটের জুতোর পা একটু হালকা করে প্যাণ্টের পকেট থেকে পয়সার জন্যে মানিব্যাগ তুলতে হয় তাকে। সেই অবসরে স্যাণ্ডাল পায়ের ওপর চাপ কম হলে অন্যত্র পা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। প্যাণ্টের পকেটে হাত চালিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজিতেও মানিব্যাগ পাওয়া গেল না, বিষন্ন মুখ—সন্দেহের দৃষ্টি ছড়ালো চারপাশে—আসল কাজ যারা হাসিল করার তারা কখন কাজটি করেই চম্পট দিয়েছে। পয়সা দিতে না পেরে

বেশ লজ্জায় রয়েছে দেখে কণ্ডাক্টার বলে ফেলেছে—নিজের জিনিসপত্তর ঠিক করে নিয়ে দাঁড়াবেন তো—ঠেলাঠেলির মধ্যে যা ভেবেছি তাই।

আবার আরেক জনের কাছে টিকিট চাইতে তিনি ব্যাগ থেকে দশটাকার নোট তুলে ধরে। কণ্ডাক্টার তা নিতে অস্বীকার করে রূঢ়ভাবে বলে বসে—একশত টাকার নোট তুলে ধরবেন এবার সবাই। ভাঙানো দিবেন।

—ভাঙানো যে শেষ হয়ে গিয়েছে, দেখছি। দেখুন না যদি পরে দশটাকার ভাঙানো হয়। শেষ স্টপেজে নামবো।

—না না, সে সব মনে থাকবে না। এখনই দিবেন তো…

অন্য এক সহযাত্রী বলে—কিভাবে যাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হয় জানেন না। নিন পয়সা, দিন তো ওঁর টিকিট…

—না না, সে কি ?

কোনো কথা আর বলার অবসর না দিয়ে সহযাত্রী ভদ্রলোক দিয়ে দিলে কণ্ডাক্টারের হাতে পয়সা গুঁজে, সেও অম্লান বদনে টিকিট কেটে দেয়।

ভদ্রমহিলা লজ্জিতভাবে ভ্যানিটি ব্যাগে দশটাকার নোটটি ভাজ করে সযত্নে রাখলো।

হয় তো অনেকে মনে মনে বললেন—কত ঢঙ্ই জানো ? বেশ ভাড়া না দেওয়ার ফন্দিবাজি—কত ধরিবাজই না হয়েছে মেয়েরা।

আবার কেউ কেউ রসিক হাসিতে চোখ মুখ উজ্জ্বল করে ভদ্রলোকটির দিকে ফিরে চাইল—মন মজেছে নাকি ? এমনি প্রশ্ন ভরা চোখ তাঁদের।

শুধু দুচোখ ভরে দেখা নয়, পঞ্চেন্দ্রীয়ের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে পূর্ণ অবগাহন আবশ্যক।

আবশ্যক দর্পণে মনের মূর্তি বা প্রাণের প্রতিমাকে প্রত্যক্ষ করা।

ক্ষুদ্র একটি ঘটনার অঙ্কুর থেকে বৃহত্তর বৃক্ষের ভবিষ্যৎ কল্পনার যে দৃষ্টি প্রসারতার ছবিটি ধরা যায়, তা যেন বাস্তবে সম্ভাব্য বলে সামাজিক মানসিকতা আন্দাজ করে।

আন্দাজ করে, কি ঘটল থেকে কি ঘটতে পারে তারই কাল্পনিক চিত্রটুকু। যে চিত্র শুধু বর্ণাঢ্যই নয় অবর্ণনীয়ই, কারণ যদি প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ভদ্রলোক বেইজ্জতি কিছু ঘটনার সম্মুখীন হন—কিম্বা পেশাদারী অন্ধকার সমাজ-জীবনের ফাঁদে তলিয়ে যায়।

এমনি কত বিচিত্র চিন্তা।

এই বিচিত্র চিন্তায় ভরা মধ্যবিত্তের মনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। হঠাৎ যেন ঘুমের মানুষ স্বপ্নের মধ্যে রাজপুত্র হয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে বসে আকাশপথে বিহার জমায়।

তাই আসন্নসন্ধ্যার ট্রামের মধ্যে অফিস ফিরতি যাত্রীর ভিড়েও স্বৰ্ণ রায়ের চোখে রাত্রির আকাশ ভরা অসংখ্য তারার আলো ঝিল্‌মিল্ করে ওঠে নীলাভ জোনাকির মতো কিম্বা দেওয়ালী উৎসবের দীপাবলীর মতো।

বসুন না। সাদর আহ্বান আসে সুবর্ণের। মহিলা আসনে একজন মহিলা নেমে গিয়েছে, শূন্য স্থানে বসার আহ্বান আসে সুবর্ণের। সে সংকুচিত হয়। কারণ কিছুটা আগেই এই মহিলার জন্যে টিকিট কেটে দিয়েছে। টিকিট কেটে দেওয়াটা তেমন কিছু নয় কারণ মেয়েদের সহযাত্রী করে বিচরণ করলে পুরুষরাই পয়সা দেয়। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতি। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা মহিলার কাছে ভাঙ্গানো পয়সা না থাকায় দশ টাকার নোটই ভাঙ্গিয়ে ভাড়া দিতে চায় অথচ কণ্ডাক্টার দেবে না। এবং ভাড়া চাওয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছে মহিলার কাছে বার দুয়েক। এই পরিবেশে স্বর্ণ রায় তার ভাড়া দিয়ে দেয় কণ্ডাক্টারকে। সেই মহিলার মনের কৃতজ্ঞতা—পাশের সিট খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই আহ্বান জানায় বসার জন্যে।

সুবর্ণ বসেছে। কেউ কারো দিকে চাইছে না। চলন্ত গাড়ির ঝাঁকানিতে দুলতে দুলতে চলছে।

চলছে এবং দুলছে।

শুধুই গাড়ির চলনের সঙ্গে দেহটাই—না না, গাড়িশুদ্ধ যাত্রীরা ভাবছে উভয়ের মনও। দুলছে দেহ, দুলছে মন।

যাত্রীসাধারণ পরস্পর পরস্পরের দিকে স্বভাবতই মুখ চাওয়া-চাওয়ী করেন। কেউ বা ফিক্ করে হাসেন রসিক চোখে চেয়ে। খুব নিচু গলায় মন্তব্য হয় —নাটক জমে উঠছে।

গাড়ি স্টপেজে থামে।

নাটক জমে ওঠার আগেই যবনিকা পতন হয় যেন। হঠাৎ যাত্রীদের সব আশায় ছাই দিয়ে স্বর্ণ রায় নেমে যায়। সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, দেখেন ভদ্রলোক হেঁটে চলে যাচ্ছে পথে কোনো কিছু ভ্রুক্ষেপ না করে। গাড়ির ঘণ্টা বাজে টিং টিং। চলছে আবার। দুলছে গাড়িটা, যাত্রীরাও।

এখন আর পাশের জায়গায় স্মুবর্ণ রায় বসে নেই কাজেই গাড়ি দুলতে থাকুক, ভদ্রমহিলার আড়ষ্টতা নেই।

তবে বুকের ভেতরটায় কেমন যেন দোলা লাগছে। দোল খাচ্ছে সমস্ত শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী। হয় তো আয়ুষ্মতী হচ্ছে।

—হরিষে বিষাদ। বলে ওঠেন যাত্রীদের মধ্যে থেকে মৃদুকণ্ঠে একজন।

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'—অন্য একজনের কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

রসিক এক বৃদ্ধ-কণ্ঠের কথা ভেসে আসে—সবুরে মেওয়া ফলে। এযে পূর্বরাগ।

কথাটা লুফে নিয়ে তাঁর সঙ্গী অপর বৃদ্ধ বলে ফেললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু চোখা চোখী। কথা কোনো নয়।

শেষ গন্তব্য স্থলে অর্থাৎ টালিগঞ্জে গাড়ি থামতেই সেই মহিলা নেমেই চলতে লাগলো অত্যন্ত গর্বিত ভঙ্গিমায়। নিজেকে আজ সে বড়ই উজ্জল আলোয় দেখতে পেয়েছে। একজন নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ মনে ভাবছে। অবশ্য গাড়িতে বসে বেশই লজ্জা লজ্জা ভাব হচ্ছিল। তবে তার সঙ্গে মিশে ছিল একটা অপ্রকাশ্য রোমাঞ্চ—যা সহজে বলা যায় না অথচ অনুভব করা যায়। যা সঠিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না অথচ অনুরণিত হওয়া যায়।

তবু অন্তরে বোধ হয় যা, তারই যেন প্রকাশ চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা অরুণাভ দীপ্তি নিয়ে—যেন মনের তৃপ্তির ছবি।

আয়নায় মুখ দেখছে বাড়িতে ফিরেই।

দেখছে অন্যদিনের থেকে যেন নতুন করে নিজেকে চিনতে পারছে—কত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে নিজের চেহারাটা নিজেরই কাছে। দর্পণে দেহ দেখা শুধু তো নয় এযে মনের ছবি ফুটে উঠেছে আয়নার অবয়বে। হৃদয়-উদ্বেলিত এবং অন্তর-রোমাঞ্চিত, গর্ভকক্ষের আনন্দলীলা চঞ্চলিত লাবণ্যধারায় দেহকোষের পুষ্পিত প্রকাশ—দেখছে আর দেখছে; আঁচলটা বারবার বুকের ওপর ঢেকে দিচ্ছে তবু যেন জোড়াকুঁড়ির গর্বোদ্ধত বিকাশ বড় বেশি করে চোখে ধরা দিচ্ছে। ধরা দিয়েছে শাড়ির ঘেরে নিতম্বের নিটোল গড়নটুকু আর চোখের তারার ডাগর চাউনি। পাতলা ঠোঁটের গোলাপী আভা তো ফর্সা গালের হাসির টোলের মধ্যে মধুর রেখায় উদ্ভাসিত। কাঁধের ওপর এক ফালি আঁচল অথবা এলিয়ে-দেওয়া উড়ন্ত শাড়ি সবটাই কেমন আদরের মোহময় আপন

উপস্থিতির রোমাঞ্চ ছড়াচ্ছে। রসিক প্রাণের স্পর্শ পাবে কি ? একটা প্রতীক্ষা এবং তারই মধ্যে রয়েছে আপন দেহ-লালিত্যে মায়াবী ধনের গর্ব। দর্পণে দেহ নিয়ে ধরেছে সাজে গোজে যেমনভাবে পথের থেকে বাড়ি ঢুকেছে সেইভাবেই। অন্যদিন কি ক্লান্তি, এসেই পটপট করে ব্লাউজ খুলে শাড়ি পাল্টে ; গায়ে বেশ করে জলের প্রলেপ ঢেলে তবে নিশ্চিন্ত হয়।

আর আজ ? দর্শনে ক্ষণদৃষ্টিই—তন্ময় গভীর। সময়হারা !

—শর্মিলা, কই এখনো এলি না, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ?

হঠাৎ মায়ের ডাক শুনে চম্‌কে যায়। নিজের তন্ময় ভাব কাটিয়ে লজ্জাও কাটিয়ে বলে ওঠে শর্মিলা—এই যে মা যাই।

পাশের দরজা দিয়ে সে চলে আসে মায়ের কাছে—ব্লাউজ খুলে, শাড়ি পাল্টে, গায়ে বেশ করে জলের প্রলেপ ঢেলে ঠাণ্ডা দেহ নিয়ে আজ আর চা খাওয়ার সময় হল না। আয়নার সামনে যে অবয়ব ফুটে উঠেছিল নিজেরই মায়াবী মন্ত্রের বিমুগ্ধতায়! কোথা দিয়ে কোথায় যেন সময় বয়ে গেছে অনেকটা।

সময় তো শুধু এই সন্ধ্যার ক্ষণটিতেই নয়—সময় যে বয়ে গেছে শর্মিলার যৌবন জীবনেরও। ফুটন্ত কুঁড়ির প্রথম কদমফুল পেছনে ফেলা—ষোড়শী যুবতীকে চেনবার চেষ্টা করছিল কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ?

কিন্তু তাকে কি আর চিনতে পারবে সে যে অনেক পেছনে রয়েগিয়েছে—ঘূর্ণি ঝড়ে যৌবন লাফিয়ে চলেছে।

থাক সে সব ভাবনা। শর্মিলা মায়ের কাছে বসে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

মা প্রশ্ন করেন অনেকক্ষণ পরে। তার আগে থেকে লক্ষ্য করছেন আজ যেন শর্মিলা একটু অন্য ভাবভঙ্গি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। মেয়ের এই ভাবান্তর বড় একটা তো মায়ের চোখে ধরা যায় নি। মায়ের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে এমন একটা হয় না তেমন।

শর্মিলাও ভাবছে মা কেমন যেন মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন তার দিকে। শর্মিলার চোখে চোখ পড়তেই তিনি বলে ফেললেন—তোর কি কিছু বলার আছে আমায়, বল না, বাড়ি এসে পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছিস বলে মনে হচ্ছে।

—না গো মা, কি বলার থাকবে ? তোমার সবটাই কেমন যেন। আমার কিছু বলার মতো হলে তো তোমায় তখনই বলে ফেলব—তুমি জিজ্ঞেস করবে তবে বলবো, তার কি কখনো দরকার হয়েছে—কি যে বাজে প্রশ্ন কর !

মা কথা শুনে বলেন—মনে হল তাই বলেছি।

—মনে আবার কি হল ?

কথাটা বলে ফেলেই শর্মিলা নিজের মনে যেন ডুব দিতে যায়। ইস্ মায়ের কাছে তবে ধরা পড়েছে কিছু তার ভাবান্তর। হতেও পারে বা।

—দেখ, শর্মিলা, আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এতটুকু বয়েস থেকে তোকে এত বড়টি করেছি—আমি তোর মনের কথা বুঝতে পারবো না তো কি ওবাড়ির পিসিমা পারবে ?

—না না, মা আমি তো সে কথা বলছি না। তুমি ভুল বুঝো না আমায়।

—ভুল আমি বুঝি নি শর্মিলা, তুই ঠিক যা তাই বোঝ। আর সময় মতো বুঝে চলিস।

—তার মানে তুমি কি বলতে চাও কি ? একটু উত্তেজিত গলায় শর্মিলার কথা বলায় সে নিজেই লজ্জিত হয়ে যায়। মাও যেন বেশ অপ্রস্তুত বোধ করেন মেয়ের হঠাৎ এমনি কণ্ঠস্বরে। যাই হোক শর্মিলাই মানিয়ে নিয়ে বলে—তুমি কিছু ভেবো না। আমি এখনই আসছি তোমার কাছে বাড়ির কাপড়চোপড় পড়ে। কি সব বাজে বাজে কথায় কথা বাড়ানো হচ্ছে বলতো।

মাও মেয়ের কথায় সায় দিয়ে বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, গাহাত ধুয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আয়। আমি ততক্ষণ তরকারিটা চড়িয়ে দিই।

শর্মিলা নিজের ঘরে চলে আসে। আর আয়নার দিকে তাকায় না। সোজা বাড়িতে পড়বার কাপড়চোপড় নিয়ে গাহাত ধুতে চলে যায়। বেশ তৃপ্তি বোধ হয় গায়ে জল ঢালতে। হুড় হুড় করে জলের প্রলেপ দিয়ে ঠাণ্ডা হয়, জলে জলে ঝলমল করে ওঠে শরীর।

মা একবার এরই মধ্যে মেয়ের ঘরের দিকে এসেছিলেন কি একটা খুঁজতে। তাঁর কানে বেশ স্পষ্ট প্রবেশ করেছে গানের কলি এবং তা মেয়ে শর্মিলার কণ্ঠের। স্নানের ঘরে গাইছে—'ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।'

মা মনে মনে বলে উঠলেন—শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়। ঠিক মনের ঘ্রাণ মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে। মায়ের চোখ বেঠিক হবার নয়—লজ্জা কিসের, কি জানি ?

বেশিক্ষণ স্নানঘরের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে মা পাড়লেন না। ছেলেটির ফেরবার সময় হল। কোচিং ক্লাস থেকে ফিরবে। মা তাঁর রান্নার জায়গায় চলে এলেন। মনের মধ্যে আর কোনো সন্দেহই রইল না। গান

তো শর্মিলা স্নানের ঘরে ঢুকে আজ পর্যন্ত গেয়েছে বলে মনেই আসে না। সংশয়ও হয়, আশাও জাগে ; ভালো মন্দ সব রকমের চিন্তাই মায়ের মনে হয়।

মন না মতি। মা আর ভাববেন না, ভাববেন না করেও রান্নার ঘরের মধ্যে কাজ করেন আর সাত পাঁচ ভাবনা নিয়ে জাল বুনতে থাকেন। যেন পেছনের দিনগুলোর কথাও মনে আসে। মনে এসে যায় নিজের জীবনের কথা। একান্তই গোপন অথচ গভীর বেদনার রাঙা রসে মনের মধ্যে টক্‌বগ করছে। শুধু যা নিয়ে মা মনে মনে জাবর কেটে যেতে পারেন। কাকেও বলার নয়, কারো শোনার নয়—কি বেদনার, কি উদ্‌বেগের, শুধু উদ্বেজিত করে মাকে যখনই সে সব কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে।

শর্মিলা বাড়ির লাল পেড়ে সাদা জমির কাপড় পড়ে সুস্নাতা হয়ে মায়ের কাছে রান্না ঘরে এতক্ষণে এসে গিয়েছে। মায়ের ভাবনা সিকেয় তুলে রাখতে হয়। শর্মিলা বলে—মা, সুশোভন এখনও কোচিং ক্লাস থেকে আসে নি ? আজ এত দেরি কেন ? সাড়ে আটটা তো বাজে।

মা সামলে নিয়ে বলে ওঠেন—ও তো সাড়ে আটটার পরই রোজ আসে। এখনও সময় উতরিয়ে যায় নি। এইবার আসবার সময় হবে।

—তুমি দেখছি ছেলেকে আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় না তুলে ছাড়বে না।

—আর মাথায় তোলা ? তুই যে বাদর করে তুলছি বলিস নি এই আমার ভাগ্যি ভালো।

কথাটা বলে ফেলেই মা তাকিয়ে থাকলেন শর্মিলার মুখের দিকে।

শর্মিলা আর কোনো কথাই বললে না। ময়দায় জল দিয়েই ঠেসতে লাগলো। মায়ের পাশটিতে বসেছে। মাও আর কোনো কথা বললেন না।

শর্মিলার কাজ খুব নিখুঁত এবং যখন যা করে বেশ যত্ন নিয়েই করে। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুব দ্রুত চাকির ওপর বেলুন চালায়। রুটির ডেলা পাকানো ময়দার চাকি চেপ্টে যেন মসৃণ কাঁচা পাঁপড়ের পরিষ্কার চাক্‌তি হয়ে ওঠে। মা লক্ষ্য করেন আজ যেন মেয়ের কাজে বেশ উৎসাহী ভাব চোখে লাগছে। পরক্ষণেই মা ভাবেন—এটা ঠিক নয় ভাবনায়, সব সময় শর্মিলার সব কাজে বেশ একটা পরিবর্তন খুঁজে মরা। দূর ছাই—বলে মনের কপাট বন্ধ করে বাইরের সাংসারিক রান্নার ফোড়ন দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আর মেয়ের চালচলনে ফোড়ন কাটবেন না ভেবে নেন।

মেয়ে তো একমনে কোনো কথা না বলে রুটি বেলে চলে। হঠাৎ তার মনে হয় গায়ের ওপর যেন কি চলছে। যেমন ভাবা ওমনি চিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে ওঠা—ইস্ কি ?

মা চম্‌কে যান। বলেন—কি হলো ? আরে পিঠে যে একটা আরসোলা চলছে। দেখি, দেখি, তাড়িয়ে দিই···

মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই সুশোভন রান্না ঘরের কাছে এসে দেখে দিদির লাফিয়ে ওঠা এবং মায়ের আরসোলা তাড়ানোর জন্যে, ব্যাঘ্রী জম্প প্রায় প্রচেষ্টা। সুশোভনই তার হাতের খাতাটি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে দিদির পিঠ থেকে আরসোলাটি। মা বলে ওঠেন—ভাগ্যিস্ সুশোভন এসে ছিলি বাবা, ঘরের মধ্যে কি উৎপাত আরসোলার, আর পারি না।

সুশোভন বলে ওঠে—এই দেখো না মা, আমি পাসটা করে নিই, তার পর একটা চাকরি নিই, বাস তার পর বাড়িটাকে একেবারে তক্-তকে ঝক্‌ঝকে করে ফেলবো।

—তাই করিস। এখন আয় খেতে আয়।

মা বলে ওঠেন কপট রুষ্ট ভাব দেখিয়ে।

শর্মিলা আবার তার রুটি বেলার কাজে মন দেয় সেখানে বসে বসে।

সুশোভন পড়ার টেবিলে বইখাতা রাখতে চলে যায়।

রান্নার কাজ চলছে। তারই মাঝখানে মা এক-একবার শর্মিলার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

কিছুতেই যেন মায়ের মন থেকে মেয়ের এই ভাব পরিবর্তনটা ভুলে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আবার কি হল, কার সঙ্গে ? প্রশ্ন উঠছে মনে। জিজ্ঞাসার ঠোঁট মায়ের থেকে থেকেই চঞ্চল হয়েছে আজ। বেশ কদিন থেকেই হয় তো এর আরম্ভ কিন্তু মা ভাবছেন চোখে ধরা দেওয়ার মতো যে ভাবান্তর তার প্রকাশ আজকের সন্ধ্যায় ঢাকা থাকে নি যেন। মা হয়ে মেয়ের মনোভাব বুঝবেন না—তাঁর পেটের মেয়ে। শর্মিলার মনটা যে বড়ই চঞ্চল হয় সামান্য একটু নাড়া পেলেই ঠিক তলিয়ে দেখবার আগেই। মেয়েটা সরল—বেজায় সহজ। সে যে আর এখন কথা বলছে না, ভাবছে এবং স্বপ্নের জাল বুনছে—তা বুঝুক—কথা বলে আর তার বিরক্তির কারণ হতে চাইলেন না।

উনুনে তরকারির খোলা নামিয়ে চাপালেন রুটি ভাজার চাটুটি। শর্মিলা বেলে দিচ্ছে আর তিনি ভাজছেন আর ভাজছেন রুটিগুলি একান্ত মমতায়।

উনুনের আঁচে দিয়ে টোল টোল করে ফুলিয়ে তুলছেন রুটিগুলি। আশায় যেন ফুলে উঠছে তাঁর মন। ভাবছেন মেয়ের মনটিও কি এমনি আশায় ফুলে উঠবে? না উঠেইছে?

শর্মিলা বেলার কাজ এতক্ষণে শেষ করে এনেছিল। সে উঠতে যাবে এমন সময় সুশোভন এসে বললে—দিদি তোমার নামের একটা খামের চিঠি আমার পড়ার টেবিলে ছিল, এই নাও।

মা বলে উঠলেন—এই দেখেছো, একেবারে ভুলে গেছি, চিঠিটা শর্মিলার দেরাজের ওপর না রেখে ওখানে রেখেছিলুম। ইস্…

অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে সুশোভনের হাত থেকে খামের চিঠিটা নিলে শর্মিলা। চলে যায় নিজের ঘরটিতে।

স্বর্ণ রায় বাড়ি এসেই নিজের ঘরে চলে আসে।

নিজের ঘর বলতে সামান্য একটা তক্তপোষের ওপর শোবার জন্যে বিছানা পাতা আর জানলার ধারে একটা টেবিল ও চেয়ার, একটা আলমারী; বাস এই জিনিসেই ঘর ভর্তি কোনোক্রমে চলাফেরার মতো একফালি খালি মেঝে যার লাল সিমেন্টটার চকলা উঠে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। জানলা দিয়ে ঘরে বৃষ্টির ছাট এলে সেই লাল সিমেন্টের মেঝের চকলা ওঠা জায়গাটিতে ক্ষুদে জলাডোবা হয়ে থাকে। স্বর্ণ রায়ের আজ ঘরে ঢুকেই পাটা ঐ চটাখাওয়া খোঁন্দলের মধ্যে পরতেই যেন তার মনে হল তবে কি পদস্খলন হল?

যাই হোক সে ওসব কথার ধারধারে না। মনের রঙমশাল জ্বালাবার হলে জ্বালাবেই তবে তা নিয়ে রোমন্থন করতে চায় না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয়, কোচিং ক্লাসের দিন আজ। সে ইংরেজির ক্লাস নেয়। সপ্তাহে তিনদিন যেতে হয়। এর বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তাই লাভ। সংসার পাতা হয় নি এখনো, তাই রোজগারটা তার আগে যতটা পারা যায় করে চলে। অর্থ গুছিয়ে নিতে হবে। এই অর্থনীতির চিন্তাটা স্বর্ণ রায়ের ছাত্রজীবন থেকেই আছে। নিজে পড়াশোনা করেছে সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থায় ছিল বরাবরই। যার ফলে রোজগার করাটা অনেকদিনের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তার।

অফিসের কাজের পর আবার কোচিং ক্লাসের শিক্ষকতা তার মেজাজ আর মর্জিতে বেশ খাপ খেয়েই গিয়েছে।

স্বর্ণ রায়ের সংসার বলতে নিজে আর তার বাবা। মা শৈশবেই মারা গিয়েছেন। মা-হারা বালককে নিয়ে বাবা সংসার করেছেন, তখন ঠাকুমা ছিলেন; তিনিই সংসারের হাল ধরেছিলেন। স্বর্ণের বাবাকে অনেকবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বলেন কিন্তু তিনি সে কথায় কোনো কান দিতেন না। নিজে একটি সাহেবী সওদাগরী অফিসে স্টেনোগ্রাফারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাতেই সংসার বেশ চলে যেতো। যখন অবসর নিলেন তখন ছেলেকে সেই কাজে অফিসের বড় সাহেবকে বলে কয়ে বসিয়ে দিলেন। ছেলেকে ইংরাজিতে অনার্স সহ বি. এ. পাস করিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে স্টেনোটাইপিষ্ট হবার যথাযোগ্য শিক্ষা নিজে দিয়ে কমার্শিয়াল কলেজের প্রশংসাপত্রও আদায় করিয়ে রেখেছিলেন। কাজ দিল সেই পত্রই অবসর গ্রহণের কালে।

এক কথায় চাকরিটা পেয়ে গেল স্বর্ণ। সিদ্ধিনাথ রায় নিশ্চিন্ত মনে অবসর গ্রহণ করলেন ছেলেকে অফিসের চাকরিতে বসিয়ে। সেই থেকে স্বর্ণ রায় যথারীতি অফিসে যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে। মাঝখানের সময়টায় বাড়িতে আসা খাওয়া আবার কোচিং ক্লাসের কাজে যাওয়া এবং বাড়ি এসে খাওয়া ও শোওয়া। বাবার সস্নেহ আশ্রয়ের ছায়ায় তারও জীবন একান্তই নিশ্চিন্তের। কোনো ভাবনা নেই, সমস্যাও নেই তেমন কিছুর।

স্বর্ণ বেশ একটা নিরিবিলিতে জীবনের প্রথম থেকে কাটিয়েছে। মা সংসার দেখতেন। ঠাকুমা পাড়ার হরিসভায় কীর্তন আর পাঠ শুনতেন বাকি সময় মালা জপ করে কাটিয়ে দিতেন কপালে রসতিলক কেটে। মা গতহবার পর অবশ্য সংসারের হেঁশেল ঠেলতে লেগে গিয়েছিলেন, তবে বেশ একটা অনিচ্ছার সঙ্গেই। তাঁর সংসারের প্রতি টান বলতে তেমন কিছুই ছিল না। নাতিকে ভালোবাসতেন তবে নিজের বৈধব্যের পরিণত বার্ধক্যেও বেশ একটা অগোছালো ভাবে থাকতেই ভালো লাগার মন করে নিয়েছিলেন।

সব সময় হরিসভায় উপস্থিত হবার জন্যে যেন ছটপট করতেন। কোনো রকমে রান্নাবান্না করে ছেলে আর নাতিকে খেতে দিয়ে নিজে খেয়ে, হেঁশেলের কাজ শেষ করতে পারলেই যেন হয়। তার পরই ছুটবেন গোপালজীউ মন্দিরে বা হরিসভার চৈতন্যচরিতামৃত পাঠের আসরে।

সিদ্ধিকে বলি—বাবা প্রথম বউটা মারা গেল, বড় লক্ষ্মী বউ ছিল, কি আর করবি? আর একটা বে'কর। পুরুষ মানুষের কি বয়েস, কিন্তু কে কারু কথা কানে নেয়। প্রায়ই এই ক্ষোভ তাঁর মুখে শোনা যেতো।

সুবর্ণও ছেলে বয়সে মা মারা যাবার পর থেকেই ঠাকুমার মুখে এমন কথা শুনেছে অনেক—অনেকবার। এমনও শুনেছে যে ঠাকুমা বলছেন বাবাকে—হরিসভায় মোক্ষদাদিদির ভাইয়ের মেয়েটি বেশ ঘরের কাজে ভালো, দেখ না সিদ্ধি একবার।

সিদ্ধিনাথ রায় যথারীতি সে কথা কানেই তোলেন না। তাঁর পাশাখেলার নেশা। পাড়ার কেউ এলেই সেই খেলায় জমে থাকেন। তাই অফিস থেকে ফিরে প্রতীক্ষায় থাকেন রোজই।

স্ত্রী থাকতে সখ ছিল কিন্তু স্ত্রীর অবর্তমানে তাঁর এটাকে প্রায় জীবনধারণের অবলম্বন করে ফেলেছেন। নেশাটার মধ্যেই ডুবে থাকেন পাশার দান নিয়ে। প্রতিবেশীরা বলেন যে সিদ্ধিনাথ বাবু একেবারে পাশাখেলার রাজা।

স্ত্রী বিয়োগের বেদনা ভুলতে মানুষ কত রকম নেশায় মাতে। কিন্তু সিদ্ধিনাথ বাবু শুধু পাশার নেশায় মাতলেন।

এবং এমন মাতলেন যে এপাশ ওপাশ দেখবার বা ভাববার মতো সময় রাখলেন না। কেবল ছেলেকে নিয়ে থাকতেন লেখাপড়ার দিকটা ঠিক মতো চলে যাতে তাই আর স্টেনোগ্রাফির চর্চা করিয়ে যাওয়া। অবসর জীবনটার জন্যে যেন ছট্‌ফট্ করছিলেন।

প্রার্থিত সেই অবসর জীবনও এলো তাঁর। কিন্তু তারই আগে চলে গেলেন সুবর্ণের ঠাকুমা। হরিসভা থেকে একদিন খবর এলো তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে তাঁকে যেন ডাক্তার দেখিয়ে ঘরে আনা হয়। সুবর্ণ বাবার সঙ্গে গিয়ে হাজির হল পাড়ার ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তার দেখে জবাব দিয়ে গেলেন। বললেন—আর কি করবেন, সব শেষ।

হরিসভায় এমনিভাবে সুবর্ণ দেখলো তার ঠাকুমা হরি প্রাপ্তি পেয়ে গেলেন। মা গিয়েছিলেন—এবার বুড়ি ঠাকুমাও গেলেন।

সংসার গৃহিণী শূন্য। বাবা আর ছেলে।

অবসর জীবনে বাবা ধরলেন সংসারের দেখার ভার। পাড়ার ব্রাহ্মণবাড়ির এক বিধবা মহিলা ঠাকুমার কাছে আসতেন তিনিই রান্নাবান্না দুবেলা করে দিতেন। তাই খাওয়া চলে—বাবার আর ছেলের।

স্টোভ্ জ্বালিয়ে মাছ বা মাংসের রান্নাটা সিদ্ধিনাথ বাবু বেশ করে নিতেন। সময় সময় প্রতিবেশীদেরও বাড়ি বাড়ি বাটি আনিয়ে তা পাঠাতেন। পাশার আসরে যাঁরা আসতেন তাঁরাও বাদ যেতেন না। খরচটা করতেন দরাজ

হাতে। সুবর্ণও রান্নার এইদিকে বাবার উত্তরাধিকারী হয়েছে। এখন সে নিজেই করে দেয় মাছ বা মাংসের রান্না। তবে সিদ্ধিনাথ বাবু চান নিজে হাতে সব রানতে। তাঁর সুবর্ণের রান্নায় নানান খুঁত ধরা হয়ে যায়। যেন কিছুতেই ঠিক মনের মতো হয় না। হয় নুনটা বেশি হয়, না হয় ঝালটা। আর তাও যদি ঠিক হয় তা হলে বলেন—গরম মশলাটা বড় বেশি হয়েছে। রান্নার মধ্যে সব কিছু ফোড়ন বেশ পরিমিতি রেখে দেওয়াটাই মুন্সিয়ানার।

সিদ্ধিনাথ বাবু যতই এমনি ধারার খুঁত ধরুন সুবর্ণ ঠিকই রান্নার এদিকটা বজায় রাখছে। বাউনপিসি নিরামিষ যা পারেন রেঁধে দিয়ে যান আর বাপ ছেলে তাই গলাধঃকরণ করে চলে।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ পিসিও আর এলেন না। খবর নিয়ে সুবর্ণ জানতে পারলে তিনি অসুস্থা, জ্বরে ভুগছেন, রাত থেকে। এমনি জ্বর, তাঁর এক সপ্তাহের মধ্যে ছাড়ছে না। সিদ্ধিনাথ বাবু পাঁউরুটি দিয়ে মাছের ঝোল করে খাওয়ার ব্যবস্থা চালিয়ে দিলেন। সুবর্ণ শেষে বললে—দেখিই না চেষ্টা করে। শেষে দুদিন ভাতের হাড়ি চড়াতে চড়াতে আর রুটি ভাজতে ভাজতে মোটামুটি চলন সই কাজ শিখে নিলে।

বাবা আর ছেলে তাই নিজেরাই রান্নার কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

আজ সুবর্ণ রায়ও নাই যথারীতি চায়ের যোগাড় করতে গিয়েছে। গিয়ে দেখে বাবা তাড়াতাড়ি চা করতে গিয়ে গরম জল পায়ে ফেলেছেন। আর কিছু হাতের কাছে না পেয়ে তার ওপর পাউরুটি দিয়ে খাবার মাখনই একটু প্রলেপ দিলেন। নিজে করতে গিয়ে, একি ?

সুবর্ণের মনটায় তখন এই দেখে বেশ খারাপই লাগলো। বাবাকে এমনি ভাবে রান্নার কাজে দেখার জন্যে সে লজ্জিত হয়। বলে বসে—বাবা, আপনি কেন কষ্ট করে এ সব করছেন, একটা লোক রাখার চেষ্টা করা যাক। আপনিই দেখে শুনে ঠিক করুন।

সিদ্ধিনাথ বাবু ছেলের কথা শুনে চমকে ওঠেন। তিনি যেন ঠিক ঠিক ছেলের কথা ধরতে পারছেন না এমনি একটা না-বোঝার ফ্যালফ্যালানির চাউনি তুলে চেয়ে থাকেন সুবর্ণের দিকে। কি যে উত্তরে বলবেন ঠিক করতে পারেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন—আমিই খুঁজে আনবো।

ছোট্ট জবাব সিদ্ধিনাথ বাবুর।

সুবর্ণ কোনো কথা আর বলে না। সকালে প্রেসটিজ কুকারে মাংস করার

আয়োজন করেছিল তাই আছে। বর্ষার দিনে বিশেষভাবে একটু গরম করা হলেই খানাপিনা বেশ জমে। হাতে গড়া রুটি খানকয়েক করবে তা হলেই গরম মাংস দিয়ে বেশ জমবে।

এখন চা করে বাবাকে দেয় আর স্বর্ণ নিজে পান করে। প্রতি চুমুকেই বেশ তৃপ্তি, নিজের মনের মতো করে চা হয়েছে। দার্জিলিং পাতা চায়ে হালকা জলের চা তার বড় ভালো লাগছে। ধীরে ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে আলতো করে যেন চুষে চুষে চায়ের পাত্রকে করবে নিঃশেষ প্রায়।

আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। টবে কত লাল কৃষ্ণকলি। বর্ষার সন্ধ্যায় মেঘহীন আকাশ পেয়ে জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে উঠোনটি। মালতী লতার ঝালর ঝালর ফুল গন্ধে মাতাল করার মতো। রান্নার ঘরের পাশ দিয়ে ছাদে পেঁাচেছে। স্বর্ণ তারই জানলায় দাঁড়িয়ে।

বাবা পাশার আয়োজন করেছেন খেলতে বসবেন; এখনও তাঁর খেলার সঙ্গীরা সব এসে পৌছান নি। তিনি স্বর্ণকে ডাকছেন—কই রে স্বর্ণ, কোথায় গেলি। এক হাত খেলে যা না?

এখন ছেলেকে মাঝে মাঝে পাশায় জমাতে চাইছেন। স্বর্ণের তেমন মন চায় না তবু বাবার ইচ্ছের কদর দিয়ে খেলতে যায় কিন্তু আজ যে তার কোচিং ক্লাস করানোর দিন। অন্যমনস্ক ভাব কাটিয়ে বাবার কাছে আসে। বলে—এখন যে কোচিং ক্লাসের সময় হয়েগিয়েছে, এই যাব আর আসবো।

বাবাকে এ কথা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় স্বর্ণ। না হলে সিদ্ধিনাথ বাবু যদি জেদাজেদী আরম্ভ করেন। কারণ উনি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। স্বর্ণ আর সে কথা বলার কোনো সুযোগই দিল না। হয় তো সিদ্ধিনাথ বাবু বলতে যাচ্ছিলেন—আরে রাখ তোর কোচিং ক্লাসের সময়। পরে একটু গেলেই হবে। ছেলেগুলো অন্য বিষয় ততক্ষণ পড়বে। বয়স হয়েছে সিদ্ধিনাথ বাবুর, এই মনোভাব বুঝতে পারে স্বর্ণ তাই সে আর কালক্ষেপ না করেই ঘর থেকে পা বাড়িয়ে দিলে। এমনিতেই তার বেশ দেরি হয়েগিয়েছে নানা কারণে। এমনটা আগে হয় নি আর। তার সময় জ্ঞান ছিল ঘড়ি ধরা কাজে। ঠিক সময় যাওয়া ঠিক সময়ই চলে আসা—কোনো নড়চড় নেই।

আজই কেমন এলোমেলো হয়ে গেল, সময়ের খেই হারিয়ে সংসার, কাজ, বাবার প্রতি অভিযোগ—সব যেন ভিড় করে আসতে চাইছিল।

স্বর্ণ ভাবলো—যাক, বাবা ডাক দেওয়াতে কর্তব্যের দিকে মনটা ঠিক

ফিরে এলো। নইলে আরো কতটা যে সময় এইভাবে তানা নানা করতে করতেই বয়ে যেতো তার কোনো হদিসই হয় তো পেতো না। উঠোনের দুধ জ্যোৎস্না, মালতীলতার ঝুমকো, কৃষ্ণ কলির লাল, চায়ের ঘ্রাণ—সব মিলিয়ে মিশিয়ে জড়িয়ে রসিয়ে একটা মনটানা ভাব এসে যায় স্বর্ণের ভরা বত্রিশের যৌবনে। এসে যায় বর্ষার সুনীল আকাশের পরিচ্ছন্নতার মধ্যে আশার দীপাবলীর তারাদের চিকমিকে চাউনি।

চমকে যায় পথে বেরিয়েও স্বর্ণ। এই আকাশ, এই তারা, এই শুক্লপক্ষের চাঁদ আর তার জ্যোৎস্নায় স্বর্ণ যেন হালকা দেহে উড়ে চলেছে—কোথায় জানে না, নিজের খেয়ালে ট্রামে উঠেছে আবার যথাস্থানে নেমেছে, কোচিং ক্লাসের বাড়ির কাছে এসেছে এবং যথারীতি ক্লাসও নিতে চলছে।

প্রাণ ভরা যেখানে সৌন্দর্যের আতিশয্য তাকে জীবন দিয়ে উপভোগ করতে হবে। স্বর্ণ রায় সে কথা বুঝেছে সেই ছোট্ট শিশু বয়েস থেকেই যেদিন বাংলা সাহিত্যের প্রথম পাঠ নিয়েছিল মায়ের কোলের কাছে বসে। মা ভালোবাসতেন ছড়া বলতে। 'অয় অজগর আসছে তেড়ে, আয় আমটি খাবো পেড়ে'- অথবা সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের মজাদার ছড়া। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুশি তো মায়ের কোলের কাছে বসেই শোনা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক বলতে গেলে প্রায়ই না। ছড়ার রাজ্যেই ছড়িয়ে ছিল স্বর্ণের শৈশব।

স্বর্ণ—এই নামটিও শুনেছে বাবার মুখে যে তার মায়েরই দেওয়া।

বেশ মনে আছে মা বললেন...স্বর্ণ সোনার ছেলে
চাইনা কিছু এমন পেলে।

এমনি আরো কথা ফুটতো তার সোনা মায়ের মুখে।

স্বর্ণ মনে করে না তবে আজ কেমন যেন মনে আসছে।

সুন্দরের সঙ্গ লাভ করার প্রার্থনা' এক সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের অপূর্ব ছন্দময় বাণী শুনেছিল একদিন স্বর্ণ তার মায়ের মুখে। সেদিন ঠিক বোঝে নি এ কার বাণী, দেশের কত বড় মানুষ ; তবে তাঁর নামটা মনে মনে সেদিন থেকেই গাঁথা ছিল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর নামের সঙ্গেই রয়েগেছে বাণীর ভাবরূপও নিজের বুদ্ধি মতে—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর'।

মায়ের মিষ্টি গলার সেই স্বর যেন এখনো স্বর্ণের কর্ণে অনুরণিত। ট্রামের থামবার ঘণ্টা কোনো বাধা হচ্ছে না। রাস্তার শব্দও না। স্বর্ণের সমস্ত জীবনবোধ সুন্দরের চেতনায় জাগ্রত হয়ে উঠছে। প্রকৃতির রূপের থেকে

রঙ্‌টুকু চুরি করে নিজের মনের মধ্যে মেখে রাখে। আজ যেন মনে হয় একটুও ফাঁক বা ফাঁকি পড়ুক এটা সে চায় না। সৌন্দর্যের নির্যাসের শেষ কণাবিন্দুটি পর্যন্ত যেন প্রাপ্তিযোগে ঘাটতি না পরে।

ট্রামের মধ্যে চম্‌কে ওঠে স্বর্ণ। টিকিট আপনার—তাকেই লক্ষ্য করে কণ্ডাক্টার হাত বাড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি পয়সা দিয়ে দেয়।

সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দীজীবন। স্বর্ণের মনের সজীবতাটুকু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়াই ছিল। মনোবিজ্ঞানের স্বভাব ধর্মীয় নীতিরীতি কিন্তু অনেক সময় নিয়মের সংজ্ঞা না মেনে জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো কোনো বিশেষ সময়ে প্রচলিত মতবাদ থেকে অন্য পথের আলোক পাতও করে থাকে।

ঠিক তাই কঠিন কাজের হাড়ভাঙা খাটুনির চাপেও যেন স্বর্ণের মন একটু পাশ ফেরে, একটু চোখ তুলে এবং চোখ খুলে জগৎ ও জীবনকে দেখতে চাইছে। এই দেখতে চাওয়ার অঙ্কুরোদ্গমে সঞ্চয়ী হচ্ছে অমূল্য সম্পদ।

ট্রামের ঘণ্টিটা দুবার টুং টুং করে বেজে উঠতেই স্বর্ণের চমক ভাঙ্‌লো। নেমে চলে কোচিং ক্লাসের জন্যে। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন সাড়ে সাতটা বেজে গিয়েছে। নিজেকে বেজায় অপরাধী ভাবছে, ছেলেরা প্রতীক্ষা করে বসে আছে ঠিকই তার জন্যে, এটা স্বর্ণ কখনই ভালো মনে করে না। অথচ আজ নিজের বেলাতেই তাই হয়ে গেল।

পথের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল সুশোভনের সঙ্গে। স্বর্ণ রায় বলে উঠলো —কি গো, চলে যাচ্ছ, চল চল ক্লাসটা করিয়ে যাই, একটু দেরি হয়ে গেল।

—হ্যাঁ স্যার, আমরা অপেক্ষা করছিলুম আপনার জন্যে, কথা হচ্ছিল যে আপনার তো এমন দেরি কখনও হয় না। সুশোভন উত্তর দেয়।

স্বর্ণ উত্তর শুনে লজ্জা বোধ করে মনে মনে।

অফিসের পর চঞ্চল গোস্বামী রোজই টালিগঞ্জের এক বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কর্মসমাধা করে বাড়ি ফেরে। ট্রামের মধ্যে আজ তার পদদলিত স্যাণ্ডাল সামলে এবং এক মহিলার টিকিট অন্য সহযাত্রীর দেওয়া, এবং যাত্রীকে মহিলার পরে ডেকে বসতে বলা, সবটা মিলিয়ে একটা বেশ উপভোগ্য পরিবেশ-চিত্র—মনের মধ্যে ধরা হয়ে গিয়েছে।

চঞ্চল নিজের চেষ্টায় চাকরি করে কলকাতায় লেখা পড়া করেছে। বাবা

দেশের বাড়িতেই থাকেন। সামান্য জায়গা জমি আছে আর কিছু শিষ্য ঘরও আছে। তাঁরা প্রণামী দেন পালে পার্বণে—এইসব মিলিয়ে তিনি সগৃহিনী থাকেন দেশের বাড়িতে। পুত্র চঞ্চল কিছু পাঠায় তবে তার ওপর তাঁর কোনো ভরসা নেই। চঞ্চলও নিজের মনে দিন কাটায়। অফিসের মাইনে ছাড়াও গৃহশিক্ষকতার বাবদে উপরিই বলা চলে রোজকারে তার বেশ চলে যায়। মেসে থাকার জীবন ছোট থেকে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

আজ ছাত্রীর শরীরটা ভালো নেই তাই তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছে মেসে। চার নম্বর বাসে চলেছে। নামতে হবে জোড়াসাঁকো স্টপেজে। ভিড়ের মধ্যে ঠিক দেখাও যাচ্ছে না আবার একটু এলোমেলো চিন্তায় যেন মনটা অন্য কোথা অন্য কোনখানে গিয়ে হাজিরা দিচ্ছিল। ততক্ষণে জোড়াসাঁকোর স্টপেজ ছেড়ে বাস এগিয়ে চলেছে। চঞ্চল গোস্বামীর আর নামা হলো না। খেয়াল ছিল না এটা সেটা চিন্তার মধ্যে। পাশে পাশে লোকের ভিড়ে অনেকবার নিচু হয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে নিজের নামবার স্থানটি এলো কিনা। তবু শেষে যখন অন্যমনস্কতার জন্যে এগিয়েই এসেছে, ভাবলে—তবে যাওয়া যাক অনিলের বাড়ি। তার বন্ধু অনিল সেনের বাড়ি বাগবাজারে। চায়ের তৃষ্ণাটুকু তো আছেই চঞ্চলের, বিশেষ করে আজ ছাত্রীর দেখা না পাওয়ায় চাটা হয় নি; তায় মন ৮ : ল, অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রামের মধ্যের সেই ঘটনায়। অনিলের বাড়িতেই চলেছে এই সব মজার খবর শোনাতে আর জানে সেখানে অনিলের সুগৃহিণী চামেলী চায়ের সঙ্গে 'টা' যুক্ত করে দেবে বেশ ভালো মতোই।

বাস ছুটেছে বাগবাজারের দিকে চিৎপুর রোড এখনকার রবীন্দ্র সরণী দিয়ে ভিড় সরিয়ে সরিয়ে, তার থেকে চঞ্চল গোস্বামীর মন ছুটে চলে আরো দ্রুত।

বাস থেকে নেমে অনিলের বাড়িতে শারীরিক উপস্থিতির আগেই চঞ্চল গোস্বামীর মন পৌছিয়ে যায় সেখানে।

অনিল নিজের টেবিলে বসে মক্কেলদের নথিপত্তর দেখছে। সে ওকালতি করে। চঞ্চলকে দেখে পুলকিত হয়। বলে—আয় রে, কত দিন আসিস নি। কি খবর তোর?

—ভালো আছি রে, আজ এক মজার ব্যাপার ট্রামের মধ্যে।

চঞ্চল গোস্বামীর কথা শেষ হতে না হতেই চামেলী ঘরে চলে আসে এবং তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বলে বসে—মজার ব্যাপার কি হল আবার ট্রামের মধ্যে, শুনি শুনি।

চঞ্চল গোস্বামী বলতে থাকে।

—আর বলেন কেন। ট্রামে উঠবেন আপনাদের সমজাতীয় যাত্রিণী অথচ ভাঙ্গানো পয়সা নেই ট্যাঁকে।

—তাতে কি হয়েছে। চামেলী প্রশ্ন করে বসে।

—তাতে কি হয়েছে। তাতেই তো সব।

—তার মানে? অনিল এবার প্রশ্ন করে।

—সে কথাই তো বলছি।

—হ্যাঁ রে বাবা, তাই বলুন তো আগে তাতে কি হল?

চঞ্চল বলতে থাকে, বেশ আগ্রহ হচ্ছে এদের দেখে। যেমনি দ্বিতীয়বার ট্রামের কণ্ডাক্টার মহিলার কাছে টিকিট চেয়েছে, দশটাকার নোটটি দেখিয়েছে অমনি কাণ্ড।

—কি কাণ্ড? চামেলী প্রশ্ন করে বসে।

—সহযাত্রীর মন টললো, প্রাণ দুললো। ট্যাঁক থেকে ব্যাগটি বের করে খুললো এবং মহিলার অপ্রস্তুত ভাব কাটল ও আশা করি প্রস্তুত ভাব জাগলো।

—বাবা এ যে কবিত্ব ফুটছে দেখছি, ব্যাপার কি, এ মনকেও কিছু চঞ্চল করেছে দেখছি।

অনিল স্ত্রী চামেলীর দিকে চেয়ে বলে বসল—তা হলে বলছো, চঞ্চলের মন চঞ্চল হয়েছে।

—চঞ্চলের মন অত সহজে চঞ্চল হয় না। হলে কি আর এখানে আসার সময় থাকতো।

চামেলী অভিমান করে বলে—তা ঠিক। স্বামীর দিকে চেয়ে বলে—তা হলে যেতেন গঙ্গার ধারে নতুন বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে বর্ষার সন্ধ্যায় ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মধুমলয় ভক্ষণ করতে।

—বা বা, বেশ বলেছ চামেলী। যাক এখন চায়ের একটু ব্যবস্থা হোক। চঞ্চলের অনারে আমারও এক কাপ হয়ে যায় যেন।

—তোমার আবার কেন? এই তো বাড়ি ফিরে খেলে।

—দেবে না বলছো? অনিল বললে স্ত্রীর দিকে চেয়ে।

—না না, আনছি বাবা আনছি দুজনের জন্তেই।

চঞ্চল বলে বসলো—আমি কিন্তু তিনজনের জন্তেই এক ব্যবস্থা বলছি।

চামেলী উত্তর করে—না, দুজনের শুধু এক ব্যবস্থা। অন্য জন অসময়ে খাবে না।

অনিলরা খুলনা সেনহাটির লোক। কিন্তু শ্যামবাজারে মামার বাড়িতেই জন্ম এবং মায়ের সঙ্গে সেখানেই মানুষ হয়েছে। বাবা দেশের বাড়িতেই থাকতেন নিজের কবিরাজখানার মধ্যে রোগীদের অল্পভিড়ে। তাঁর প্রথম দুটি সন্তান দেশের ঘরে জন্মের পরে পরেই ভবলীলা সাঙ্গ করায় তৃতীয়টির বেলায় শ্বশুরালয় বা শ্বশুরকূলের নব-আলয় কলকাতায় তিনি স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন প্রসূতির সযত্নসেবার আধুনিক ব্যবস্থার জন্যে। তাঁর শেষ জীবনের ইচ্ছেও ছিল যে তাঁর ছেলেটি যেন বড় এলোপ্যাথী ডাক্তার হয়।

কিন্তু অনিলের মরা কাটা আর তার আগে ব্যাঙ্ কাটায় তেমন রুচি হলো না; তাই মামার বাড়িতে থেকেই কলেজে আর্টস পড়তে থাকে।

চঞ্চল আর অনিল দুজনেই ছাত্র জীবন থেকে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ। মামারাই কলকাতার সৎপাত্রী চামেলীর সঙ্গে অনিল সেনের বিয়ে দিয়ে দেয়। তখন আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে। বাগবাজারে নিজে বাসা নিয়ে থাকছে।

দুই বন্ধুর হৃদ্যতা কর্মজীবনে ব্যস্ততার মধ্যেও বেশ অটুট রয়েছে বা বলা যায় অদৃশ্য বন্ধনে যেন বাঁধা হয়ে রয়েছে। কলেজ জীবনের প্রথম থেকেই যে বন্ধুত্ব তা আজও সমানভাবে বজায় আছে।

অনিলের আপন বলতে যেন চঞ্চল গোস্বামীকেই বুঝেছে চামেলী।

চামেলীর চায়ের ব্যবস্থা করে আনতে আনতে কিছুটা সময় কেটেছে। সেদিনের কাগজের পৃষ্ঠায় মন দিয়েছে চঞ্চল। এমন সময় চা এবং 'টাও' সঙ্গে এসেছে। আজ এসেছে গরম ফোলা লুচি আর চাকা চাকা বেগুন ভাজা।

চঞ্চলের সব থেকে প্রিয় খাবার। মেসের একঘেঁয়ে জীবনে তার তো কোনো বৈচিত্র্য নেই। এখানেই যা একটু রঙ্ আর রুচির পরিবর্তন হয়। সেটাকে লুচিকেন্দ্রিক বললেও বলা চলে।

—ঘরে আর কিছু নেই, মিষ্টি কই গোসাইজীর? অনিল বলে ওঠে। চামেলী একটু কাচুমাচু ভাব নিয়ে স্বামীর দিকে তাকায়। সে বুঝতে পারে মিষ্টি আনানো নেই। চঞ্চল চঞ্চল হয়ে বলে ওঠে—আরে চায়ের সঙ্গে টা যা এসেছে, সে তো আমার পরম ভোগ্য, লুচির রুচিটাই তো বৌদির বিশেষত্ব।

—থাক থাক, আর বানিয়ে বাড়িয়ে রঙ ফলিয়ে কথায় কাজ নেই। মন তো রয়েছে ট্রামের দশটাকার নোট হাতের যাত্রিণীর প্রতি।

—এই দেখ, অনিল কি সব শুনতে হচ্ছে দেখ।

চঞ্চল অবাক এবং অপ্রস্তুত ভাবেই বলতে থাকে।

অনিল বলে—চামেলী তো ঠিকই বলেছে ভাই। তুমি তো চির কুমার হয়ে আছ এইসব দেখার জন্যে। আর শুধু দেখার জন্যে কেন গভীরে গভীরে কোথায় ডুব দিয়েছ কি না, কে জানে?

—কি যে, বাজে বাজে ভাবনা করা হচ্ছে, তার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না।

—তা পাবি কেন, চঞ্চল? মনের চাঞ্চল্য চাপতে চাইলে কি অত সহজে চাপা যায়। মক্কেল চড়িয়ে রোজকার করি ভাই, মন বুঝতে পারি, তার জন্যে দেরি হয় না।

—আমিও কথা শুনে সেই রকমই আন্দাজ করেছি।

ফস্ করে চামেলীর এমনি সম্মতিসূচক কথায় চঞ্চল বলে—সে কি, অনিল ওকালতির সঙ্গে গৃহিণীকেও সমপেশাই অংশীদার করে নিয়েছে যে তাতো জানা ছিল না। একেবারে সমব্যবসায়ী হয়ে যে মক্কেলের মন বোঝার কাজটি শিক্ষা করা হয়েছে এবং সুযোগ বুঝে আমার ওপর তার প্রয়োগ হয়েছে। ভালো রে কারবার? কোথায় এমন মজার ঘটনা দেখে বললুম তার জন্যে কৃতজ্ঞতা তো নয়ই তার সঙ্গে আমায় জড়িয়ে দেওয়া। ওকালতির প্যাঁচে যে এমন ভাবে মোচড় দিতে হয় তাতো ভাই জানা ছিল না।

—এখন জানা হল তো? চামেলী অভিমানের সুরে বলে ওঠে।

অনিল বলে—আরে ভাই যদি মন টলেই থাকে বল না একটা যোগাযোগের চেষ্টা করি। একদিন মিষ্টিমুখ হয় আমাদের।

—কি যে আবার যা তা বলিস। আমি চলি ভাই।

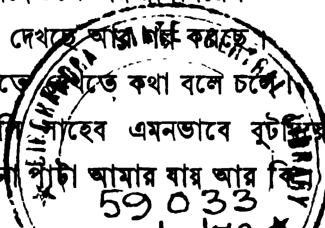
—না না যেতে হবে না। বসুন দুই বন্ধুতে গল্প করুন। রান্নার অল্প বাকি আছে আমি হাতের কাজটুকু শেষ করেই আসছি।

চামেলী ভিতরের দরজা দিয়ে চলে যায় রান্নাঘরে।

অনিল নিজের দলিলপত্তর দেখছে আর চার্ট করছে।

চঞ্চল খবরের কাগজ দেখতে দেখতে কথা বলে চলে।

—আজ ট্রামে এক বাঙালি সাহেব এমনভাবে বুটশুদ্ধ পাটাকে চেপে দাঁড়িয়েছিল যে স্যাণ্ডেল গলানো প্যাটা আমার যায় আর কি।



চঞ্চলের কথা শুনে অনিল প্রথমে হেসেই ওঠে। পরে প্রশ্ন করে—কি হয়েছিল আবার? ট্রামে বাসে কত কাণ্ডটাই না ঘটে।

পায়ের অবস্থা যায় আমার। আর অন্যলোক ফোড়ন দিয়ে বলে কি না ট্যাক্সিতে যান না, অত যদি পা-বাঁচিয়ে চলতে চান। আমি বলার মধ্যে বলেছি পাটা ঠিকভাবে রাখুন। বাস, তার জন্যে কথার জ্বালা কি?

অনিল বলে—যাক সে জ্বালা তো বোধ হয় জুড়িয়েছে, এখন বোধহয় ট্রামের দশটাকার মহিলার জ্বালাটা রয়েছেই—কি বলিস?

—আবার বাজে কথা। চঞ্চল বিরক্তি ভাবে বলে ওঠে।

অনিল বলে চলে—না না, ভাই। মনের কাছে একবার প্রশ্ন করতো চাঁদ—দেখই না কি বলে? অনেক দেখেছি আরো দেখবো। কোথায় থাকে কি, কে বলতে পারে? দেখতে তো ভালোই হবে, না হলে মনে একেবারে জ্বালা ধরিয়ে দিতে পেরেছে!

বেশ সেই গবেষণাই চলুক। আমি চলি। চঞ্চলের কথা শেষ হতে না হতেই চামেলী নিশ্চিন্ত মনে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসে হাজির হয়।

চামেলী আবার এসেই বলে বসে—কি মশাই, এবার বন্ধুর জন্যে একটা সৎকর্ম করুন। স্বামীর উদ্দেশ্যে কথাগুলি রসিকতার ছলে নিক্ষেপ করে।

—কি সৎকর্ম গো?

—আর ন্যাকামো না করে বলেই ফেলো না যে সম্বন্ধটার কথা সেদিন হচ্ছিল।

—ও হ্যাঁরে হ্যাঁ চঞ্চল, চামেলী ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছে। আমার এক আইন ব্যবসার মুরুব্বি উকিল মারা গিয়েছেন গত বছর। তাঁর একমাত্র কন্যা আছে বিয়ের উপযোগী, যদি পচ্ছন্দ হয় তো দেখ না। এটাই চামেলীর সৎকর্ম বলে রসিকতা।

—অর্থাৎ আমার পক্ষে যা সৎকার বিশেষ।

চামেলী বলে ওঠে—ছিঃ ছিঃ এ কি রকম কথা বলা।

অনিল বলে—যা বাব্বা, শুভকাজের কথায় অশুভ শব্দ আনা কেন? তা হলে কি ট্রামের সেই মহিলায়···

চামেলীর চোখ দুটো চঞ্চলের দিকে উৎসুক ভরা প্রশ্ন নিয়েই যেন চাইছে। অনিলের কথা শেষ হয় না। চঞ্চল বলে উঠলো—মেসের বাসিন্দার বিয়ের সখ, বামুন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার নেশা আর কি!

—খুব হয়েছে। চামেলী কি কথা বলতে চায়। তার আগেই অনিল বলে ওঠে—কুছ পরোয়া নেই, ভাই এ পাড়াতেই ঘরভাড়ার ব্যবস্থা দেখছি, তা হলেই হবে তো ?

—বাবা, একেবারে উঠলো বাই তো কটক যাই।

—ঠিক ঠিক, মনটা স্থির করে ভাবুন। তবে তো।

চামেলীর কথায় অনিল সায় দিয়ে বলে ওঠে—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, তুই ভালো করে ভেবে দেখ এবং ভেবে ঠিক করেই ফেল যে বিয়ে করবিই—যাকে হোক।

—অর্থাৎ মনের মধ্যে স্থির করতে বলেই দেওয়া হয়ে যাচ্ছে তোর কথায় রাজি হতে। ভারী চালাক। উকিল বলেই কি কেবল কথার চালাকি করবি, স্থান কাল পাত্র ভেদ রাখবি না ভাই। ভালো হয়েছে আজ এসে ?

—না না, রাগ করছেন কেন ? চামেলী সামলে নিতে চায়।

—অনিল, বড়ই চালাক, তবে আমি কি অবস্থায় আছি-তা তো সবাই জানে না। জানলে কি কেউ আমায় পাত্র বলে গণ্য করবে ?

—আচ্ছা ভাই চঞ্চল, দেখাই যাক না।

স্বামীর কথা শেষ হতেই চামেলী বলে বসে—আচ্ছা বা-বা, ঠিক আছে আমরা সে ভার নিয়ে দেখিই না।

—ঠিক বলেছে চামেলী। চঞ্চল, তুই আমাদের ওপর এ আস্থাটুকু রাখই না ভাই।

—রাখ দিকি নি যত সব ঘটকালীর কথা। আমি যাই, অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছি।

—কটা বাজে ? অনিল প্রশ্ন করে।

—সাড়ে নটা। চামেলী বলে।

—সাড়ে নটা বেজে গেছে। চম্‌কে ওঠে চঞ্চল। আর নয় এবার যাই, ভাই। বলেই দরজার কাছে এগিয়ে যায় চঞ্চল।

—কাল আয় না। অনিল বলে বসে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কালই আসা চাই। চামেলীর অনুরোধ।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।

চলে যায় চঞ্চল। চামেলী আর অনিল তাকিয়ে থাকে চঞ্চলের চলে যাওয়ার ভাবটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। হয় তো অন্য সময় হলে কালই

আমার কথায় রাজি হতো না চঞ্চল, কিন্তু আজ রাজি হয়েই চলে গেল—বেশ মনের মধ্যে দোলাচল গতি যেন খেলছে, যেন খেলছেই।

—এই সময়েই তাকে খেলিয়ে তুলতে হবে ছাদ্‌না তলায়। অনিলের কথায় চামেলী বলে বসে—সেটা পারলেই বুঝবো বন্ধুর মতো কাজ করা হল।

—তা যা বলেছ।

—ঠাট্টা নয় মশায়, যা সত্যি কথা, এ বাঁদী তাই বলে।

—নিজেকে বাঁদরী বলে বসো নি যে এই যথেষ্ট।

—হ্যাঁ, সেটা শুনলেই তো তুমি খুশি হও। অভিমানের সুরে কথা কটা বলে বসে চামেলী। অনিল দলিলপত্তরের কাজ রেখে চামেলীর কাছে এগিয়ে আসে। খুব কাছে। প্রথমে তার দাড়ি ধরে মুখটা ওপর দিকে তুলে ধরতে চাইলে, সে কিছুতেই মুখ তোলে না। তখন অনিল আদরে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে চামেলীর কোমল দেহকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে আনে।

চামেলী আর অনিলের বাহু বন্ধন ছাড়িয়ে মুক্ত হতে পারে না।

অবশ্য এর মধ্যেই যে তার মুক্তির দিগন্ত, আশার আকাশ।

●

—মনীষ বাড়ি আছ নাকি ?

পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে সদর দরজার আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে নেয় ইন্দু কে এসেছেন। কারণ বাড়িতে এখনো তার স্বামী মনীষ মৈত্র ফিরে আসে নি অফিস থেকে। সন্ধ্যের একটু পরেই সাধারণত বাড়ি ফেরে সে। সেই আন্দাজেই বোধ হয় মনীষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেউ—এই ভেবেই ইন্দু প্রথমে সদর দরজা না খুলে জানলা দিয়ে দেখে নিলে। আজকাল যা সব ঘটছে তাই পুরুষ মানুষ বাড়ি না থাকলে বেশ সাবধানে থাকতে হয় মহিলাদের।

জানলা দিয়ে ইন্দু দেখলে মনীষের ইস্কুলের শিক্ষক রসময় বাবু এসেছেন।

ইন্দু তাড়াতাড়ি বসার ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে সদর দরজা খুলে রসময় বাবুকে বাড়ির ভিতরে বসতে আমন্ত্রণ জানায়—আসুন, আসুন মাষ্টার মশাই। ইন্দু এ কথা বলেই প্রণাম করে রসময় বাবুকে বাড়ির মধ্যে এলে।

—কি গো, তোমরা কেমন আছ সব।

—ভালোই একরকম আছি, আপনি অনেক দিন আসেন নি ? শরীর ভালো তো ?

—আর এ বয়সে শরীর, চলছে কোনো রকমে। মনীষ কি এখনো ফেরে নি ?

—এইবার ফেরার সময় হয়েছে, মাষ্টার মশাই। আপনি ঘরে বসুন। সে এলো বলে। আমি আপনার জন্যে একটু চা করি ততক্ষণ।

—না না, মনীষ এলেই করবে, গুরুশিষ্যে একসঙ্গে হবে।

—সেই ভালো। আপনি ঘরে বসুন। আজকের কাগজ একটু দেখতে দেখতেই সে এসে যাবে।

—আচ্ছা মা, আচ্ছা। আমি বসছি, তোমার কোনো চিন্তার কারণ নেই।

ঘরে প্রবেশ করেই রসময় বাবু দেখলেন সামনের দেওয়ালে শ্রীঅরবিন্দ ও মাদারের ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। ইন্দুর দিকে ফিরেই প্রশ্ন করলেন—এই ছবি দুটি এবার নতুন দেখছি বলে মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই, গত বছর আমরা পণ্ডিচেরীতে গিয়ে কিনে আনি।

—রোজ মালা দেওয়া হয় নাকি ?

—না, না, আসছে কাল ১৫ই আগষ্ট তো তাই আজকেই ছেলেকে দিয়ে দুগাছি মালা আনিয়ে ছবিতে ঝুলিয়েছি। পণ্ডিচেরীর ধূপ কাঠি জ্বালিয়ে দিচ্ছি। কি সুন্দর সুবাস, মন ভরে যায়।

—কেন আর ওসব খরচ করবে আজ, কালকেই জ্বালিয়ো।

—তাতে কি হয়েছে ? বলতে বলতেই ইন্দু জ্বালিয়ে দিলে তার পাশের টেবিল থেকে ধূপকাঠি একটা প্যাকেট থেকে নিয়ে। ঘরময় ধূপের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে আরম্ভ করতে থাকলো। গন্ধ ভরা আমেজ সন্ধ্যার উত্তরণকে মোহময় করছে।

—কি খবর মাষ্টার মশাই ? মনীষ এ কথা বলেই প্রণাম করলে ঘরে ঢুকে। পকেটমার যাওয়ার কথা চেপে যেতে হবে মনীষ ঠিক করে।

—এসো গো এসো।

—বাবারে তোমার আর বাড়ি ফেরার সময়ই হয় না যে ?

—না গো ইন্দু, আজ একটু সমবায়িকায় গিয়েছিলুম লিণ্ডসেতে টুকিটাকি জিনিস কিনতে—কাল ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের ছুটি, শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনের উপলক্ষে দু'একজন আসবেন—তাই এই সব···।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হাতের জিনিসগুলো দাও রেখে আসি। চা টা খাবে

তো মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে, না কি তাও কালকের জন্যে রেখে দেবে, আরও কি যে করবে তুমি তাই ভাবি ?

রসময় বাবু এর মধ্যে আর কোনো কথা বলতে পারেন নি, এবার বললেন —তুমি গতবার পণ্ডিচেরী আশ্রম গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই, আপনি কি করে জানলেন ?

—এই তো বৌমার মুখে শুনছি। হঠাৎ এ···

—ওহো, তাই তো আপনি তো প্রায় বছর কাটিয়ে এলেন এবার।

—তা তোমার বাবা কোথায় ? রসময় বাবু এই প্রশ্ন করার মুহূর্তেই ইন্দু আবার এসেছে। সে ভাবছে প্রশ্নটা তাকেই বোধ হয় রসময় মাষ্টার করেছেন। উত্তর দিলে—দুর্গাপুর গিয়েছেন মাকে নিয়ে।

—সেখানে কি ?

—ভিলাই থেকে নন্দাই দুর্গাপুরে বদলি হয়ে এসেছেন গত জানুয়ারী মাসে। এসে পর্যন্ত বাবা-মাকে দুর্গাপুরে যাবার কথা লিখেছেন। তাই এবার গিয়েছেন।

—তোমার ছেলেটি কই ?

—সে গিয়েছে ক্লাবের দলের খেলা দেখতে। এই এলো বলে। বলেছে যদি আজ জেতে তা হলে খাওয়া দাওয়া হবে, ফিরতে দেরি হবে।

—আশা করা যাক "নীষপুত্রের দল জয়লাভ করেছে, কি বল বৌমা।

—নিশ্চয় মাষ্টার মশাই, সেই প্রার্থনাই করুন। এখনো যখন ফিরে আসে নি···।

ইন্দুর কথা শেষ করার আগেই মনীষ দেখলে ছেলে মণি সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ি ঢুকছে। জামা-প্যাণ্ট কাদায় মাখামাখি, ছেঁড়াখোড়া, চুল উস্কোখুস্কো। এই দেখেই মনীষ চমকে যায়। বলে ওঠে—কি ব্যাপার মণি, তোর এমন অবস্থা কেন ?

মণি হচ্ছে মনীষের চোদ্দ বছরের একমাত্র ছেলে। ক্লাসের মধ্যে পড়ায় ভালো এবং খেলাধুলোয়ও সখ আছে। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে। দোহারা চেহারা, ফরসা রঙই বলা চলে—সেই হিসেবে সুশ্রী, সুন্দর স্বাস্থ্য।

ইন্দু এগিয়ে এসেছে মণির কাছে।

রসময় বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন মনীষের সঙ্গে। এইবার তিন জনেরই প্রশ্ন ভরা চোখ চেয়ে থাকে মণির মুখের দিকে।

মণি বলে—সব বলছি গো, আমি একটু পরিষ্কার হয়ে নিই।

—আচ্ছা আচ্ছা, চল।

ইন্দু ছেলেকে হাত ধরে বাড়ির মধ্যেই নিয়ে চলে যায়।

মনীষ আর রসময় বাবু হতবাক্।

বসুন মাষ্টার মশাই, ঘরে বসুন। ঘরের মধ্যে বসেছে দুজনে। মনীষের মনটা অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। রসময় বাবুই কথা আরম্ভ করেন।

—এই তো সেদিন আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের সুধীর বাবুর ছেলে খেলতে গিয়েছে ক্লাবে যেমন রোজই বিকেলে খেলতে যায়। সেদিনও তেমনি খেলতে গিয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, রাত হয়ে গিয়েছে—ছেলে আর ফেরে না। খোঁজ খোঁজ, কোনো হদিস নেই—শেষে থানায় খবর নিয়ে জানা গেল একদল ছেলেকে ধরে নিয়েছে, তারা থানায় আছে। দুদলের মধ্যে কি নিয়ে মারামারি লাগে, পুলিস তাই ধরেছে। সুধীরবাবু ছেলের সন্ধান পেলেন তার মধ্যে। এখন কলকাতায় কখন যে কি হয় কিছুই বলার নেই। তোমরা এক রকম ছাত্র ছিলে আর এখন সব আরেক রকম ছাত্র। কি আর করবে বল মনীষ, এরই মধ্যে নিজের ছেলেটিকে সামলে সুমলে রাখো।

একটা দীর্ঘশ্বাসই প্রায় ফেলে বলে ফেললে মনীষ—তা, মাষ্টার মশাই সেই চেষ্টাই তো করছি। জানি না কি হবে।

—দেখো মনীষ, এই যে, যুগের হাওয়া বইছে তাতে কি যে কখন হয় কিছুই বলা যায় না। পরিবর্তনটা সব যুগেই হয়েছে এবং হবেও। আমরা যখন ছোট তখন বাবাদের আসরেও আলোচনা ছিল যুগটা কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই যেন মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই পারা যায় না। আবার দেখো, আমরাও বলছি সেই মতো কথাই। আবার দুদিন পর থেকেই তোমরাও বলতে থাকবে কি যে যুগের হাওয়া কিছুই যেন ঠিক পাওয়া যায় না।

—তবে কি জানেন মাষ্টার মশাই, এই যে যুগটা আরম্ভ হল এর মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন আছে। নতুন উদ্দামতা।

—আমরা মনীষ আগে ডি. এল. রায়ের গানে শুনতুম যার ভাব হচ্ছে—একটা নতুন কিছু কররে ভাই—সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক।

—অতটা ভাবার মতো মাঝে হয়েছিল ঠিকই তবে সেই দুঃস্বপ্নের পর একটা সুস্বপ্ন যে আসছে তার যেন পদধ্বনি শোনা যায় গত দশকের প্রজন্মের মধ্যে। কিশোরেরা এখন অনেক ভালো হবারও মন পাচ্ছে—শ্রীঅরবিন্দ

বলেছেন, সার্বিক জাগৃতি, সকলের মধ্যে একটা অতিমানসের অবতরণে জ্যোতির্লোক আসন্ন।

—এইরে, তুমি দেখছি, পণ্ডিচেরী গিয়ে একেবারে ভাবের জগতে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছ।

—না না, তা নয়।

—তবে কি? তোমার ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঐ ছবিগুলো আমি বরাবর দেখেছি এবং তাঁদের ভাব-ভাষা-চিন্তা বুঝতে পারি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বাণী ঠিক ধরতে পারি না, তাঁর কর্মধারা তো নয়ই।

মনীষ প্রথমটা ভাবে এর উত্তর না দেওয়াই ভালো। কিন্তু তার পরই মনে হয় চুপ করে থাকলে যদি তাঁর কথায় সম্মতি প্রকাশ পায় তাই বলতে থাকে—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বা বিবেকানন্দের কথা বাদ দিয়ে নয় তাঁদের অনুসরণ করেই শ্রীঅরবিন্দ যে প্রজ্ঞায় উপনীত হয়েছিলেন সেখানেই তো আধুনিক যুগের অথবা আগামী যুগের পথ নির্দেশ।

—কি জানি বাবা মনীষ, তোমার সংসার রয়েছে, তুমি আর ওসব নিয়ে নাই বা ভাবনা চিন্তা করলে।

—আমি কতটুকু ভাবি বলুন, সাধ্যই বা কি? সংসারই তো করছি। তবে আপনি কথাটা তুললেন তাই বলেছি যা শুনেছি বা জেনেছি। অবশ্য জানা বলতে যা বোঝা। তা কিছু নয়।

এমন সময় ইন্দু ছেলেকে নিয়ে ঘরে এলো। ফলে কথার মোড় ঘুরে গেল। কি হয়েছিল মণি? দুজনেরই এক প্রশ্ন।

ইন্দু দুথালা খাবার রাখলে টেবিলে। কয়েকটা করে ত্রিকোণ পরোটা আর ফালা ফালা করে লক্‌লকে জিবের মতো ভাজা কুমড়ো যেন কয়েকটা আমসত্ত্বের চাকলা।

—চা আনছি। নিন আরম্ভ করুন।

রসময় বাবু বললেন—এত সব কেন বৌমা?

—কতদিন পরে এলেন বলুন তো। এ তো সামান্য দিয়েছে। কথা বলতে বলতেই মনীষ পরোটার পরত ছিঁড়তে আরম্ভ করে। তার বড় প্রিয় জলযোগ ত্রিকোণ পরোটার সঙ্গে এই কুমড়ো ভাজা।

মণি বলে—জানো বাবা, আজ একেবারে আমাদের ভ্রাতৃসংঘের জেতবার মুখে 'নবশক্তি সংঘ' এমন ঝগড়া শুরু করলে যে আমাদের গোপাল বাবুর মাথা

ফেটে গেল। আর আমাদের খেলোয়াড়দের ধরে মারতে আরম্ভ করতেই তখন আমরা ছাড়াতে গিয়ে একেবারে তুমুল গণ্ডগোল। যাই হোক তখন একটা পুলিশ ভ্যান নিয়ে কালীঘাট থানার বড়বাবু যাচ্ছিলেন তিনি এসে গেলেন মাঠে। তখন নবশক্তি সংঘের ছেলেরা দে পিট্টান। আমাদের বড় ছেলেরাও বাধা দিয়েছে, তবে পিটিয়ে, ওদের বেশ কয়েকটি বাছাধন এবার বুঝবে দৌড়াত্ম করা কাকে বলে। একেবারে গোণ্ডার দল। হেরে যাচ্ছে দেখে মারধোর আরম্ভ করা!

—তুমি কি করছিলে?

—আমি তো বাবা দেখতে গিয়েছি। হঠাৎ মারপিট আরম্ভ হতেই আমাদের খেলোয়াড়দের বাঁচাতে আমিও মাঠের মধ্যে যাই। তখন একটু ধস্তাধস্তি হয়েছে এই যা।

—না না, মণি, তুমি আবার কেন? এ ভাবে এগিয়ে গেলে কেন?

রসময়বাবু কথাটা বলেই মনীষের দিকে তাকালেন। মনীষ কথাটাকে ঠিক সমর্থন করছে না যে তা রসময় বাবু প্রবীণের দৃষ্টিতে ধরে ফেললেন।

—দেখুন মাষ্টার মশাই, এক্ষেত্রে আমি থাকলেও এ ভাবে নিজের দলের সপক্ষে আস্তিন গুটোতুম। কাজেই মণিকে অন্য কথা বলতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আমি একমত এক্ষেত্রে হতে পারছি না।

—কি বলবো বাবা, কি খেলাই না এবার আমাদের দল প্রথম থেকে খেলছিল। ওদের তা সই ছিল না আর কি।

মনীষ শুধু জিজ্ঞেস করলে—তোমার গায়ে তেমন ব্যথা লাগছে না তো কোথাও। যাও মাকে বল—হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে আর্ণিকামণ্ট খেয়ে নাও।

—আসতেই মা খাইয়ে দিয়েছে বাবা। আর ব্যথা তেমন নেই।

—ঠিক আছে তা হলে।

ইন্দু চা দিয়ে গেল দু কাপ দুজনকে।

—কি গো শুনলে মণির ক্লাবের সঙ্গে মারপিটের কথা।

মনীষ ছোট্ট উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

রসময় বাবু বললেন—কি যে হয়েছে এখন সব ছেলেদের মন, কিছু ভাবা যায় না।

—শুধু ছেলেদের কেন, বড়দের? এই তো আজকে ট্রামে উঠেছি হাতে

নিয়েই থাকছ। আমার মনে হত কলকাতায় গিয়ে তোমার গবেষণার ভালোভাবে সুযোগ করে দিই যাতে কোনো কলেজে অধ্যাপিকার কাজ পেয়ে যেতে সুবিধে হয়। আমার সমস্ত স্বপ্ন সমস্ত আশা যে কি ভাবে সফল হয় সেই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়েই বিদেশের দিন কাটছিল। হঠাৎ এলো এক বিপর্যয়। যা ভাবা যায় না যা আমি স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবতে পারি নি। তুমি বলবে সে আবার কি? তা অবশ্যই তোমার ভাবা অন্যায় নয়।'

শর্মিলারও এই পর্যন্ত পাঠ করে অত্যন্ত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা উৎপাদন হয়েছে। সে দ্রুত প্রথম পৃষ্ঠা উল্টে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চোখ রাখে। লিখছে—'মানুষ ঘটনাচক্রের দাস—ছাত্রজীবনে এ কথা শোনা ছিল। কিন্তু তখন এর মর্মার্থ বুঝতে পারি নি বা বুঝতে চাই নি। আজ আমার কাছে এমন সত্য হয়ে এবং অনাবৃত ভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে যে আমি বিব্রত, বিভ্রান্ত এবং বিচলিত। আমার দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়ার মতো অবস্থায় বিদেশের শেষ দিকটায় কাটাতে হয়েছে এবং সেটা এমনই অস্বাভাবিক যে সেসব কথা লিখে বলার নয়। আমি জানি না আজ সে কথা বলার আর প্রয়োজনও আছে কি না? না কি মন থেকে সব ধুয়ে-মুছে সাফ করা হয়ে গিয়েছে। কটা বছর যে ভাবে নীরব থাকতে বাধ্য হই সেটা মর্মান্তিক আমার দিকে—দোষ দিই ভাগ্যের। তুমি দেবে না জানি, তুমি বিদ্রূপের হাসি হাসবে, তুমি বলবে পুরুষজাতটাই ওমনি। কিন্তু আমার ঘটনার কথা কে বিশ্বাস করবে? আমি সব কথা খুলে বলবার মতো মনের জোর খুঁজে পাচ্ছি না, বলা সাজে কি না এতদিন পর তাও বুঝছি না। আমার এই পত্র পেয়ে তার উত্তরটুকুও তোমার তরফে আসবে কি আসবে না আজ আর তাও ভাবতে পারছি না। এমন একটা মানসিকতায় উপনীত যে আত্মস্থ হওয়ার ভূমি খুঁজছি।'

শর্মিলা চিঠির পাঠ শেষ পর্যন্ত করেও কোনো সঠিক কিছুই বুঝতে পারলে না দীপ্তেন্দুর কি বক্তব্য যে নীরবতার এবং আবার পত্র লেখার। সবটাই যেন হেঁয়ালিতে ভরা, সবটাই যেন অন্ধকার অমাবস্যার। জ্যোৎস্নার নীল সন্ধ্যার আলো কি আসবে না? তারও জীবন উত্তর তিরিশে—উৎকণ্ঠিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত কিন্তু উৎক্ষিপ্ত নয়, স্থিতধী।

শর্মিলা আবার অনেকদিন পর তার নীল চিঠির প্যাড বার করলে। দীপ্তেন্দুর সঙ্গে কথাই ছিল হলুদে কাগজের ওপর সবুজ কালিতে চিঠি দেবে শর্মিলাকে আর দীপ্তেন্দুকে শর্মিলা দেবে নীল চিঠির প্যাডে লাল কালিতে।

আজও তাই শর্মিলা নীল চিঠির প্যাড আর লাল কালির দোয়াত নিয়ে উত্তর লিখতে বসছে।

সুশোভন এমন সময় ঘরে এসে যাওয়ায় সেসব তুলে রাখলে দেরাজে। সুশোভন এসে বললে—মা তোমায় খেয়ে নিতে বলছে দিদি। যাও খেয়ে এসো।

—হ্যাঁরে যাই। বলেই তার মনে হল—কি খাব? দীপ্তেন্দুর এই চিঠির পর কি খাওয়া রুচবে, না রাত্রে ঘুম চোখে নামবে? আবার যেন দীপ্তেন্দুর চিঠিটি পড়তে ইচ্ছে করছে তার।

উঠতে গিয়েও বসে যায়। সুশোভন ঘরের মধ্যেই কি যেন ঘাটাঘাটি করছিল। ধমক দিয়ে ওঠে শর্মিলা—সব কিছু তছনচ করে রেখো না বলছি ভাই, তোমার তো আবার গোছানোর স্বভাব নেই।

—না না, আমি কিছু তছনচ করি নি। আমার সাদা কেডস্ জুতোটা কোথায় রেখেছি তাই খুঁজছি।

—কেন সাদা কেডস্ কি হবে?

—কাল যে ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস। স্কুলে পতাকা উত্তোলনের সময় ভোরে সাদা পোষাকে যেতে হবে আমাদের।

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—বারে, তোমাদের স্কুলেও তো হবে। ভুলে গেছো না কি? কি ভুলো যে তুমি, তা আর কি বলবো!

—বড় ওস্তাদ হয়েছিস।

—বারে, ওস্তাদের কি কথা হল দিদি?

—থাক, আর তোকে বকবক করতে হবে না।

—ঠিক আছে তুমি মায়ের কাছে যাও খেতে। মা ডাকছেন।

শর্মিলা চিঠি লেখা রেখে মায়ের কাছেই গেল খেতে। না হলে মায়ের কাছে আবার দৃষ্টিকটু মনে হবে—আর পারে না যেন সব দিক সামলে চলতে। সংসারে সবাই অপরের খুঁত ধরতেই ওস্তাদ।

মা থালা সাজিয়ে রান্নাঘরে বসে রয়েছেন আর টুকিটাকি কাজ শেষ করছেন। শর্মিলা বললে—মা তুমিও বসো না। আর রাত করবে কেন?

—হ্যাঁ, মা তা ঠিকই, এই বসছি। তুই আরম্ভ কর, আমিও নিয়ে নিচ্ছি।

—আমি দিচ্ছি তোমায়।

—না রে আমি গুছিয়েই রেখেছি, এই দেখ।

মা দেখালেন ওপাশে রাখা কাঁসি চাপা খাবার থালা।

শর্মিলা দেখলে মা তার প্রিয় উচ্ছে আলুর ছোঁকা দিয়েছেন অনেকখানি। বেগুন ভাজা আলু ভাজা আর ছোলার ডাল। তার ওপর আবার পেঁপের চাট্নি।

—মা তুমি এত সব করতে গেলে কেন বলতো? আমি তোমার কাজে কিছুই সাহায্য করতে পারি না, কেন তুমি এত কর?

—দূর বোকা মেয়ে, মা কি কখনো মেয়ের সহযোগিতা কাজে পাবে ভেবে করে। তুই যবে মা হবি তবে এর মর্ম বুঝবি।

কথাটা বলেই মা যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান।

শর্মিলাও খেতে বসে, খাওয়ার থালার রুটি তরকারি নিয়ে নাড়া চাড়া করতে থাকে আর মনটা কেমন যেন করতে থাকে। বুকের ভেতরটা ছটফট করছে—রাজস্থানে গিয়ে জেনে আসতে দীপ্তেন্দু কি বলতে চায় তাকে।

—কেন এতদিন লুকিয়ে থাকলে দীপ্তেন্দু, কেন কেন?

খুব তাড়াতাড়ি চিন্তার তোলপাড় চলছে শর্মিলার মনে। ছুটছে চিন্তার রাজ্যে। কিন্তু দ্রুততালে খেয়ে উঠতে পারছে না। ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। মা উনুনে জলের হাড়িটা গরম হতে দিয়ে খেতে বসলেন শর্মিলার দিকে মুখামুখি হয়ে। মাও দেখতে লাগলেন মেয়েকে সে যেন কোনোক্রমে খেতে হয় তাই মুখে রুটি-তরকারি দিয়ে গ্রাস তুলছে। অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ খেয়ে যায় মা মেয়ে। কেউ কোনো আর কথা বলে নি। মায়ের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসছে কিন্তু মেয়েকে তখনও টুকিটাকি করে জোর করে খেতে দেখছেন।

একবার মনে হ'ল বলেন—কি রে রান্না ঠিক হয় নি না কি?

শর্মিলাকে কোনো প্রশ্ন মা আর আন্দ করলেন না। কোনো ভাবে খাওয়া শেষ করে সে। শেষ দুখানা রুটি আর যেন শেষ করতে পারে না।

শর্মিলা বললে—মা, আজ আর দুটো রুটি খাব না, লক্ষ্মী মা আমার। তুমি কিছু মনে করো না।

—আচ্ছা আচ্ছা থাক তা :হলে। যা পারিস তাই খা। উঠে নিয়ে শুতে যা বরং। সারাদিনের পরিশ্রম।

মা সহানুভূতির সঙ্গে মেয়ের প্রতি কথাগুলি বলেন।

দীপ্তেন্দুকে নীলকাগজে লালকালিতে শর্মিলা সেই রাত্রিতেই চিঠি লিখলে—সে যেন কলকাতায় আসে এবং তার কথা সবই পত্রে লিখতেও পারে। রাত্রে ঘরে আলো জ্বালিয়ে মেয়ে পড়ালেখা করে তা মা জানেন। আজও তাই করছে ভেবে তিনি আর মেয়ের কাছে না এসে হেঁসেল গুছিয়ে-গাছিয়ে গরম জলের ব্যাগে জল নিয়ে শুতে চলে যান নিজের ঘরে। বিধবা মানুষ, বয়স হয়েছে। বাতের ব্যথাটা তাঁর যন্ত্রণা দেয় মাঝে মাঝেই। গরমজলের ব্যাগ দিয়ে রাত্রে তাই প্রায়ই সেঁক নিতে থাকেন।

শর্মিলার মন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছুতেই সবুর সয় না, দীপ্তেন্দুর কি হল এমন? লালকালিতে নীলকাগজেই কথামত লিখলে—'এত কষ্ট দেওয়ার জন্যেই ভগবান আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাই আমার শৈশবের প্রথম পর্বে বাবাকে হারাই মা আমাকে আর ছোট ভাইকে নিয়ে অথৈ জলে পরলেন। সামান্য এই মাথা গোঁজার মতো বাড়িটুকু ছিল তাই রক্ষে হয় আমাদের তিনটি প্রাণ। মামার যৎসামান্য কেন, সে সময় অসামান্য উদারতায় আমাদের জীবনে দাঁড়াবার পথ হয়। তার পর যা, তা সব তো লেখা যায় না। কত কষ্টে যে লেখাপড়া করে ভদ্রসমাজে দিনকাটাতে হয়েছে সে আমরাই জানি। সেবার বৈদ্যনাথধামে তোমার সঙ্গে আলাপ দৈব যোগাযোগ বলেই মনে করি। মামার সঙ্গে আমরা যাই সেখানে। মামার তো কেউ নেই আমাদের নিয়েই থাকতেন। যা সামান্য পুঁজি ছিল তাঁর সবই তিনি আমাদের সংসারে দিয়ে ছিলেন। তাই তাঁর অসুস্থতায় আমরা বেশ বিচলিত হয়ে পড়ি। সেখানে তুমি এসে কি ভাবে যে আমাদের রক্ষা করলে তা আমরাই জানি। শেষে মামা মারা যেতে সব দায়িত্ব গিয়ে পড়লো তোমার ওপর। কলকাতায় এসে মামার শ্রাদ্ধ থেকে আরম্ভ করে সব সব, কি লিখবো আজ। ভাবলে মন কৃতজ্ঞতায় প্রণতি জানাতে পারে শুধু। তোমার বিরাট হৃদয়। তুমি নিজের উচ্চতর পড়ার সঙ্গে আমাদের সংসার দেখারও দায় যুক্ত ভাবে নিলে। আমি শিক্ষিকা হই তাও তোমার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু আমিই জোর করে সে কাজ করেছি। সুশোভনকে পড়ানোর কাজ আর মায়ের সংস্থান তো নিজে করি এটা মনে মনে আশা হয়। তোমার উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ যবে নিলে বিদেশের ডাকে তখন মনটা গর্বে ভরে উঠলো। আমিও দেখি গবেষণা করে ডক্টরেট হতে পারি কিনা? বড় ভালো লাগতো নিজেকে উপযুক্ত করতে। আমার এ দেহকে দেবালয়ের প্রদীপ করতেই তো চেয়েছি তোমার কাছে দীপ্তেন্দু—

এসো, বল সব কথা, পত্রেও সব কথা লেখো—আমি তো তোমারই প্রতীক্ষায়। কি করে ভুলে যাব অসময়ের নিঃস্বার্থ সাহায্য ও সহানুভূতি এবং দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা গভীর প্রেম বা ভালোবাসা বা যা হয় বল তুমি। মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর যে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দিন যায় না। বাড়িতেও মায়ের মনে নানা প্রশ্ন জাগছে। কি বলি? উত্তর দাও।'

এইখানে শর্মিলা নামটুকু লিখে চিঠি শেষ করে। খামে চিঠি রেখে ঠিকানা লিখে ইস্কুলে যাওয়ার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখলো।

ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকে শর্মিলা। আলস্য এবং মাথায় অস্বস্তি।

ঘুম এসেও মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কেন, কেন, দীপ্তেন্দু পত্র আর লেখে নি এতদিন? কি এমন হল যে পত্র আর লেখা গেল না বা লিখতে মন চলে গেল! কেউ কি মন্দ কথা লিখে তার সঙ্গে দীপ্তেন্দুর মনের বিচ্ছেদ করিয়ে দিয়েছিল? মানুষের স্বভাব তো বড়ই দুর্জ্ঞেয় কখন কে যে কি বলে কি ভাবে বোঝা যায় না! ভালোর চেয়ে লোকের তো মন্দটাই করায় মন সহজে চায়। ভালো কজন করে। দীপ্তেন্দুর তুলনা হয় না। সে যা করেছে এই সংসারের জন্যে অভাবনীয়।

কিন্তু কি হয়েছিল। কিসে তার ভাগ্যেরই পরিহাসের কথা আজ মনে হয়েছে? কিসের জন্যে। তার তো বিদেশ থেকে ফিরেই শুভকাজের কথা ছিল। তবে কেন চিঠিতে ভাগ্যের দোহাই দিয়েছে? কেন, কেন?

শুধুই অশান্ত প্রশ্ন। ঘুম আর হয় না।

মা শুতে গিয়েছেন কিন্তু কণ্টক শয্যা মনে হচ্ছে তাঁর। ছেলে আর বিরহী মেয়েকে নিয়ে সংসার। দীপ্তেন্দুর মতো ভালো ছেলে যে বিদেশে গিয়ে শেষে সে তাঁদের একেবারে ভুলে যাবে ভাবতেই পারেন নি কখনো। কত সুন্দর ব্যবহার ছিল তার। বক্সিনাথে কি অসম্ভব দিনেই না সে আমাদের পাশে এসে সব ঝড়ঝাপ্‌টা সামলে দিলে। তার পর থেকে মা বলতে তো সে অজ্ঞান ছিল। মেয়েকে পড়াশুনার সব ব্যবস্থা করে দেওয়া। সুশোভনের প্রাথমিক পড়ার ব্যবস্থা। আমার শরীরের জন্যে ডাক্তার দেখানো—বাড়ির মেরামতি—কি নয়! যখন যা প্রয়োজন সবটুকু দীপ্তেন্দু করেছে।

আমাদের বুঝতেই দিতো না যে শর্মিলার বাবা নেই বা মামা নেই।

শর্মিলার বাবা গত হবার পর দাদা যদি না এগিয়ে আসতো তা হলে তো

আমার ভরাডুবি হতে আর বাকি থাকতো না। তার পর দাদার শেষ সময় থেকে দীপ্তেন্দু এলো।

ভাগ্য আমার কি ভাবে যে ভগবান গড়েছেন তিনিই জানেন। এখন যে মেয়ের ইস্কুলের চাকরির রোজকার তাই সম্বল। অথচ সেই মেয়ের মনেও শান্তি এলো না, সুখ এলো না—সান্ত্বনা দেবো কি কথা বলে। আমি তো মেয়েছেলে। ভরা যুবতি সে এবং রোজগারী মেয়ে, তার মন আছে তার দেহ আছে—জানি না আবার কারো সঙ্গে যদি প্রেম হয়ে থাকে, হতেও পারে। কিছু বলার নেই। কত দিন আর এই ভাবে বসে থাকবে? কতদিন হয়ে গেল আর তো দীপ্তেন্দুর চিঠি আসে না। কোনো খবরই নেই তার।

জানি না কি হবে?

আজ যার চিঠি এলো, সে কে? কেমন ছেলে সে?

যেমনই হোক, যাক একটা সংসার পাতুক। সুশোভন তো ভালো ছেলে ইস্কুলে প্রথম হয়, বলে জলপানি পায়, আর অন্য খরচ—হবে যেমন করে হোক। না হয় রাস্তার ধারের একটা ঘর ভাড়া দিয়ে মায়েবেটায় ভিতর দিকের একটা ঘরে দিন কাটাবো। মেয়েটার সুখের জীবন আসুক। সময় বয়ে যাচ্ছে, আর নয়। ভগবান, মুখ তুলে চাও।

ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে যায়। মায়ের আর ঘুম হয় না।

তিনি দেখলেন শর্মিলা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে আসছে তার কাছে।

—তোমার এখনই কিছু কি আনবার আছে? জিজ্ঞেস করে শর্মিলা।

—না রে। এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস?

মাকে শর্মিলা কোনো কথা লুকোয় না। সব কথা মায়ের সঙ্গে হয়। তবু আজ শুধু বললে—একটা জরুরী চিঠি ডাকঘরে গিয়ে এখনই ছেড়ে আসছি মা। তুমি ততক্ষণ কাপড় ছেড়ে তৈরি হও, আমি এসে চা খাবো।

মা এর পর আর কোনো প্রশ্ন করলেন না।

মেয়েও কোনো কথা আর না বলে পথের দিকে পা বাড়ায় বেশ ব্যস্তবাগিশ ভাবে। প্রথম ডাকেই যেন চিঠিটা রওনা করা যায়।

তীরে এসেও তরী প্রায় ডুবতে গিয়ে ছিল, এখনও সময় আছে তীর যদি ছুঁতে পারা যায়!

অথবা ডুবন্ত মেয়ে একটু খড়কুটোর স্পর্শ পেয়েছে চিঠিটুকুতে।

ক্ষীণ আশা নিয়ে চোখের সামনে সকালের রোদ—আশ্বাস পেতে চায় শর্মিলার মন।

স্বর্ণ রায় নিজের ঘরের মধ্যে বসে আছে। ভোরের রোদ পূবদিকের জানলা দিয়ে বিছানায় বিছিয়ে রয়েছে।

মনের অন্ধকার কোণটায় আলোয় ভরে উঠলো।

সে ঘুমের থেকে উঠে ভাবছে কলেজের সহপাঠিনী পূরবীকে এতদিন পর কালকে অফিস ফিরতি ট্রাম থেকে নামার পরেই যেন বেশি করে মনে আসছে। ফিরে ফিরে তার সমস্ত চলা-বলা বসা-দাঁড়ানো সবই যেন চোখের পর্দায় চলচ্চিত্র হয়ে উঠছে। অথচ আশ্চর্য এতদিন তো কোনো আলোড়নই ছিল না তার মনে। যেন কোন অতলের সমুদ্রগর্ভে ছিল বিস্তৃত বসতি।

হ্যাঁ, বিস্মৃতির অতলেই তো তার বসতি।

কারণ পূরবী তো এখন আর স্বর্ণ রায়ের নয়।

হালফ্যাসনী কোনো এক উঠ্‌তি বড়লোকের বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে একমাত্র পুত্রের সঙ্গে।

তা হোক। কিন্তু তার চিঠিগুলো তো এখনো রয়েছে স্বর্ণের কাছে। কি সুন্দর হাতের লেখার ছাঁদ ফুটে উঠতো। যেন মুক্তোর মতো।

স্বর্ণ রায়ের বিছানা ছেড়ে ওঠার ইচ্ছেটা আজ যেন আর হচ্ছে না। মনে মনে হারানো দিনের চলচ্চিত্র চোখ বুজে বুজে দেখতে ইচ্ছে করছে। এমন সময় বাবার যেন গলা পাওয়া গেল। তিনি ডাকছেন—স্বর্ণ, স্বর্ণ, শরীর ভালো তো? বেশ বেলা হয়েছে, এখনো ওঠা হয় নি, শরীরটরীর···

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়? দরজার কাছে বাবার আসার সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলে—না না, বাবা, শরীর ঠিক আছে। আজ বেলায় দেরি হয়ে গেল উঠতে।

—তা হোক, শরীর ভালো আছে তো, তা হলেই হল। আমি চা করে রেখেছি।

বাবার আরো কথা বলার আগেই স্বর্ণ বেশ লজ্জিত ভাবেই বলে ওঠে—সে কি? আপনি করলেন কেন? চা তো আমিই উঠে করি।

—তা তে কি হয়েছে স্বর্ণ, এতদিন তো আমিই তোর সব কিছু করে আসছি, এই ক'বছরই না হয় তুই করছিস। তোর মা চলে যাওয়ার পর থেকে আমার বুড়ি মা যা হোক করতেন তার পর তো আমারই সব দেখার দায়িত্ব হল।

—আপনি আবার কেন বলছেন, এ সব কথা।

—না বলে আর উপায় কি, তুই আমার কথা তো আর রাখছিস না। বৌমাকে ঘরে আনার কত ইচ্ছে।

—থাক, এ সব কথা এখন।

—থাক কেন বাবা! আমি তো বলেছি, নিজে দেখেই করবি, আমি একবার খোঁজ পেলেই দেখে আসবো।

—সে কি? এ সব কি কথা বলতে আরম্ভ করলেন সকাল হতে না হতেই। আমি কি ঘরছাড়া হব না কি।

—থাক থাক, ও কথা উচ্চারণ করার কি আছে—আচ্ছা পরে কথা হবে। এখন গিয়ে চা পান কর সকালের।

বাবার কথার শেষটা স্বর্ণ রায় শুনলো কি শুনলো না। সে ঘরের বাইরে চলে যায়। বাবাও নিজের ঘরের দিকে চলেই যাচ্ছিলেন।

স্বর্ণের টেবিলের দিকে চোখ যেতেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকলেন একটুক্ষণ। ভালো করে দেখলেন, টেবিলের ওপর কাগজ চাপার নিচের একটা খামের ওপর স্বর্ণ রায় নামটা, লেখার ছাঁদ মেয়েলীহাতের বলেই মনে হল। বারবার দেখে তিনি স্থির করলেন—যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। কোনো মেয়ের সঙ্গে নিশ্চয় স্বর্ণ জড়িয়ে গিয়েছে। তারই চিঠি।

সাত পাঁচ ভাবছেন—এমন সময় স্বর্ণ ঘরে এসে যায় তখনই। বাবার আর সেই চিঠিটি দেখার জন্যে নেওয়া হয় না। বাপ ছেলেতে একবার চোখাচোখি হয় কিন্তু কেউ আর কোনো কথা বললে না।

বাবা ঘরের দিকে যাওয়ার জন্যে রওনা দিতেই স্বর্ণ নিশ্চিন্ত হয়।

কি দেখছিলেন তিনি?

স্বর্ণের মনে প্রশ্ন জাগে। চারিদিকে স্বর্ণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখতে থাকে আর চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

বাবার পুত্রস্নেহের মায়ায় জড়ানো আদরের স্পর্শ যেন পায় চায়ের প্রত্যেক চুমুকে স্বর্ণ রায়—মাতৃহারা স্বর্ণ রায়।

—কি করছিস? আবার বাবা আসছেন স্বর্ণের ঘরে।

—এই যো চায়ের কাপটা শেষ করছি।

—আজ কি বিকেলে তোর সময় হবে?

—কেন, আজ কি কেউ খেলতে আসবে না?

—না না, আমি সে জন্যে বলছি না।

—তবে ?

—সে কি! এই তো বলে দিলুম একটু আগে যে তোর বিয়ের ঠিক করছি।

—তা আমায় তো কিছু বলবেন? না, কিছুই না বলে সব ঠিক করছি বলছেন। কে করবে শুনি?

—কেন তুই ?

—তা আপনি কি করছেন তা তো একবার বলবেন।

স্বর্ণ বিব্রতভাবে বলে।

—হ্যাঁ, ঠিক কথা। বলার মতো অবকাশটা হল কই ?

—তা তো হবে না জানি, খালি তো পাশার চাল চলবে ; আপনি এর আগে অনেকবার এই রকম সব নানান মেয়েদের বাবাদের ভুগিয়েছেন, আর নয়। তাঁদের রেহাই দিলে ভালো হয়।

—কেন ? কেন ?

—আবার কেন বলছেন। যতবার আপনি ঘটকদের নিয়ে মেয়ে দেখতে যান আর গিয়ে নানান রকম কি সব কথা জিজ্ঞাসা করেন আর তাঁদের মেয়েরা যান চটে। একজন তো রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই করে আমাকেই চিঠি লিখেছে।

—এঁ এঁ সে কি ? আমি তো তেমন কিছু বলি না।

—তবে কি শুধু শুধু আমায় চিঠি দিয়েছে বলছেন ?

—কি লিখেছে ?

—সে আর বলার নয় ?

—তার মানে ? বাবা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেন।

—আমি আর সে সব বলতে পারি না। আপনি নিয়ে পড়ে দেখুন।

স্বর্ণ টেবিল থেকে কাগজ চাপার তলায় রাখা খামের চিঠিটি দিয়ে দেয় বাবার হাতে।

সিদ্ধিনাথ বাবুর মনের আশা সফল হয়। সকালে চিঠি দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, ও লেখা মেয়েলী হাতের। এতদিন স্টেনোগ্রাফার হয়ে তিনি হাতের হরফ ছেলের কি মেয়ের, পাকা কি কাঁচা—বেশ চিনতে পারছেন। সাহেব অফিসে তাই সই মেলাতে হলে তাঁকেই ডাক দিতেন। সিদ্ধিনাথ বাবুর সেটা খুব গর্বের বস্তু। বন্ধু মহলে বলেনও সে কথা।

তিনি চিঠিটি নিয়ে নিজের ঘরে চলে যান।

স্বর্ণ চায়ের কাপ নিয়ে রান্নার ঘরের দিকে যায়। মনে মনে ভাবে—চিঠিটা দেওয়া কি ঠিক হল? বাবার হাতে তুলে দিয়ে কি ঠিক করেছি?

পরে ভাবে উঠোনের টবের গাছগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে—মুখে আর ঐ সব কথা বাবাকে না বলে ভালোই হয়েছে, একেবারে তার লেখা থেকেই দেখুন। তিনি যে ভাবে মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রশ্ন সব করেন। তা কত খারাপ লাগে মেয়েদের। ছিঃ ছিঃ কি যে করেন বাবা, বুঝি না; তাঁর এ সব কি করে জিজ্ঞাসার কথা বলে মনে আসে? কেন যে এমনি ভাবে আমার বিয়ের ভাবনায় তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন? বেশতো পাশার নেশায় মেতে থাকতেন এখন আবার এ সব কি যে করছেন?

যাক, তিনি যা হয় করুন। রান্নার দিকে স্বর্ণ রায় মন দিতে যায়।

অফিস যাবে ভাতটা আর তার সঙ্গে এটা সেটা একটু করতে হবে।

সে সব রেঁধে রেখে যায় বাবার জন্যেও।

তার পর ইচ্ছে হলে বাবা আবার একপ্রস্ত রান্নার আয়োজনও সখ করে করেন তা স্বর্ণকে দেন অফিস থেকে বিকেলে ফিরে এলে।

বাবার সস্নেহের মনটা স্বর্ণকে এই ছোট বাড়ির সমস্ত পরিবেশে আদরণীয় করে রেখেছে। অন্য কোনো কথা চট করে স্বর্ণ মনে করে না তবে কাল থেকে ট্রামের মেয়েটির সামান্য মধুরতা কেন যেন বেশি করে পূরবীকে মনে করিয়ে দিয়েছে—মনেই করছে পূরবীর স্মৃতি অনেক দিনের পর। 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে'—স্বর্ণ খুব মৃদুস্বরে রবীন্দ্রসংগীতটির সুর ভাঁজতে থাকে।

সিদ্ধিনাথ বাবু খুব ব্যস্ত সমস্ত ভাবে খামের থেকে চিঠিটি খুলে দেখছেন। নীল চিঠির কাগজে মেয়েটি বেশ টানা হাতের লেখায় বাংলায় লিখেছে। 'সবিনয় নিবেদন' সম্বোধনে চিঠির আরম্ভ। তার পর লিখছে—'আপনি আমায় চিনবেন না বা চিনতে চাইবেন না আমি কে? তবে এইটুকু জেনে রাখুন যে আমি আপনার বাবার সামনে তাঁর ভাবী পুত্রবধূ হতে পারি কি না তার যাচাই হতে বসে থাকি এবং দাঁড়িয়ে থাকি এবং বসি এবং দাঁড়াই এবং দাঁত দেখাই। পায়ের কাপড় তুলে ধরি তাঁর কথামতো যাতে পায়ের পাতা তাঁর চোখে (জানি না ছানি পড়ছে কিনা) ভালো ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি বড় বড় চোখে দেখলেন এবং আমার মামাদের ও মামীদের কৃতার্থ করলেন।

আমার বাবা মা নেই ; তা না থাক আমি মামা মামীর সংসারের কাজ করে বেশ আছি। ছিঃ ছিঃ তিনি কি করে কাপড় তুলে ধরতে বলেন—'পা'টা ভালো করে দেখি মা'। কথা বলতে জানেন না।

আরো কত। বলেন কি জানেন? 'দাঁত দেখি মা তোমার।' ইঃ ইঃ করে দাঁত দেখাই। মনে হচ্ছিল দিই একবার দাঁতে দাঁত চেপে ভেংচি কেটে দিই। বলেন—'জিব দেখি।' 'হাঁ করতো মা।' তখন মনে হল জিব বের করে বলি—'বুড়ো মিনসে আসছে কালী পুজোয় কালী ঠাকুর দেখো গে যাও। ছেলের বউ দেখে কাজ নেই।' হা করে ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে গিলে ফেলি। এমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে দেখছিলেন। অসভ্য মনে হচ্ছিল কেমন যেন লোকটাকে। হোক আপনার বাবা তিনি।

একবার বলেন—'দাঁড়াও তো মা।' আবার বলেন বসো বসো। আবার প্রশ্ন—এটা সেটা, কাঁচকলা, কত বলি। শেষ নেই যেন। দূর ছাই বলে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু অভদ্রতা হবে বলে মামাদের কথায় বসে থেকেছি, দাঁড়িয়েছি, জিব দাঁত দেখিয়েছি কিন্তু একটা জিনিস দেখানো বাকি ছিল—সেটা এবার দেখাচ্ছি—ভুয়ো, কলা! আমি কাল ফটিকদার সঙ্গে রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ করেছি। ভুয়ো ভুয়ো হেরে গেলেন। আর দেখা করতে চাই না।

ইতি পদ্মা'

কে রে মেয়েটা? মনে আসছে না তো। সেই যাদবপুরে গিয়ে যে মেয়েটাকে দেখি? তা হবে। যাক বাবা আর দরকার নেই ও মেয়েকে। ভালোই করেছে ফটিকদাকে সে বিয়ে করেছে, গেছো মেয়েটা বোধ হয়। বাস রে খুব বেঁচে গিয়েছি। চিঠি পড়া শেষ করেই ভাবতে থাকেন সিদ্ধিনাথ বাবু। তিনি ভাবেন—কি বেহায়া নির্লজ্জ মেয়েরে বাবা! ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি, না না আমি ঢের ঢের মেয়ে আর দেখি কই একমাত্র সুবর্ণের মাকেই যা দেখেছি। মা তো বাবার সঙ্গে পছন্দ করে এসেই লাগিয়ে দিয়েছিলেন আমার বিয়ে, তখন বয়স মাত্র একুশ। আর আজ প্রায় পঁচাত্তর হতে চললো।

কিন্তু সে যাক, সুবর্ণের বিয়ের কি হবে? বড় ভাবালে ছেলেটা।

—যাই দেখি রান্নার কাজ রয়েছে আবার।

সিদ্ধিনাথ বাবু রান্না ঘরে এসে দেখলেন সুবর্ণ সব কাজ গুছিয়ে এনেছে। তিনি বললেন—আমি দেখছি, তুই স্নান করে তৈরি হতে যা, আমি ভাতটা আর ডালটা নামিয়ে রাখছি। ডিমের তরকারি হয়েছে দেখছি।

—আচ্ছা যাই। উচ্ছে আলুর তরকারিটা বাকি রয়েছে। যদি ইচ্ছে হয় শুক্‌তোও করতে পারেন।

—ঠিক আছে রে, ঠিক আছে। আমি তো এতদিন সব করেছি এখনও করছি। অত আমায় বলবার তোর আর দরকার হবে না।

স্বর্ণ আর কথায় কথা না বাড়িয়ে ঘরে চলে যায়। জানে ভালো করেই একরোখা মানুষ তার বাবাটি। এখনই আবার সেই বিয়ে করার কথা ঠিক তুলবেনই।

নিজের ঘরে দেরাজ খুলতে গিয়ে স্বর্ণ দেখলে তার বাবা সেই মেয়েটির চিঠিটিকে টেবিলের ওপর কাগজ চাপার তলায় যথাযথ ভাবে রেখে গিয়েছেন।

স্বর্ণ দেরাজ খুলে একেবারে পেছন দিকে হাত দিয়ে দিয়ে ঘেটে ঘুটে পুরবীর চিঠির গোছা পেলে। তখনই তা পড়তে ইচ্ছে করছে স্বর্ণর। তখনই সব চিঠিগুলোকেই যেন সে চেখে চেখে আবার পড়তে চাইছে। ফিরে যেতে চাইছে পুরোনো দিনে।

কিন্তু হায়, সে সব সোনালি দিন, মন টেনে নেওয়া সহজ দিন!

স্বর্ণ রায় ভাবছে পুরবীকে। যে পুরবী কলেজের ছাত্রী। যে পুরবী তন্বী। চন্‌মনে তবে চটুল নয়। সহাস্যময়ী তবে সাহসী নয়।

চিঠি লিখেছে তবে বেশ রেখে ঢেকে। কোনোটা খামে কোনোটা ইন্‌ল্যাণ্ড লেটারে। প্রথম চিঠি আসে কলেজ জীবনের দ্বিতীয় বছরে। লিখলে—

সুচরিতেষু,

স্বর্ণ, তোমায় সেদিন অর্থাৎ সোমবার বাংলার স্নেহময় বাবুর ক্লাসের পর দেখা করতে বলি কিন্তু আমি সেদিনই ঠিক কলেজে যেতে পারি নি। তুমি খুব রাগ করে আছো নিশ্চয়। এমন জ্বর হল যে এখনও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না। তুমি ক্লাসের নোটগুলো আমায় দেবে কিন্তু। আমি তা টুকে নিয়ে তোমায় ফেরৎ দেবো। তার বদলে তুমি কি কিছু চাইবে ভাবছো? সেটা কি ভালো হবে? দুষ্টুমী একেবারে চলবে না তাও বলে রাখছি। আচ্ছা সে যা হয় হবে। বিছানায় শুয়ে আছি, ঘরে লোকজন এসে যায় মাঝে মাঝেই, তাই থেমে থেমে লিখতে হচ্ছে। আজ এই পর্যন্ত ইতি

তোমারই
পুরবী

কি সুন্দর ঝরঝরে চিঠি। স্বর্ণ মন ভরে দেখে চিঠির এ পাতাটা।

আর একটা চিঠি খাম থেকে খুলতে গিয়েই ঘড়ির দিকে চোখ চলে যায়। সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে।

—এইরে অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে যে!

চললো স্নান করতে।

সামান্য সময়ে খাওয়াটা শেষ করে অফিসে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেয়। সঙ্গে পুরবীর চিঠিগুলো না নিয়ে পা যেন এগোয় না।

প্যান্টের পকেটে যত্ন করে চিঠিগুলো নিয়ে বেরিয়ে যায় অফিসের পথে।

একবার হাত ঘড়িটা দেখে নিলে স্বর্ণ।

—নাঃ এখনও সময় আছে তবে মিনিবাস যদি পায় তাইতেই উঠে বসবে।

সময় মতো অফিসে যাওয়াই তার বরাবরের অভ্যাস।

অফিসে এসে স্বর্ণ তার ঘরে বসবে এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। স্বর্ণ তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরলে।

—হ্যাল্উ। স্বর্ণ বলার পরই বড় সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে ফোনের বিপরীত দিক থেকে।

—ঠিক আছে, আমি এসেছি, কিছুক্ষণ আছি। ...হ্যাঁ, আজ তো শনিবার, ...ঠিক আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ।...নমস্কার।

স্বর্ণ টেলিফোন রেখে :.য়ে বসলো নিজের চেয়ারে।

আজ বড়সাহেব আসবেন না।

স্বর্ণ বসে বসে ভাবছে—সেই পুরবীর চিঠিগুলি দেখি। মনটা যেন তারই মধ্যে রয়েছে। প্যান্টের পকেট থেকে চিঠির গোছা বার করার জন্যে বাঁ পাটা টেবিলের নিচে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত থেকে ওপর দিকে একটু তুলে টান ভাবে রাখলে। তার পর বাঁ হাত দিয়েই চিঠির গোছাটা হাতে ধরে টেবিলে রাখছে, ঠিক এমনি সময় সহকর্মী শান্তনু বসু এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে। স্বর্ণ তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলে সে চিঠিগুলো রাখলে দেরাজের মধ্যে।

—এই তো স্বর্ণ বাবু, কেমন খবর? আজ এখনো আপনার বড় সাহেবের পাত্তা নেই!

—আপনার আবার সে খবরে দরকার কি হলো?

শান্তনু বাবু যেন একটু অভিমান বসেই এর উত্তর দিলেন—আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার কি, তা ঠিকই বলেছেন।

—আরে, না না, আমি কি তাই বলেছি। আপনি তো এ সব কারো খবরই বড় একটা তেমন নেন না, তাই বলছিলুম।

সুবর্ণের এই কথায় তিনি আবার একটু আহতবোধ করলেন। বললেন—সে কি সুবর্ণ বাবু? আমি তো আপনাদের সকলেরই খবর রাখি; বিশেষ করে বলি যে যাদের বিয়ে থা হয় নি তাদের সেসব আয়োজন হলে মিষ্টান্ন কিছু ইতর জন আমরা পাই। তবুও বলবেন আমি কারো খবর রাখি না।

—না না, সে কথা নয়।

—তবে কি কথা শুনি, বলুন।

—না তেমন কিছু নয়।

—তার মানে বলতে চাইছেন তেমনি একটা কিছু। এই তো? তা বলুনই না বড়সাহেবের ছেলের বিয়েটা বিলেতেই হবে, না এখানেও তার একটা পার্টি জমবে। আমরা তা হলে…

সুবর্ণ আর এ সব কথার মধ্যে না গিয়ে বলে বসলো—আচ্ছা, শান্তনু বাবু, আজকের চিঠির ঝাঁপি এখনো পাঠালেন না তো? বড়সাহেবের দরকারী কিছু থাকলে বাড়ি পাঠাতে হবে।

—তার মানে আজ তিনি আসছেন না আর?

—না। সুবর্ণ ছোট্ট উত্তর দিলে। শান্তনুবাবু চলে গেলেন।

একটু পরে এক গোছা চিঠিপত্তর নিয়ে হাজির শান্তনুবাবু।

—এই যে বড়সাহেবের চিঠি সব।

—ঠিক আছে দেখছি, রাখুন।

শান্তনুবাবু চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা, আজ তো বড়সাহেব আসবেন না। তাঁর চিঠিগুলো বেছে নরসিংকে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেই তো হল।

—হ্যাঁ, তা হবে। নরসিংকে ডাকি। সুবর্ণ উত্তর দেয়।

শান্তনুবাবু বললেন—তার পর কিন্তু আপনাকে আজ কেরাম খেলতে হবে আমাদের সঙ্গে।

—আজ থাক শান্তনুবাবু। অন্যদিন ঠিক বসবো। আজ নয়। আজ একটু নিজের কাজ জমে আছে সেইটুকু শেষ করার রয়েছে। কিছু মনে করবেন না। না হলে আমার তো আপনাদের সঙ্গে খেলতে বিশেষ ভালো লাগে। কিছু মনে…

স্বর্ণের কথা শেষ হওয়ার আগেই শান্তনু বলে বসে—তা হলে একটু চা খাওয়া যাক আপনার ঘরে বসে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ তো। স্বর্ণ ঘণ্টি বাজায় এই কথাটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে। নরসিং আসে। স্বর্ণ বলে দেয়—ছু'কাপ চা আনো তো।

—ঠিক হ্যায় বাবু।

শান্তনুবাবু বসে থাকেন স্বর্ণের টেবিলের সামনের চেয়ারে।

স্বর্ণের আর এখনই পূরবীর চিঠির তাড়া নিয়ে পড়তে বসা হয় না। সে বড়সাহেবের চিঠিপত্তর বাছাই করতে থাকে তখন।

—কি কাণ্ড দেখেছেন শান্তনুবাবু। স্বর্ণ চিঠিপত্তর দেখতে দেখতে এক সময় বলে ওঠে। ৫ নম্বর বাড়ির চিঠি দিব্যি ৭ নম্বরে দিয়ে গিয়েছে। ডাক বিভাগের যা হাল হয়েছে তাতে আর কিছু ভরসা করা যায় না।

—তাজ্জব ব্যাপার। শান্তনুবাবু কথার জবাবে কথা বলেন।

—আরে মশাই আপনি এইটুকুতেই তাজ্জব বলছেন। টেলিফোনের ব্যাপারে তা হলে যে কি বলবেন তাই ভাবি। আমি ধরুন ২২-৫২৫১ নম্বরে ডায়েল করছি যোগাযোগ হয়ে গেল ৩৩-২২৫২ তে। সে এক সেয়ার বাজারের লোক মনে হয়। ধরেই বলে ওঠেন—কিংনা ভাও। আমি বলি—মাথা খাও। যন্ত্রও যেখানে যন্ত্রণা দিচ্ছে মানুষ সেখানে কোন ছাড়।

—তা যা বলেছেন। শান্তনুবাবু এ কথায় সায় দেন।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠেছে। স্বর্ণ টেলিফোন ধরে বলে—হ্যাল্উ। হ্যাঁ, তিনি আজ আর আসছেন না, হ্যাঁ, সোমবার ফোনে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা নমস্কার।

—আপনি বসে বসে এই করুন। আমি চলি। শান্তনুবাবু উঠতে যাবেন, এমন সময় নরসিংও এসে যায়। তখনই স্বর্ণ রায় বলে ওঠে—বারে চা খাবো বলে চলি বলছেন চা না খেয়েই। খুব যা হোক।

—না না, এই যে নরসিং এসে গিয়েছে। বসি বসি।

শান্তনুবাবু বসলেন চেয়ারে শক্ত হয়ে।

পূরবীর চিঠিগুলো দেখার ইচ্ছায় মনপাখি খাঁচার মধ্যে ছটফট করছে।

তবুও স্বর্ণ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন শান্তনুবাবু, বসুন।

চা খেয়ে শান্তনুবাবু তখনই উঠতেন কি না বলা যায় না। তাঁর খোঁজে সীতানাথবাবু আসায় শান্তনুবাবুকে উঠে তাঁরই অনুসরণ করতে হয়।

নিরিবিলিতে বসে এবার পূরবীর পত্রাবলী খুলবে ভাবছে। বড়সাহেবের চিঠি নিয়ে নরসিং তার পর রওনা দেবে।

বলে রাখলো তাকে যখন সে চায়ের কাপ দুটো নিয়ে যেতে এলো।

—বাবু গাড়ি ভাড়াটা? নরসিং বলে বসে।

—ঠিক আছে নিয়ে নাও। চায়ের তিন কাপের দাম আর গাড়ি ভাড়া কত লাগবে নাও এই একটাকা থেকে। স্বর্ণ নরসিংকে পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে তা থেকে একটাকার নোট একটা এগিয়ে দেয়।

তাই নিয়ে সে চলে যায়।

পূরবীর চিঠি নিয়ে বসতে যাবে এমন সময় আবার নরসিং হাজির হয়। বলে—এতো ভাঙ্গানো পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে না।

—সোমবারেই নরসিং ভাঙ্গানি ফেরৎ দিয়ো। আমি ওঠবার সময় তোমায় ডাকলে এসো, বড়সাহেবের বাড়ির চিঠিগুলো তখন দিয়ে দেবো তোমার হাতে। এখন যাও, আমার কাজ আছে, করি।

দেরাজ থেকে একটা চিঠি বের করে পড়তে থাকে খুব আগ্রহ নিয়ে, যেন নতুন স্বাদ পাচ্ছে এতদিন পর আবার পড়তে গিয়ে। মাঝের একটা জায়গায় সে বারবার পড়ছে—"আমি তো আর কলেজে যাচ্ছি না। তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে? খুব লুকিয়ে এই চিঠিটা লিখছি আর কি করে যে ডাকে পাঠাবো তাই ভাবছি। তোমার নামটা ইংরাজিতে লিখবো এবং নামের আগে কোনো কিছু লিখবো না। তার কারণ স্বর্ণা রায়ও পড়া যেতে পারবে ইংরাজিতে লিখলে। প্রথমে নামের আগে কোনো কিছু লিখবো না ফলে স্ত্রীপুরুষের পৃথক চিহ্ন থাকবে না। কেমন? আশা করি কিছু মনে করবে না। বাংলায় ঠিকানা লেখাই আমার সবসময়ের ইচ্ছে কিন্তু এক্ষেত্রে তা আর রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে বড়ই অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। তবে কিছু না লিখে চুপ থাকাকে আরো বড় অপরাধী বলে ভেবেছি, তাই এই পন্থায় চিঠি লেখা হবে এবার থেকে। মা কিছুতেই আর কলেজে যেতে দিতে চান না। তিনি বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছেন। বাবাও বলেছেন তাতে আর কি হয়েছে পূরবী প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। কি যে মা আন্দাজ করলেন, কি জানি। মায়ের চোখ কি ভাবে যেন ধরে ফেলেছেন। কি হবে?'

আর একটা চিঠিতে পড়ছে স্বর্ণ। পূরবী লিখছে—'সমস্ত মন তোমার দিকে। সব সময় তোমার কথা মনে হয় অথচ দেখো কিছুতেই দেখা হচ্ছে

না। সত্যি তুমি ভুলে যাবে এমনি ভাবে দেখা না হতে, হতে। কি জানি কি হবে?'

শেষ চিঠিটায় লিখছে—'বাবা ঠিক করেছেন বিয়ের, আর কিছু বলতে পারছি না। শুধু কান্নায় ভেঙ্গে যায় বুক যখনই স্নানঘরে যাই। ভয় হয় ধরা পড়ি। কিন্তু কি করে যে এর হাত থেকে অন্য পথে যাওয়া যায়? উপায় নেই। বাবা-মা ঠিক করেই ফেলেছেন সব। সবটাই ভাগ্য বলে মেনে নিতে হবে। তোমার মন কি রকম হবে? আমি কি তার জন্যে দায়ী? আমি ঠিক করে আর কিছু ভেবে লিখতে পারছি না। আমায় তুমি ভুল বুঝবে জেনেও এই উপায় আমার স্বীকার করতে হচ্ছে, কারণ আমি বাবামায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে। আমি তাঁদের আঘাত দিতে পারছি না, কোনো ভাবেই না। আমি এ ক্ষেত্রে হেরে যাচ্ছি হয় তো তোমার চোখে। তবে তুমি সত্যিই বড় ভালো। আমার ভালো চাইবে নিশ্চয়। তোমারও ভালো হবে। বড়ও হবে জীবনে। যদিও তখন আর আমাদের হয়তো দেখা হবে না। জানাজানিও যে তুমি করবে না, এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস আছে। সে কথা তুমি অনেকবার বলেছ। তোমায় জীবনে দাঁড়িয়ে উঠতে হবে তার পর সংসার পাতা। আমার ঠিক উল্টো। সংসার পাততে হবে জীবনে দাঁড়িয়ে ওঠবার জন্যে। তাই বিপরীতের দ্বন্দ্বে আমি যেতে পারি নি তুমি বুঝে ছিলে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে এমন হবে তুমিও না, আমিও না—কেউ ভাবি নি। আমাদের এই দুপথের যাত্রা শুরু হল। আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার।'

সুবর্ণ এই চিঠির এই অংশটুকু আর একবার পাঠ করেই সব চিঠিগুলো গুছিয়ে ফেলে। বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে পাটা বেশ টান করে তুলে রেখে প্যান্টের বাঁ পকেটে তা ঢুকিয়ে রাখে যত্ন করে। তার পর নরসিংহকে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকে। নরসিং এই ডাকের যেন শুধু অপেক্ষাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়। তার হাতে একবাণ্ডিল চিঠিপত্তর দিয়ে দেয়।

তার পর সুবর্ণ অফিস থেকে পথের দিকে দ্রুত পা বাড়ায়।

এক ঝলক মুক্ত হাওয়া নিতে চাইছে তার মন।

চঞ্চল গোস্বামী পরদিন মেসের ঘরে বসে প্রথম ভাবলে মা-বাবাকে আজ একটা কুশল সংবাদ জেনে নেবার আগ্রহ দেখিয়ে চিঠি লিখবে। নিজের

কাছে পোষ্টকার্ড বা ইনল্যাণ্ড কিছুই নেই। বৃথাই খুঁজছিল তবে এইভাবে খোঁজাখুঁজি করছে দেখে তারই ঘরের সহবাসিন্দা শ্রীনিবাস বাবু বললেন—কি খুঁজছেন সকালে উঠেই।

—আজ শনিবার, অনেকেই দেশে যায় তাই দেশে মা-বাবার সংবাদ জানার জন্যে একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু—

—এতে আর কিন্তু কিসের মশায়। হঠাৎ যখন এবার মা-বাবাকে চিঠি দেওয়ার মন হয়েছে দিয়ে দিবেন। তবে বড় আশ্চর্য লাগছে। এতদিন রয়েছি আমি আপনার সঙ্গে কিন্তু—ঐ দেখুন একটা 'কিন্তু' আমারও মনে জাগছে, চিঠি লেখার আগ্রহ তো আগে দেখি নি।

—না, ঠিক তা নয়। আগেও তো লিখেছি, দেখুন বিজয়ার পর বা যখনই ওঁরা চিঠি দিয়েছেন আমিও উত্তর দিয়েছি।

—হ্যাঁ, তা হয় তো দিয়েছেন ঠিকই...

শ্রীনিবাস বাবুর কথা শেষ হবার আগেই চঞ্চল বলে ওঠে—না। তবে কি জানেন তখন ঝট করে লিখে ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আজ পোষ্টকার্ড বা ইন্‌ল্যাণ্ড কিছুই কাছে নেই দেখছি, এদিক ওদিক করে খুঁজছি তাই দেখে ফেললেন তো, সেই জন্যে আপনার জানা হল যে আমি একটা দেশে চিঠি লিখতে চাইছি। না হলে কি করে আর জানতেন বলুন ?

—তা ঠিক, তা ঠিক। তবে যখন পোষ্টকার্ড বা ইন্‌ল্যাণ্ড আপনার কাছে এখন নেই আমিই, ভয় নেই, আপনাকে দান করছি ভাববেন না। আপনি এনে দেবেন পরে তা হলেই হবে। কি চাই বলুন—পোষ্টকার্ড, না ইন্‌ল্যাণ্ড ?

—পোষ্টকার্ডই দিন।

একটু পরে শ্রীনিবাস বাবু তাঁর হাত বাক্স থেকে একটা পোষ্টকার্ড বের করে চঞ্চলকে দিলেন।

—সত্যি, খুব উপকার হল, শ্রীনিবাসবাবু। কি বলে যে ধন্যবাদ জানাই।

—থাক, থাক অত আর কাজ নেই।

চঞ্চল আর কথায় কথা না বাড়িয়ে চিঠি লিখতে বসে। কি আর লিখবে ? মা-বাবা কেমন আছেন আর তাঁদের অনেক দিন চিঠি পাই নি এবং সে ভালো আছে। এইতো কটা কথা। এক নিমেষে লিখে ফেললে।

সেদিন শনিবার। চঞ্চল অফিস থেকে যথারীতি দেড়টার পর বেরিয়েছে। শনিবার আর ছাত্রীকে পড়াতে যায় না। মেসে যাবার পথে এই দিনটিতে

তার চায়ের পাতা কিনে নিয়ে যেতে হয়। এ কাজটা সে বরাবর করে আসছে। জোড়াসাঁকোর 'এন চন্দ্র এণ্ড সন্স'এর দোকান থেকেই চায়ের পাতা কেনে। আজ ভাবলে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের মধ্যে 'সুবোধ ব্রাদার্স'এর দোকানের আসল দার্জিলিঙ চায়ের পাতাই কিনে নিয়ে যাবে। শ্রীনিবাস বাবুর ইচ্ছে 'সুবোধ ব্রাদার্স'এর চায়ের পাতায় চা খান। 'এন চন্দ্র এণ্ড সন্স' তো তাদের ঘরের কাছে আছেই।

যে শ্রীনিবাস বাবু সকল সময় চঞ্চলের সহায়ক তাঁর কথা রাখতেই হয়। চায়ের পাতা কিনে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট থেকে বের হয়েছে। দেখে একটা সাদা ফিয়াট গাড়ির দরজা খুলতে যাচ্ছে তারই বন্ধু দীপককুমার মুখোপাধ্যায়। ভুল হয় নি তার কারণ গাড়ির মধ্যে উঠে বসতেই সেও তাকিয়ে থাকলো চঞ্চলের দিকে। যে চঞ্চল কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ভেতর থেকে সবে বেরিয়ে এসেছে। হাতে তার বালির কাগজের ঠোঙায় মোড়া চায়ের পাতার প্যাকেট। যাই হোক দীপক পুরোনো বন্ধুকে চিনতে পেরেই গাড়ি থেকে নেমে এলো।

—কিরে চঞ্চল! কেমন আছিস? কতদিন পর দেখা...

চঞ্চল এগিয়ে গিয়ে বলে—হ্যাঁ ভাই, তোর সঙ্গে তো আর দেখাই হয় না। সব খবর কি?

—মোটামুটি ভালোই। তা তুই এখানে?

—এই একটু চায়ের ...তা কিনতে এসেছিলুম।

—তা বেশ। ছোট্ট উত্তর দেয় দীপককুমার।

—তুই এখন কি করছিস?

—আর বলিস কেন, যত সব আধাবিকৃত-মস্তিষ্কের মেয়েপুরুষ নিয়ে আমার কাজ।

—সেটা কি রকম?

—চল তা হলে, আমার বাড়িতে, আজ দেখলেই বুঝতে ঠিক পারবি। ভারী করুণ লাগে এক-একটা ঘটনায়। চল গাড়িতে ওঠ।

চঞ্চল একটু কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়ে বলে—না না, আমি আবার কেন? পরে একদিন যাব ভাই।

দীপককুমার বুঝতে পারে চঞ্চল সংকোচ বোধ করছে। সে চঞ্চলের হাত ধরে টান দেয়। বেশ দৃঢ় আকর্ষণ বোধ করে চঞ্চল। আন্তরিকও মনে হয়। আর কোনো কথা বলা হয় না চঞ্চলের এর পর। ভালো মানুষের মতো

গাড়িতে উঠে বসে দীপককুমারের সঙ্গে। গাড়ি ছাড়লো। নরম গদিতে বসে চঞ্চলের বেশ ভালোই লাগছিল।

—হ্যাঁরে তোর খবর তো কিছু জানা হলো না। কি করছিস এখন? কোথায় আছিস?

চঞ্চল তার কর্মজীবন আর বাসস্থলের কথা বন্ধুকে বললে।

—গৃহিণী কোথায়?

—আবার গৃহিণী। গৃহই নেই তা গৃহিণী।

চঞ্চল বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই কথাগুলো বললে।

দীপককুমারের বন্ধুর কথায় হাসতে গিয়েও যেন হাসি থেমে গেল।

গাড়ি এসে থামলো একটা গাড়ি বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে। দীপককুমার গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—আয় চঞ্চল। এসেগেছি বাড়িতে। তুই তো আগে আসিস নি কখনো, যাই হোক তোকে পেয়ে আজ বেশ হ'ল। আয়, চল।

—হ্যাঁ, এই যে, চল। ছোট্ট উত্তর উচ্চারিত হয় চঞ্চলের ঠোঁটে।

গাড়ি থেকে নেমে সে দীপককুমারকে অনুসরণ ক'রে বাড়ির সদর দরজায় প্রবেশ করলে। প্রথমেই একটা বসার বেশ সোফা সেট দিয়ে সাজানো ঘর। তার পর স্প্রিং দরজা ঠেলে দীপক চঞ্চলকে নিয়ে তার বসার ঘরে ঢুকলো।

—বস চঞ্চল। আমি এইখানেই বসি। বাইরে সব রুগী রুগিণীরা এলে অপেক্ষা করেন।

—ও, তাই বুঝি, তা বেশ। কি রকম রুগী।

—ঐ যে বললুম না, আধাবিকৃত-মস্তিষ্কের মেয়েপুরুষ।

—সেটা কি রকম?

—সব বলবো, বস না। একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি আগে।

দীপক একটা কলিং বেলের বোতাম টিপতেই একজন লোক এসে দাঁড়াল।

—আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করো। এতক্ষণ ছিলে কোথায় আমি নেই বাড়ি আর কারো হুঁশ নেই।

—না বাবু, এইমাত্র ওদিকে গিয়েছি।

—যাও আর সাফাই গাইতে হবে না। চায়ের যোগাড় ঠিক করে আনো।

—হ্যাঁ, বাবু যাই।

চঞ্চল বললে—বাড়িতে আর কেউ নেই?

—কে আর থাকবে বল ? যার জন্যে সবকিছু থাকবার ব্যবস্থা সেই গৃহিণী আর বাড়িতে থাকার মতো নয়, মানসিক হাসপাতালে। আমি আধাবিকৃত মস্তিষ্কের মেয়েপুরুষের সঙ্গে কথা বলি যদি তবে তাঁরা সুস্থ হন।

—সে কি ! কতদিন বিয়ে হয়েছে ?

—তা বছর তেরো হবে।

—মাথা খারাপ কতদিন ?

—আরম্ভ অনেকদিন থেকে, আমার মনোবিশ্লেষণে কিছু হল না। শেষে একেবারে উন্মাদ হয়ে গেল। গত বছর তাই উপায় না দেখে, উন্মাদদের হাসপাতালেই পাঠাতে হয়েছে।

চঞ্চল এ সংবাদ শুনে বেশ বিচলিত বোধ করতে থাকে। ভাবে কি এমন হল যে মাথাটা স্ত্রীর পরিপূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে ? আশ্চর্য লাগে। চঞ্চল জীবনে ভাবতে পারে না—যে সংসারে প্রাচুর্য রয়েছে, যে সংসারে সাজানো পারিবারিক বন্ধন রয়েছে সেখানে মস্তিষ্কের বিকৃতি কিভাবে সম্ভব ?

চঞ্চল মনের সাহস নিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসে—আচ্ছা দীপক, ভাই বিয়ে কি ভাবে তোদের হয় ?

—যেমন বাবা-মা দেখে দেন, সেই ভাবেই হয়।

দীপক সোজাভাবে উত্তর দেয়।

—এখন বাবা-মা আছেন ?

—বাবা মারা গিয়েছেন, প্রায় এক বছর হল। মা আছেন। আমি তো একলা, ভাইবোন কেউ নেই। ভেবেছিলুম একটা ছেলে বা মেয়ে যা হয় পূরবীর হবে।

—স্ত্রীর নাম কি পূরবী ?

—হ্যাঁ ভাই। পূরবীকে দেখতে বেশ ভালো। সে লেখা পড়াও করেছে। কলেজে ভর্তি হয়েছিল বিয়ের আগে এক বছর কলেজ করে তার পর আর কলেজে পড়ে নি। বিয়ের পর বাবা-মাও আমার বৌকে কলেজে পড়াতে চাইলেন না। পূরবীর দারুণ পড়ার ঝোঁক ছিল কলেজে। আমি বলি যে ঠিক আছে বাবা-মা যখন কলেজে গিয়ে পড়াতে রাজি নয় তখন তুমি বাড়িতে পড়ার চর্চা কর প্রাইভেটে ডিগ্রি কোর্সের পরীক্ষা দিয়ে দেবে।

—হ্যাঁ, তা তো বেশ হতো।

—কিন্তু পূরবীর তাতে মন বসলো না। একজন অধ্যাপিকা রাখবারও

প্রস্তাব দিয়েছিলুম। বাবা-মাও তাতে সম্মতি দিলেন। পূরবীর মন উঠলো না এ ব্যবস্থায়। সে যেন বলতে চাইল যে আমরা ভাবছি মেয়েছেলে লেখা পড়া শিখলে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারে এই মানসিকতাই নাকি পূরবীর কলেজে যেতে না দেওয়ার পেছনে কাজ করছে। তার মনে বদ্ধ মূল ধারণা হয়ে যেতে থাকল যে বাবা, মা, আমি এবং আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়িও অর্থাৎ পূরবীর বাবা-মাও সেই দলের। সত্যি কথা বলতে কি চঞ্চল, এমন অবস্থায় পূরবী এসে গেল যখন সে আমার বাবা-মাকে তো বটেই তার বাবা মাকেও সে সহ্য করতে পারতো না।

দীপককুমারের কথা চঞ্চল সাগ্রহে শুনতে শুনতে বললে—এতো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার যে মেয়ে নিজের বাবা-মার প্রতিও বিতরাগ হয়ে যায়। রক্তের সম্পর্কেও বিপরীত ভাব জাগে যে তাতো আমরা ভাবতে পারি না। তোদের মনোবিজ্ঞানে হয়তো এর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

—হ্যাঁ, মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে যখন কোনো একাগ্র মনের আন্তরিক ইচ্ছা অপূর্ণ রাখার সহায়তায় আত্মজন অগ্রণী হয়েছে বোঝে তখন সেই মন আত্মজনের প্রতিও ভীষণ বিরূপতায় অস্থির হয়ে ওঠে। সেই মনটা তখন তাদের কোনো ভালো কথাকে গ্রহণ করতে পারে না। ভালোকে মন্দ ভাবতে থাকে। তাঁদের বিরুদ্ধ আচরণ করার প্রবল প্রবণতা জেগে ওঠে সেই মনে। পূরবীর ক্ষেত্রেও সেই রকম একটা কিছু হয়ে থাকবে—যা কোনো ভাবেই প্রকাশ করে নি পূরবী। সে যদি মুখে সরল মস্তিষ্কে প্রকাশ করে ফেলতো তা হলে আর আজকের একেবারে বিকৃত-মস্তিষ্ক নিয়ে বাঁচার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতো। তার নিজের হাতেই ছিল নিজের রোগমুক্তির ওষুধ। কিন্তু সে তা প্রয়োগ করে নি অজানতেও।

—ভাই দীপক, তোর মনোসমীক্ষণ আমি ঠিক বুঝি না। তবে তাঁর বাবা মায়ের কাছ থেকে কি কিছু জানা যায় না?

—সে চেষ্টা আমার বাবা মা তা বটেই আমিও চেষ্টা করেছি জানতে। কিন্তু তাঁরা তেমন কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু দেখালেন একটি খাতা যাতে পূরবীর লেখা কিছু গান ছিল। সবই বিয়ের আগে লেখা। বিয়ের পর লেখার কথা কিছুই জানা যায় নি। এই গত বছর যখন একেবারে পূরবী উন্মত্ত হয়েছে, তখনই আগের মতো আবার নানা প্রশ্ন আমি করি। তখন পূরবীর মা বলেন—এই খাতায় ওর কি সব গান লিখেছিল সেগুলো দেখলে যদি কিছু

জানতে পারা যায়। এই বলে তা তিনি আমায় দিলেন। আমি দেখাচ্ছি সে খাতা, আমার কাছেই রয়েছে।

—থাক থাক, তার দরকার কি? চঞ্চল বলে ওঠে।

—সে কি চঞ্চল তুই তো গান গাইতিস কলেজ উৎসবে, বেশ মনে আছে।

—আরে ভাই সে সব ডকে উঠেছে কর্মজীবনে এসে।

—কিছুই ডকে ওঠে না। সবই ডাঙ্গায় থাকে। শুধু সময় এলে তবেই সরব হয়। দীপককুমার বেশ দীপ্ত গলায় কথাটা বললে। দেরাজের হাতল ধরে টান মেরে অনেকখানি বাইরে নিয়ে এলো। একটা সবুজ বাঁধানো এক্সাসাইজ খাতা বের করল দেরাজ থেকে।

সেই সময় চা আর কিছু বিস্কুট, মিষ্টি, নিমকি নিয়ে লোকটি ঘরে ঢুকলো। এতক্ষণে যেন চঞ্চল বেশ আশ্বস্ত হল। কারণ অফিস থেকে বেরিয়ে একটু কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছিল চঞ্চলের।

দীপককুমার তা বুঝেই ব্যবস্থাটা এসেই করেছে।

—আয় চা পর্বটা শেষ করা যাক। মায়ের মনতো বেজায় খারাপ। যা যেটুকু পারেন মনের টানে ছেলের জন্যে বুক বেঁধে করে চলেছেন। আর পুরবীর বাবা-মা তো যেন সদা অপরাধীর মতো আসেন। মুখে কোনো কথা বলতে পারেন না। আমার বড় মায়া হয় চঞ্চল ওদের জন্যে।

—তাই নাকি, এতো আরেক আশ্চর্য। যে মেয়ের মনের কোনো অপূর্ণ ইচ্ছেটা দাবিয়ে তোর গলায় মেয়েকে চাপিয়ে দিয়েছেন—সেই তাঁদের ওপরই তোর মায়া। জানি না ভাই এও তোর মনোসমীক্ষণের একটা বিষয় হতে পারে হয় তো।

—না চঞ্চল, তা নয়। আমার কি মনে হয় ভাই এই গানগুলো দেখে জানিস্। আমার মনে হয় সে কোনো এক আধ্যাত্মিক স্তরে উঠতে চাইছিল। সেখানের কোনো ধাক্কায় তার এই বিকৃতি।

—এমন হয়! বিস্ময় ভরে প্রশ্ন করে চঞ্চল।

—তা তো হয় বলেই শুনছি আমার এক রুগিণীর স্বামীর মুখে। বেশ বয়স্থা রুগিণী। আমার কাছে তাঁর স্বামী অনেকবার বিশ্লেষনের জন্যে সময় নিয়েছিলেন। আমি একটা পারিবারিক হতাশার ছবি তার মুখ থেকে সংগ্রহ করি এবং তাঁর অপুত্রকজনিত বেদনার দারুণ মনোকষ্টও কার্যকরী দেখি। তবে শেষ ধাপে একটা আধ্যাত্মিক যেন কি রকম অস্থিরতায় অশালীন আচরণ

করে ফেলতেন যা স্বাভাবিক নয়। তাঁরা স্বীকার করেছেন মত্ত হয়ে মারমুখী হয়ে যেতেন। ফল তেমন না পেয়েই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক কিছুদিন তাঁরা আর আসেন নি। হঠাৎ গত সপ্তাহে পথে দেখা। বললেন ডাক্তার মুখার্জি—এখন আমি গুরুদেব বরণ করেছি। তাঁরই স্মরণ নিয়ে দেখছি স্ত্রী ভালো হয়ে উঠছেন। আমার আগ্রহ ভাই বেড়ে গেল। চঞ্চল কারণ নিশ্চয় বুঝতে পারছিস। আমার ঘরের কি অবস্থা? আমি তাঁকে প্রশ্ন করে জেনেছি সব। ভাবছি একবার শেষ চেষ্টা গুরুদেব বরণ করে তাঁরই স্মরণ নেবো কি না?

চঞ্চল বলে ওঠে—কি নাম বলতো! মাদ্রাজের সাঁই বাবার কথা বলেন নি তো? বা দাদাজী?

দীপককুমার মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে উঠলো—কোনোটিই নন। তাঁর নাম সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর মতোই। তিনি গৃহীযোগী।

—তা বেশ কিন্তু কি নাম?

—এখন চঞ্চল সে নাম তোর জেনে কি লাভ বল। তুই পুরবীর গানের খাতাটা দেখ আগে, সুর দিয়ে গেয়ে শোনা। দরকার যদি হয় পুরবীকেও একবার শোনাবার ব্যবস্থা করবো কিনা ভাবছি।

—কেন, গুরুদেব বুঝি সেই নির্দেশ দিয়েছেন।

কথাটা একটু হাল্‌কা ভাবেই চঞ্চল বলে বসলো তবে তাতে দীপককুমার কিছু মনে নিলে না। শুধু বললে—মিত্র মশাই দেখা কবে করবেন এখনো জানি না ভাই। তাঁর নামের উপাধি মিত্র।

—তা দেখি গানের খাতাটা। যদি আমার দ্বারা কোনো সামান্য কাজ হয় আমি অবশ্যই করবো।

দীপক তখনই চঞ্চলের দিকে গানের খাতাটা এগিয়ে দেয়। চঞ্চল প্রথম পিছনের মলাট উল্টেই দেখলে, একটি গান। চঞ্চল আস্তে আস্তে পড়তে থাকলো

ক্ষণ যামিনীর বুকে গভীর আঁধার যদি
মেঘলা আকাশে যেন বিদ্যুৎ রেখা ভাসে
সোনালি আলোক নিয়ে নিত্য চেতনা বাসিনী।
ক্ষণ যামিনীর তারা হাজার আশায় সারা
একটি পাখির ডাকে ভোরের সূর্য জাগে
একটি সুরেলা তারে হাজার প্রাণের রাগিণী।

নীল সবুজের রঙে অতল সাগর ঢঙে
ঢেউ ফিরে ফিরে এসে তীরে তীরে যত মেশে
দূর থেকে দেখা ঢেউ এক সাগরের রূপিণী।
আদি জননীর মনে লীলায়িত প্রতিজনে
দৃষ্টিতে যাঁর প্রাপ্তি সৃষ্টি আলোক তৃপ্তি
বৃষ্টি মুখর দিনেই অদ্ভুত শান্তি যাপিনী।

চঞ্চল পড়া শেষ করে বললে—এযে শক্ত গান হবে। তা চেষ্টা করে দেখবো। তবে এটা বিয়ের আগে লেখা কি? এটা খাতার শেষের দিকের লেখা।

দীপক বললে—পূরবী বাবা-মার সঙ্গে একবার পণ্ডিচেরীতে যায়। মনে হচ্ছে সেখানেই লেখা। এই পাতার মাথায় পণ্ডিচেরী শব্দটি লেখা আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো। চঞ্চল উত্তর দিয়েই আবার তার পরের পাতায় দেখলে লেখা পণ্ডিচেরী। সে গানটিও পড়তে থাকলো চঞ্চল—

শ্বেত পদ্মের কুঁড়ি স্থির দৃষ্টির পুরী
লাল পদ্মের ফুল— প্রণাম, জানায় প্রণাম।
নীল আকাশের বুক সাদা মেঘলার মুখ
সোনা হলুদের ধ্যানে আরতি প্রদীপে প্রণাম।
নীল পদ্মের চোখ অতিমানসের লোক
দিব্য জ্যোতির বাণী আপনি শুনছে স্বনাম।
নানান ফুলের সাজি নানান রঙের মাঝি
ঘুরে ফিরে সব সাদা জানছে শরীরী স্বনাম।

চঞ্চল বলে ওঠে—ওরে ভাই, এযে গভীর ভক্তির ব্যাপার।

দীপককুমার চোখ বুজে শুনছিল। সে চোখ খুলে বললে—দেখ চঞ্চল, তুই সুর দিয়ে দেখ।

—আরে ভাই সে কাজ কি আমার। তবে চেষ্টা করবো বলেছি যখন যা হয় করে হবে। তার আগে মিত্র মশাই কি বলেন জানা প্রয়োজন।

—সেটা ঠিক চঞ্চল। দীপক এ কথায় বেশ আশ্বস্ত হয়। খাতাটা চঞ্চলের কাছ থেকে নিয়ে বললে—দেখ তেরোটা বছরের মধ্যে বারোটা বছর তো শেষ না হলেও মোটামুটি স্বাভাবিকতার সীমান্তেই ছিল। তখন তো সে একবারও বলে নি যে তার মধ্যে একটি ভক্তিমার্গের ভাব আসছে বা

সে পথেই সে যাবে। শুধুই উত্তেজিত ভাব ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহারে মনে হত এই বুঝি সে একটা রণস্থল বাধিয়ে তুলবে।

চঞ্চল বললে—সেটা কি রকম?

—এই ধর, এখনই সে এসে হাজির হয়ে রুক্ষস্বরে বলতো 'ঘরে বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করলেই চলবে? নাও নাও ওঠো বাইরে চলো গঙ্গার হাওয়া লাগলে যদি মনটা তোমার পরিষ্কার হয়।' আমি তো এমন ভাবে আমার মাকে কখনো বলতে শুনি নি বাইরের ঘরে এসে। বাবা উকিল ছিলেন। মা কত শান্ত প্রকৃতির। আমি আর বাবা ছাড়া তাঁর গলাই কেউ শুনি নি। পূরবী একেবারে এসে দেখতিস এখানে ঝাপিয়ে পড়ে কাগজপত্তর বই খাতা যা পেতো সব হয় নিয়ে চলে যেতো আর না হলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে থাকতো। লোকলজ্জা বলে তার একদম ছিল না।

—তা হলে তোর এই মনোসমীক্ষণের চর্চা কি করে চলতো?

—আর সে কথা ভাই, না বলাই ভালো। শেষদিকে তার তো ধারণাই হয়ে গেল যে আমি সব রুগীদের নাম করে মেয়েদের নিয়ে সময় কাটাই। আমার সমীক্ষণের আলাপ চলছে রুগিণীর সঙ্গে, অনেক সময় তখনই পূরবী এসে হাজির হতে লাগলো রণমূর্তি নিয়ে। রুগিণী আরো রুগ্ন হয় দেখে অনেকেই চলে গেল। শেষে আমি বুঝিয়েও বলতে গেলে দেখি অন্য মূর্তি। আমার ওপর ঝাপিয়ে একেবারে কামড়ে খিমচে কিল চড় ঘুসি চালাতে থাকলো। কত জামা প্যাণ্ট ছিঁড়ে দিয়েছে তা আর হিসেব করে রাখি নি।

—তাই না কি? ইস্…

—আর বলিস কেন চঞ্চল, জীবনটা একেবারে বিষ তিক্ত হয়ে গেল। মনে হল একি মেয়ে জুটলো আমার ঘাড়ে, আমি কি শুধু দিন কাটাবো ঘরে বাইরে বিকৃত মস্তিষ্কা নিয়ে। নিজের এই মনোবিদ্যার চর্চাও ভালো লাগলো না। শেষে একদিন তো প্রাণেই মারা যাচ্ছিলাম ভাই। রাত্রিতে ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ টুলটা পড়ে যাওয়ার শব্দে। 'কে' বলে উঠি। দেখি একটা আলমারীর পাশে রাখা বাঁশের লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছে পূরবী। নীল আলোটা জ্বলছিল, ঘুমের চোখ খুলে এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে বড় আলো একটা জ্বলিয়ে বলে উঠি 'পূরবী'। তখন কে শোনে কার কথা। মাথাটা বাঁচলো, চোট লাগলো বাঁ পায়ের গোড়ালিতে। এক মাস যন্ত্রণা নিয়ে কাটাই। পাশের ঘরেই মা বাবার ঘর তাঁরা এলেন ছুটে। রাত্রিতে এমন কাণ্ডটা কেউ ভাবেন নি। তবে

তার মাথাটা যে রকম অবস্থায় এসে গিয়েছিল তাতে কি হয় না হয় ভেবে ঘরের দরজা শুধু বন্ধ থাকতো রাত্রিতে কিন্তু খিল বা ছিটকিনি দেওয়া হত না। মা-বাবা ভোর হতেই পূরবীকে বেড়াতে যাচ্ছি বলে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে দিয়ে এলেন। তার আগেই ডাক্তারের সঙ্গে আমার কথা বলা ছিল যদি তেমন হয় তাই করতে হতে পারে।

—কেন আগেও কিছু···চঞ্চল কথা শেষ করতে সংকোচ বোধ করছে।

দীপক বলে ওঠে—তা আর কত বলি ভাই, ভীষণ পর্যায়ে এসে যাচ্ছিল। আগের দিন তো আমায় ঘুমন্ত অবস্থায় খাট থেকে তুলে ফেলে দিতেই উদ্যত হয়। কোমড়ে চোটটা লাগে।

—বাবা, এ তো ভয়ঙ্কর!

—আর বলিস কেন।

—এখন কেমন আছেন?

—খবর পাই ভালোই আছে। বেশ সাধারণ কাজ করে, খেলার ব্যবস্থা আছে তাও না কি বেশ করে। পাছে আমায় দেখলে আবার কিছু বিকৃতি দেখা দেয় বলে এখনও দেখা করা হয় নি।

—সে কি দীপক, তোর সঙ্গে তার পর আর দেখা হয় নি, সেটা কি রকম হল?

—না ভাই চঞ্চল, ওরা বলছেন তাতে রুগীর দিকে কিছু খারাপ হতে পারে।

—আমার এটা ঠিক মনে হচ্ছে না।

—তার মানে?

—সে যাই হোক আমি বলি কি এই গান শোনাবার নাম করে বা মিত্র মশাইয়ের কাছে নিয়ে যাবার নাম করে পূরবী বৌদিকে ফিরিয়ে আনা হোক।

—তাল সামলাবে কে?

—সে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে তখন।

—আমি কিছু ভাবতে পারছি না আর।

—তোকে কিছু ভাবতে হবে না আমাদের বন্ধু অনিলকে মনে আছে তো, তার ওখানেই এখন যাচ্ছি। চামেলী বৌদিও আছেন খুব দরদী ওরা দুজনে। হ্যাঁ, অনিল ওকালতী করছে; বেশ আছে দুজনে। ওরা আর আমি দেখি একটা কিছু করতে পারি কিনা।

—তা হলে চল না চঞ্চল আমিও যাই তোর সঙ্গে অনিলের বাসায়।

—তার আগে যে ভাই আমায় একবার মেসে যেতে হবে। চায়ের পাতার প্যাকেটটা গচ্ছিত করা দরকার।

—তা করবি। তাতে কি হয়েছে।

—সেখানে তোকে নিয়ে...

চঞ্চল বেশ লজ্জিত ভাব দেখিয়ে কথা কটা বললে।

দীপক প্রায় ধমকে উঠলো—থাম চঞ্চল, আমার বন্ধুর সঙ্গে খারাপ যায়গায় তো যাচ্ছি না যে লজ্জা হবে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর মেসের ঘরে যাস তাতে সংকোচ হবে কেন। আমি এখন একবার শুধু মায়ের সঙ্গে কথা বলেই আসছি, বাবা গত হবার পর থেকে মা যে বড়ই একা একা থাকেন; এই যাব আর ফিরে আসবো। তুই বোস।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়ার কিছু নেই।

চঞ্চল বসে বসে পূরবীর গান লেখার খাতাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে নিজের মনেই। একটা পাতায় লেখা রয়েছে, পড়তে লাগলো—

ঝাড়ের আলোর ঝলমলানির রঙের রূপের অমর বাণীর
নতুন ভাষায় মুখরতা
প্রাণের আলোক জ্বলছে যখন দিবস রাতের চন্দ্র তপন—
অসীম কালের সে বারতা।
আঁধার ঘরের মনের কোণের সবখানে পায় নব চেতনের,
সে সব কিছুতে হৃদয়খানির গভীর খনির অতলতা।
মান নিয়ে মন মানিয়ে চলার হাল্‌কা কথার পল্‌কা পশার
একটুকু যার থাক্‌লো-না,
সুযোগ বুঝলে পাল্লা ভারীর ঠিক বেছে নিয়ে সেদিকে হাজির—
মান নিয়ে মনে জান্‌লো না।
হাততালি তার স্বাধীন কথায় ছাড়িয়ে যাবে না হাজার সভায়—
তবু জেগে থাকে নীতির মালায় সীমানা ছাড়িয়ে সরবতা।

—বারে, এ গান পূরবীর রচনা। ভাবছে চঞ্চল। আজকের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্রকথা যেন বলা হয়েছে, যেন তারা সুযোগ বুঝে পাল্লা ভারীর দিকেই মত দিতে থাকে। অথবা সে কি জীবনসংসারের অধিকাংশ মানুষের

কথা বলতে চেয়েছে, তাও হতে পারে। বেশ বিষয়টা নিয়ে লেখা। সত্যি কথা যে বলে সেটা অপ্রিয় হয়ে গেলে হাজার সভায় হাততালি পাবে না ঠিকই বলেছে পূরবী। দেখি দেখি · বলে চঞ্চল পূরবীর খাতার পাতা ওল্টাতে থাকে। আর একটা পাতায় দেখছে লিখেছেন—

হায় রে আশার বুলবুল
কিসের এ তোর ঢুলঢুল।
মনটি আমার ভরা ঘট
প্রেমের পরাগে উদ্ভট,
চকিত চাউনি নিয়ে ছুট—
বাগানে ভরানো শুধু ফুল।
ছকুল ছাপিয়ে সে আকুল।
রূপ নিয়ে ঢঙে মন চায়
নাচে নাচে দিন যে ভরায়।
আশার ভুবনে এত সুখ
শুধু তো মধুর রসে মুখ—
কাঁটার ক্ষততে তবু দুঃখ,
দেখছি মাতায় এ বকুল।
নাচায় মায়ার কি মুকুল।

—বিয়ের আগের যা হোক কিছু একটা মনের মধ্যে ভাব পূরবীর ছিল। চঞ্চল ভাবছে সে কথাই। এমন সময় ঘরে এসেই দীপককুমার ঢুকল এবং বললে—চল চঞ্চল, যাই তা হলে অনিলের বাসায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চল এবার। পূরবীবৌদির গান লেখার খাতাটা তুলে রাখ এখন। পরে দেখবো।

—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

দীপককুমার দেরাজের মধ্যে খাতাটা তুলে রাখলে।

চঞ্চল তখন দীপককে অনুসরণ করে ঘর থেকে বাইরে এলো। রাস্তায় তার গাড়িটা দুপুর থেকে এই বিকেল পর্যন্ত রাখাই ছিল। দীপক নিজেই গাড়িটা চালাবে বলে গাড়ির চালককে বললে—আপনি একটু থাকুন বাড়িতে যদি কোনো রুগী বা কেউ আসেন তো, বলবেন—ইচ্ছে করলে বসতে বা ঘুরে আসতে পারেন, ফিরতে একটু দেরি হবে।

অনিলের বাড়ি চঞ্চল নিয়ে এসেছে দীপককে। চামেলী বলে ওঠে—কি ভাগ্যি যে পুরোনো বন্ধুকে দেখতে এসেছেন। এতদিন তো বিয়ে হয়েছে শুধু চঞ্চল বাবুকেই যা বন্ধু হিসেবে আসতে দেখেছি।

—কি আর করি বলুন যোগাযোগ কেউ রাখতো না।

অনিল ফস্ করে বলে বসে—দীপক তুই-ই বা তেমন কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতিস বল।

—তা ঠিক তা ঠিক বলছিস। দীপক কথায় সায় দেয়।

চঞ্চল বললে—তবে আমাদের তিনজনের আজকের দেখার একটা সার্থকতা আছে নিশ্চয়। সেটা এখন হয়তো বোঝা যাবে না পরে দেখা যাক কি হয়।

—দীপক যে এ ভাবে আসবে, ভাবি নি। খুবই খুশি করলি ভাই চঞ্চল এই যোগাযোগ করে। অনিল যেন সকৃতজ্ঞভাবে কথা কয়টি বললে।

দীপক বলে উঠলো—সে কি অনিল, আমাদের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসার মধ্যে আর কিন্তুর ভাব থাকবে কেন ?

চামেলী বলে ফেলে—দীপকবাবু খুব সুন্দর কথাটা বলেছেন। এর জন্যে চায়ের ভালো আয়োজন করি এবার, একটু বসুন।

—তা করবেন অবশ্যই আমি আর না বলবো না। তবে বেশি কিছু তার সঙ্গে দেবেন না। দীপকের বাড়ি একচোট জলযোগ হয়েছে চায়ের সঙ্গে। চঞ্চল কথাগুলো বললে বেশ সরস ভঙ্গিটিতে।

দীপক চুপ করে থাকে। অনিল খুশি মনে বসে থাকে।

—আচ্ছা, আসছে কাল আমার বাড়ি কি সস্ত্রীক আসা যায় না? দীপক বললে অনিলকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হয় তবে কাল রবিবারে গৃহিণীর একটু বাপের বাড়ি যাওয়ার আছে আমাকেও সন্ধ্যের সময় যেতে বলে দিয়েছে। আর চঞ্চলের তো একটা বিয়ের...

—কি যা তা বলছিস। থাম...চঞ্চল বাধা দেয় তখন অনিলের কথায়।

অনিল হাসে।

দীপক বলে—নিশ্চয় নিশ্চয়।

অনিল বললে—সকালে আমি সেই বিষয়ে চঞ্চলকে নিয়ে যাব, তুইও চল।

—কি বাজে কথা বলছিস অনিল।

চঞ্চল চমকে উঠে কথা কটা বলে বসে।

দীপক বললে—ঠিক আছে আমি দুজনকেই নিয়ে যাব। চঞ্চলের মেস তো আজ দেখেই এসেছি আসবার সময়।

—এ সবের মধ্যে আমি নেই। এখন দীপকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার বিষয় নিয়ে অনেক কথা আছে।

—থাক চঞ্চল সে প্রসঙ্গ দীপক বলে ওঠে চঞ্চলের দিকে চেয়ে।

অনিল কিছুই বুঝতে পারে না। অনিলের তবু আর কোনো প্রশ্নও আজ এতদিন পর দেখা হতেই করতে তেমন মন হল না। তবে তার মনের মধ্যে প্রশ্ন থেকেই গেল—দীপকের কি বিষয় এমন রয়েছে? ধনীঘরের একমাত্র সন্তান দীপক। কত আনন্দের জীবন। কি জানি বৈষয়িক কিছু ব্যাপার আছে, না অন্য কিছু? যাই হোক পরে জানা যাবে।

—তা হলে আসছে শনিবার অনিল বিকেলে আমার বাড়ি কি আসতে আপত্তি আছে?

—না না, আপত্তি থাকবে কেন, ঠিকই যাওয়া যাবে।

—চঞ্চল তোকেও বলা রইল। দীপক চঞ্চলের দিকে ফিরে বললে।

—আমি তো না বললেও গিয়ে হাজির হতুম। বললি যখন তখন তো আর কথাই নেই।

চঞ্চল খুব সন্তুষ্টি নিয়ে কথাগুলো বললে। সে যেন এটাই চাইছিল যে অনিল ও চামেলী দীপকের বাড়িতে আমন্ত্রিত হোক। চঞ্চল ভাবলে কথাটা কি আজই পুরবী প্রসঙ্গে আলোচনা করবে! পরে ভাবলে—না থাক।

চামেলী চা আর হালুয়া নিয়ে ঘরে এলো তিনজনেরই জন্যে। চঞ্চল বললে—কি সুন্দর, আমার মন এখনই হালুয়া খাই খাই করছিল আর বৌদি ঠিক তা টের পেয়েছেন?

—বৌদি তা হলে অন্তরযামী বলুন। রসিকতা করে চামেলী বলে ফেললে।

দীপক হাসলো কথা শুনে। বেশ ভালো লাগলো পরিবেশ।

দীপক বললে—বৌদিকে কিন্তু আসছে শনিবার বিকেলে আমার বাড়ি একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে।

—আমি তো পা বাড়িয়েই আছি তবে আপনার বন্ধুর সময় হবে তো? তবে জুতো পরি সবাই ধুলো পায়ের কথাটা নয়। বলবেন একশোবার যেতে। আপনিও আসবেন।

অনিল বললে তখন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছে শনিবার যাব। কালই যেতে বলছিল দীপক, সেটাতো হবে না, তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া আছে।

—বেশ শনিবার বিকেলে দীপকবাবুর বাড়ি যাওয়া হবে তা হলে। আমার বাপের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও তেমন বিয়ের পর যাওয়াই হয় নি।

—বৌদির সব সময় অভিযোগ।

চঞ্চলও যেন চামেলীর প্রতি অভিযোগের স্বরেই কথাগুলি বলে।

হালুয়া খেয়ে চা পর্ব তিনজন ততক্ষণ শেষ করলো।

মনীষ অফিস থেকে ফিরে মণির পড়াশোনা দেখছে। ইন্দু প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ ও মাদারের ছবির সামনে ধূপের ধোঁয়ায় আরতির ভঙ্গিমায় শ্রদ্ধা জানায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে। আজও তাই করছে। কেন করছে? প্রশ্ন জাগে কি? তবে করছে প্রতিদিনই।

মনীষ সশ্রদ্ধ মনে চোখ তুললে, মণিও মায়ের দিকে চাইলে।

—আজ একটা চিঠি এসেছিল। ইন্দু বললে মনীষকে। টেবিলে কাগজ চাপার তলায় রয়েছে। মনে হয় বাবা পাঠিয়েছেন। হাতের লেখা দেখে তাই মনে হ'ল, খামে দুর্গাপুরের ছাপ কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

মনীষ বলে—দেখি খুলে কি বলেন আবার। তা তুমি খুলে দেখো নি কেন?

—কি জানি, বাবার না হয়ে অন্য কারো যদি হয়? হতেও তো পারে, আমি আর কতটুকু জানি বলো!

—থাক থাক, খুব নাটুকেপনা চিন্তা হয়েছে। অন্য আর কে?

মনীষ কথা বলতে বলতেই খামটা খুলে ফেললে। দেখলে তার ভেতরে দুটো চিঠি, একটায় লেখা—স্নেহের বৌমা সম্বোধনে আর অন্যটায় বাবা মনীষকে।

মনীষ পড়তে থাকে বাবার লেখা পত্র দুর্গাপুর থেকে এসেছে। তিনি লিখেছেন—'মনীষ, তোমার ভগ্নীপতির ভগ্নীপতি প্রবীণ উকিল ছিলেন। তাঁর শ্রাদ্ধের কাজেই যোগ দিতে গত বছরে এরা কলকাতায় কাটিয়ে ছিল আশা করি তোমার স্মরণে আছে। আমরা কিছুদিন এখন এখানে থাকবো। নাতনীটি আমাদের বিশেষভাবে জড়িয়ে রেখেছে। এদের প্রথম সন্তান তাই তোমার মাকেই সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে মাথার ওপর বাবাজীবনের আর তেমন তো কেউ নেই। এর মধ্যে তোমার ওপরে একটা দায়িত্ব দিতে হচ্ছে আমার, সেটা হচ্ছে এই যে, তোমার ভগ্নীপতির ভগ্নীপতি স্বর্গত উকিল

দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যার বিবাহ বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করতে হবে। আমি উষা মাকে অর্থাৎ তোমার ভগ্নীপতির বোনকে তোমার কথা লিখতে বলেছি বাবাজীবনকে। তুমি তার সঙ্গে অবশ্য যোগাযোগ করবে এবং আশা করছি তুমি তাদের যাবতীয় ব্যবস্থার জন্যে এগিয়ে যাবে। কারণ উষা মা অতি ভালো মেয়ে সে যেন কোনো রকম অসুবিধা না বোধ করে তা দেখাও উচিত। তার ছেলেটির সন্ধান নেই—একমাত্র মেয়ে নিয়ে সংসার। বিয়ের ব্যবস্থা দেখবে। যদি দরকার হয় খবরের কাগজে পাত্র চাই কলমে বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করতে পারো বা নিজে খোঁজ নিয়ে পাত্রের সন্ধানে থাকতেও পারো। মোট কথা তাদের বিষয় তোমারই দেখা শোনা করতে হবে। আমাদের সব ভালো, তোমাদেরও তাই আশা করছি। তোমার বাবা'

ইন্দু বলে ওঠে—তা ভালো ফরমায়েস। পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য কর ; যাও কাল থেকে আমার মহাননদকে সহায়তা করতে।

—মহাননদ মানে ? মনীষ অবাক চোখে প্রশ্ন করে।

ইন্দু বলে—মহাননদই তো। আমার ননদের ননদ তিনি যে !

—ও হো হো, তা বেশ মহাননদ, ভালো বলেছ।

মনীষের কথা শেষ হতেই ইন্দু বললে—মা কি লিখেছেন শোনো। মা লিখছেন—'স্নেহের বৌমা, তোমার অনেকদিন কোনো খবর আসে নি। দাদাভাই কেমন আছে। তোমাদের জন্যে মন কেমন করে। কিন্তু এখানে মেয়েটা ছোট বাচ্চা নিয়ে একা পারে না তাই থাকতে হচ্ছে এখন কিছুদিন। পুজোর সময়ের জন্যে নাতনীর জামা দেখে শুনে এর মধ্যেই সময় পেলে কিনে রেখো। মেয়ে-জামাইয়ের তো রাখবেই। পরের চিঠিতে কতটা কি করলে জানিয়ো। তোমরা আমাদের আশীর্বাদ জানবে। ইতি মা'

—কি বুঝলে ?

ইন্দু মনীষের দিকে বড় বড় ডাগর চোখে চেয়ে প্রশ্ন করলে।

—তুমিও যা বুঝেছ আমিও তাই, নতুন আর কি বল ? তাঁরা তো শুধু হুকুম করেই খালাস, এখন তো তামিল হবে তা আমার শ্রমে। ভালো হয়েছে সমাজ ব্যবস্থা।

মণি এতক্ষণ চুপ করেই বই-খাতায় মন রেখে পড়ছিল। সে বললে- মা, ঠাকুমা কি পুজোর সময়ও আসবে না ?

—কি করে বলি, বল। ইন্দু ছেলের কথার জবাব দেয়।

মনীষ বলে—আচ্ছা রাখো এখন এ সব। কাল রবিবার আছে ঘরে বসে যা হয় ভাবা যাবে।

—ভাবাভাবির আর কিই বা আছে। মহাননদের সংসার গুছোতে এবার গতর লাগাও, আর কি? নিজের সংসার ভেসে যাক।

ইন্দুর এই অভিযোগ করা কথায় মনীষ বিব্রত বোধ করে। বলে—কি বলছো ইন্দু? তাদের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ যদি আসে তার খবর নিয়ে বলতে গেলে নিজের সংসার ভেসে যাবে কি? এভাবে কথা বলো না। এটা নেহাৎ হাল্‌কা মনের কথা। পণ্ডিচেরীতে গিয়ে দেখলে তো কি বিরাট কর্মশালা সেখানে। একটা বৃহৎ সংসার, কত আয়োজন। ঠিক চলছে। আমাদেরও ছোট গণ্ডির মধ্যে যতটা পারা যায় পরের জন্যে কাজ করেও আসল নিজের সংসার দেখতে হবে বৈ-কি।

—সময় পাবে কি করে?

—গোটা সপ্তাহে একদিন দু-একঘণ্টা সময় করে নিতে চেষ্টা করতে হবে।

—থাক আর অত হিসেবী হতে শিক্ষা দিতে হবে না। এখন মণিকে শিক্ষা দাও।

—হ্যাঁ, তাই দিই। তুমি যাও তোমার সংসারের কাজে।

—আর তুমি যাও এবার থেকে মহাননদের সংসারের কাজে।

—তিনি বিধবা। তাঁর মেয়ের বিয়ে কে দেবে? একটিই ছেলে সে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সীমান্তে বেরাতে গিয়ে আর ফেরে নি। কি দুঃখের বলো তো!

—এবার ঘর বেশ খালি পাবে মেয়ের বিয়ে চুকলে, কি গো?

—ইন্দু! কি বাজে বকছো। যাও···

মনীষ বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

মণি আস্‌তে আস্‌তে উঠে যাবে ভাবে। চেয়ার ছেড়ে সে উঠ্‌তেও যাচ্ছিল। মনীষ বললে—দেখি তোর অঙ্কের বই কই আজ অঙ্কের প্রশ্নমালা কতকগুলি হোক।

মণি আবার বসে যায় চেয়ারে। অঙ্কের বই এগিয়ে দেয় বাবার হাতে। ইন্দু ততক্ষণে ঘর থেকে চলে যায় বেশ একটা দেমাকি ভঙ্গি নিয়ে, যেন বলতে চায়—আচ্ছা তুমি মহাননদের সংসার গোছাতেই লাগো।

মনীষ অঙ্কের বই খুলে কিছুতেই আর মন বসাতে পারে না। ভাবছে যে

মেয়েদের এই ঈর্ষার মনটা ঠিক হয় কোন অঙ্কে? কোনো অঙ্কেই যেন মনীষের ঠিক ঠিক হদিস মিলছে না।

চোদ্দ বছর হল মনীষের বিবাহিত জীবন। তেরো বছরের ছেলে মণি। ইন্দুকে কতবার কত কথায় রাগাতে চেষ্টা করেছে মনীষ কিন্তু কিছুতেই সে রাগে নি! বড় শান্ত স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু বেশ রসিকতা করে মহানন্দ বললে আবার হঠাৎ তার মেয়ের বিয়ে প্রভৃতি খুঁটিনাটি ব্যাপারে আসার মধ্যে দিয়ে সংযোগটা যেন খট্‌কা ধরিয়ে দিচ্ছে ইন্দুকে।

মনীষ ভাবতে গিয়েও থম্‌কে যায়।

মণি বলে—বাবা, আমি ইংরেজি গ্রামারটা একটু দেখি। যখন আটকাবে কোথাও তোমার কাছ থেকে তখন জেনে নেবো।

—হ্যাঁ তাই ভালো। মনীষ ছোট্ট উত্তর দেয় ছেলেকে।

মনীষের মনটা ইন্দুর এই বিক্ষিপ্ত মনের তোলপাড় করা সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে তখন। সে একটা কূল খুঁজতে চাইছে চেয়ারের ঠেসনটায় পিঠ এলিয়ে বসে। দেওয়ালে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ ও মাদারের ছবির দিকে চোখ রাখে। মনীষের এইভাবে কিছুটা সময় কাটলো।

এরও পর ঠিক যেন ঘুম নয় একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে চোখ বুজে ছিল মনীষ। হঠাৎ সে অনুভব করলে তার দাড়ি ধরে কে যেন কোমল হাতে নাড়া দিল আলতো করে। মনীষ তখনই চোখ খুলে অবাক হল, দেখলে ইন্দু তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

—কি হল? খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। একটু বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম কর।

ইন্দুর এমনি মিষ্টি মধুর কথায় মনীষের মনটা বেশ হাল্‌কা হল যেন। সে বলে ফেললে তার হাত দুটো ধরে—না না, আর কোনো ক্লান্তি নেই। সব ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল তোমার মধুর মুখের মিষ্টি হাসিতে।

—থাক আর সোহাগে কাজ নেই। পাশের ঘরে মণি রয়েছে না!

ভ্রূকুঁচকে দুষ্টুমী ভরা চোখে চেয়ে বলে ওঠে ইন্দু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা।

—আচ্ছা, একটা কাজ কর, মহানন্দের কাছে আমিও যদি যাই তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে। কেমন হয় তা হলে?

—আরে বাস, তা হলে তো খুব সুন্দর হবে। তাই হবে।

—কবে যাবে তা হলে?

—তোমার যে আর সময় কাটছে না দেখ্‌ছি।

—না না, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। তোমার তো মেয়ে নেই তুমি কি করে বুঝবে। আমার মা-বাবার উদ্বেগ দেখেছি আমার বিয়ের আগে পর্যন্ত। কি হবে…কোথায় হবে…কেমন হবে? যেন দুজনের রাতের ঘুম চলে গিয়েছিল। আমার যে কি খারাপ লাগতো তখন।

—তার পর এখন কেমন লাগছে?

—আবার এমনি ভাবের কথা বলছো। চুপ করো বলছি। পাশের ঘরে মণি…

ইন্দুর কথা শেষ হবার আগেই মনীষ বলে—ঠিক ঠিক, এই চুপ ও ধরনের কথা আর নয়। আচ্ছা, কাল রবিবার বিকেলে যাওয়া যাবে তোমার মহানন্দের বাড়ি। কেমন ঠিক তো?

—হ্যাঁ। ইন্দু বেশ সুর টেনে সম্মতিসূচক উত্তর দেয়।

মনীষ এত সহজে এ বিষয়ের সমাধান আশা করে নি। বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে সে। তার মনের মধ্যে ইন্দু যেন আরো আদরের আরো স্নেহের আরো প্রেমের বাঁধনে তাকে বাঁধলে বলেই মনে হতে লাগলো মনীষের। বিয়ের মাঙ্গলিক বন্ধন তো সামাজিক কিন্তু মানসিক বন্ধনটা তো বর-বধূর জীবনমিলনে পরস্পরের বোঝাবুঝির টানাপোড়েনের তাঁত বোনায়।

মনীষ ভাবে ইন্দুর সঙ্গে তার সেই ভাবেই বুনুনিটায় দৃঢ়তা আছে।

ঘরের ধূপের গন্ধে মনটা বেশ স্নিগ্ধ সুখ অনুভব করে।

শর্মিলা শনিবার দুপুরে বাড়ি ফিরল।

মা বললেন—শর্মিলা তোর একটা চিঠি এসেছে, তোর দেরাজের ওপরে কাগজ চাপার তলায় রাখা আছে।

শর্মিলা তাড়াতাড়ি গিয়ে চিঠিটা খুললে। যা ভেবেছে তাই দীপ্তেন্দু উত্তর দিয়েছে তার চিঠির সেই হলুদ রঙের কাগজের ওপর সবুজকালিতে লেখা। মনটা ভরে গেল তার। বুকটা কিন্তু ঢিপ্‌ঢিপ করছে।

কি লিখছে এবার দীপ্তেন্দু? গত চিঠিতে এমন অস্থিরতা বাড়িয়ে দিয়েছে শর্মিলার যে সে এ কদিন স্বাভাবিক ভাবে কিছু ভাবতেই পারে নি। সে রাতের বিছানায় শুধু বালিসের চাপা ভিজিয়েছে চোখের জলে।

চিঠির প্রথমেই শুধু 'শর্মিলা' সম্বোধন এবারও। দীপ্তেন্দু লিখছে—'তোমার

চিঠিটা আমার জীবনের মরুভূমির মধ্যে একখণ্ড মরূদ্যান হয়ে এসেছে। এতদিন পর নীরবতার ক্ষমা নিয়ে যে তোমার চিঠি আসবে তা ভাবতেই পারি নি। আমার সব নিরাশার এখনও কিন্তু নিরসন হয় নি কারণ আমার জীবনের এইবার তোমার অজানা কথা জানাবার সুযোগ এসেছে। সেই সুযোগ নিয়েই এই চিঠিতে আমি তা জানাচ্ছি। যদি তার পরও আমায় সংযোগ করতে বল তবেই আবার যোগাযোগ করবো নচেৎ নয়। আমি যখন বিদেশে যাই তখন কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। আমার বাবার অধ্যাপক জীবনের এক সহকর্মী মনে হল তখন বিলেতে আছেন। আমি তাঁকে আমার স্বর্গত বাবার কাছে তাঁর নাম বহুবার শুনেছি এবং মনে করিয়ে দিলুম যে ভারতবর্ষে থাকার সময় আমি আমার বাবার সঙ্গে খুব ছেলে বয়সে তাঁর বাড়ি গিয়েছি, হয় তো তাঁর মনে আছে। আমার পত্র পেয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক পত্র দিলেন যে ভারতবর্ষে তিনি এসে যে কয়জন ভারতীয়কে মনে রেখেছেন তার মধ্যে আমার বাবা একজন। কারণ আমার বাবার কাছে তিনি অনেক সহযোগিতা পেয়েছেন যা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেন তা তাঁর কাছে কখনই ভোলার নয়। এই পত্র পেয়ে আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলুম। আমার কোনো কাজ সেখানে তিনি জুটিযে দিতে পারেন কিনা—সে কথা জানতে চেয়ে আবার পত্র দিই। তার উত্তরে তিনি লিখলেন, এখনই যেন আমি রওনা দিই। যদি যাবার খরচ না থাকে যেন ফেরৎ ডাকে জানাই, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। অর্থাৎ তিনি আমার সবরকম সুযোগ সুবিধার দায়িত্ব নিচ্ছেন এমন একটা আশ্বাস দ্বিতীয় পত্রে পাই। সেই আশ্বাসেই বিদেশ যাত্রা করি।

সেখানে তাঁর বাড়িতে থেকে বিশ্ববিদ্যালযের উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ তিনি আমায় করে দিলেন। আমার শুধু যাওয়ার খরচটা লাগলো। সেখানের যাবতীয় ব্যয় তিনিই বহন করতে লাগলেন। তাঁর পরিবারে আর কেউ ছিল না। কেবল একটি পালিতা কন্যা ছাড়া। এইখানে বলে রাখি ইনি আইরিশ সাহেব বিবাহ করেছিলেন কোনো একজন ভারতীয় মহিলাকে কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান হয় নি—তিনিই এই কন্যাকে পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আইরিশ সাহেব একেবারে খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। আমায় পেয়ে বোধ হয় তাঁর মনের কোণে একটা প্রসুপ্ত ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। তাই আমায় প্রায় তাঁর বাড়ির ছেলের মতোই রাখলেন। তাঁর স্ত্রীর মতো তাঁর পালিতা কন্যাও ভারতীয় এইটুকু জানতেন তাই তাঁর ইচ্ছে হয় কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে বিয়ে

দেবেন। আগে আমি তা জানতে পারি নি। থাকতে থাকতে আমার প্রতি তাঁর মেয়ের না হলেও সাহেবের বেশ প্রীতি জেগে উঠেছিল। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির পড়া প্রায় শেষ করেছি এমন সময় সাহেবের শরীরটা বেশ খারাপ হতে আরম্ভ করলো। তিনি আমার থিসিস কি ভাবে বিবেচিত হচ্ছে তার সংবাদ জানতে দারুন্ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত খবর জানা গেল যে, আমাকে ডক্টরেট উপাধির যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। তখন তিনি শয্যাগত। তাঁকে খবরটা শোনাতেই তিনি একটা চেক লিখে দিলেন আমার নামে ভারতবর্ষে ফিরে আসার খরচ যা লাগবে সেই পরিমাণ। আমি তো অবাক। তার দিন দুই পর তাঁর শরীর আরো খারাপ হল। আমি কাছে যেতে আমায় বললেন—আমি একমাত্র সান্ত্বনা পাই যদি তোমার কাছে শুনি যে তুমি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করবে। আমি তখন এমনভাবে তাঁর সাহায্যে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলুম যে কি বলবো তা ভাবছিলুম মাথা হেঁট করে। তিনি আমার নীরবতাকে সম্মতি ভেবে আমাদের দুজনকে তাঁর অসুস্থতার সেই ঘরেই একেবারে বিবাহবন্ধনের এক পর্ব সমাধা করলেন। তবে বললেন ভারতীয় প্রথায় ভারতে গিয়ে অবশ্যই যেন আমরা বিবাহ উৎসব করি। আমি তো বটেই তার কন্যাও কোনো আপত্তি সে সময় করে নি। এর কদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। আমাকে আরো মাস কয়েক থাকতে হল। সব সম্পত্তি আগেই তিনি কন্যার নামে করে রেখেছিলেন। আমি ভারতবর্ষে ফিরে আসবো বলায় তাঁর কন্যাও ফিরে আসার মন করলে। আমরা ভারতবর্ষে ফিরে প্রথমে বোম্বাই শহরে উঠি। সেখানে কাজের সন্ধান করে একটা কাজ পাওয়া গেল, সাহেবের পুরাতন কর্ম স্থলে। সেখানে তাঁর নাম তখনও বেশ উজ্জল হয়ে রয়েছে দেখি। বিপদ কিভাবে এলো আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। একদিন আমার সন্দেহ হল এবং সেই সন্দেহের শেষ বা তাই বলি সাহেবের পালিতা কন্যা তার ভারতবর্ষে থাকার সময় এক বাল্য প্রণয়ের জোয়ারে ভেসে আমার কাছ থেকে চলে যেতে পেরেছে বেশ কিছুদিন পরই। তার পরই আমি বোম্বাই ত্যাগ করে রাজস্থানে চাকুরি জীবন শুরু করেছি সবে। এখন যা মনে হয় তাই ঠিক করে জানাবে বা চুপ থাকবে—এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

এই দীর্ঘ চিঠি পাঠ করে শর্মিলা স্তম্ভিত। কি লিখবে সে দীপ্তেন্দুকে। ভাবছে—ভাবছে আর ভাবছে, কেবলই এখন ভাবছে। ভুলে গেছে বাড়ি

ফিরে কাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে বিকেলে সংসারের কাজে সে প্রতিদিন যোগ দেয় মায়ের কাছে।

মা ভাবলেন আবার কার চিঠি এলো? ঘরে এসে তিনি দেখলেন শর্মিলা হলুদ কাগজের চিঠি হাতে সামনে জানলার দিকে মুখ করে চুপচাপ বসেই আছে। মা একবার ভাবলেন কি বলবেন? তিনি ঘরে ঢুকেছেন তা যেন শর্মিলা বুঝতেই পারে নি। মনে হল চলে যাই। সেই ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকলেন। ঠিক আগেরই মতো দেখলেন শর্মিলা পাথর হয়ে বসে আছে যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছে।

ধীরে ধীরে মা শর্মিলার কাছে এলেন। কাঁধে হাত রাখলেন। শর্মিলা যেন সারা দেহে বিদ্যুৎস্পর্শে চমকে উঠলো। মা দেখলেন মেয়ের চোখে জল ভরে ভরে উঠছে। বুকের কাছে টেনে আনলেন! মায়ের বুকে মুখ রেখে শর্মিলা কাঁদলো কিছুক্ষণ। মা কোনো কথাই আর বললেন না।

শর্মিলা বললে—মা, তোমাকে তো বলা হয় নি দীপ্তেন্দুর চিঠি আগে একটা এসেছিল তার পর আমি উত্তর দিই এবং তার পর তার উত্তর এই। কি করি এখন? মা গো! আঁচলে মুখ ঢাকে শর্মিলা।

মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা বা আশ্বাস যাই দিতে চান না, মন যে তার ঝড় তুফানে উথাল-পাতাল করে দুলছে।

তীর কই? তরী কি ভিড়বে তীরে?

মেয়েকে দেওয়া চিঠিটি গোধূলি সূর্যের রাঙা আলোয় পশ্চিম জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে পড়লেন। পড়া শেষ করে মেয়ের হাতে চিঠিটি ফেরৎ দিয়ে বললেন—এর জন্যে মন খারাপ করা কেন শর্মিলা। সে তো উপকারীর কাছে অকৃতজ্ঞ হতে পারে না। সে তো তার মনুষ্যত্বের মর্যাদাই রক্ষা করেছিল। তার পর যদি কোনো খারাপ পরিচয় এসে গিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়ে থাকে—আর তো কোনো মিল নেই। সে জট তো মুক্ত হয়ে গিয়েছে দীপ্তেন্দুর। এখনই তাকে একটা চিঠি লিখে দে। সে যেন কলকাতায় চলে আসে। আমাদের এখানেই উঠতে বলিস।

শর্মিলা মায়ের এমন উদার মনোভাবের কথা শুনে যেন ডুবতে ডুবতে ভেসে ওঠার খড়কুটো নয় একেবারে কঠিন ভূমি পেয়ে গেল। জানলা দিয়ে দেখতে পেলে একফালি চাঁদ হাসছে তারা ভরা সন্ধ্যার আকাশে।

অন্ধকার মনের কোণটাও যেন ভরে গেছে জ্যোৎস্নার নীলে।

হাসি পেলো স্বর্ণ রায়ের। কোচিং ক্লাসের সেদিন প্রতিষ্ঠা দিবস। একটি ছাত্র নানা গায়ক-গায়িকার কণ্ঠের অনুকরণে রবীন্দ্রসংগীত অতুলপ্রসাদী রজনী-কান্ত নজরুলের গান গেয়ে গেয়ে শোনাতে লাগলো। একই কণ্ঠে নানা স্বর মজা লাগে বেশ। স্বর্ণের পাশেই বসে ছিল সুশোভন।

হঠাৎ একটা রবীন্দ্র-সংগীত শুনেই সুশোভন বলে উঠলো—এতো পূরবী দেবীর গান। ঠিক পূরবী দেবীর নকলে হয়েছে।

স্বর্ণ চমকে উঠলো—মনের কোনের পূরবী বাইরে যেন সুশোভনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুললো।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করলে—তুমি পূরবী দেবীকে চেনো?

সে বললে—হ্যাঁ, এইতো রেডিওতে গান করছিলেন সেদিন। আপনি স্যার রেডিও শোনেন না বুঝি?

সুশোভনের প্রশ্নটা অশোভন ভাবে কানে বাজলো স্বর্ণের এবং চমকে উঠলো যেন আচমকা একটা মর্মপীড়ায় বা ব্যথা ভরা পিঠে। নাম এক ভেবে সে কেন আগ্রহ নিয়ে ছাত্রের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরতে গেল? ইস্! সে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে যায়।

আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ অনুষ্ঠান সূচীর নীরব দর্শক হয়ে যায়।

একজন যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করলে। বেশ কায়দা কানুন ভালো, হাতের সাফাই খেলাও ভালোভাবে দেখাচ্ছিল।

সুশোভন নিজে থেকেই এবার বললে—স্যার, ও আমাদের পাড়াতেই থাকে, একদিন আমাদের বাড়িতে খেলা দেখাবে বলেছে। আপনি স্যার যাবেন সেদিন। বেশ ভালো দেখাচ্ছে তাই না?

—হ্যাঁ, তা ভালোই দেখাচ্ছে গো।

—আজ কথা হয়ে রইল যেদিন আমাদের বাড়ি হবে আপনাকে যেতে হবে কিন্তু।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে কথা সে সময় হবে। আজ থেকে তো কথা দিয়ে রাখতে পারি না। সবে সোমবার আজ।

স্বর্ণের উত্তরে সুশোভন চুপ করে বসে থাকে। সে শুনেছে দীপ্তেন্দুদা আসছেন শীঘ্রই। তিনি এলে স্বর্ণবাবু আর দু'একজনকে বলবে বাড়ি যেতে সেদিন যাদুবিদ্যার খেলা দেখাতে বলবে গোপালকুমারকে।

বেশ হাসির কথা বলে খেলা দেখায় মৃণালকুমার। সুশোভন ভাবে বাড়িতেও একটু হাসি খুশির রোদ ঝল্‌মলে দিন আসুক এইভাবে।

সুশোভনের ব্যবহারে এবং কথায় বেশ একটা আন্তরিকতার ভাব অনুভব করে সুবর্ণ।

তবু ভাবে। ছেলেটার হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে, বলে বসলো একটা কথা —আসবেন স্যার আমাদের বাড়িতে মৃণালের যাদুবিদ্যা দেখার ব্যবস্থা হবে।

অনেক রকম কার্যসূচী ছিল। মৃণাল দুই তিনটে খেলা দেখিয়ে তার অনুষ্ঠান শেষ করলে। তখনই সুশোভন গিয়ে মৃণালের সঙ্গে কথা বলে এলো।

সুবর্ণের কাছে ফিরে এসে বললে—স্যার, আসছে রবিবার বিকেলে আমাদের বাড়িতে মৃণালকুমারের যাদুবিদ্যা প্রদর্শনী হবে। এই যে আমাদের ঠিকানা নিন। ঠিক ছটার সময় হবে।

—সে কি? তুমি যে একেবারে নাছোড়বান্দা ছেলে দেখছি। তোমার বাড়িতে কথা বল। তার পর তো?

—না স্যার। সে সব আমি দেখবো। মা তো কিছু বলবেন নাই শর্মিলা-দিদিও কিছু বলবে না।

—ও তোমার মাও কিছু বলবেন না। তোমার শর্মিলাদিদিও কিছু বলবেন না।

—না স্যার, তাঁরা খুব খুশিই হবেন এতে। আমার দিদির সঙ্গে আলাপও করবেন। গবেষণা করছেন দিদি বাংলায়।

—তাই নাকি? বারে বাঃ, খুব ভালো বলতে হবে!

সুশোভন উৎসাহ পেয়ে বলে—হ্যাঁ স্যার, দিদি খুবই ভালো। আমায় দেখে দিদির বিচার হয় না।

—তা বেশ।

সুবর্ণের মনে পূরবীর অরুণ রাগেও যেন স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে শর্মিলার।

সুশোভন বলে—আমি আবার এর মধ্যে আপনাকে মনে করিয়ে দেবো। আপনি ঠিক আসবেন স্যার।

সুবর্ণ ছেলেটির আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়ে যায়। সামান্য কোচিং ক্লাসের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা বা মনের টান দুর্লভ।

মনে মনে নিজের সৌভাগ্যের প্রতি নিজেরই যেন শ্রদ্ধা হয়, নিজেরই অশান্ত মনের সান্ত্বনাটুকু নিজের মধ্যেই যেন ফিরে পায় সুবর্ণ।

ভাবে পুরবীর সঙ্গে তো আর দেখা হবে না। হারিয়ে যাওয়া প্রেম তবুও বারে বারে যেন তার মনকে নাড়া দেয়। কেন? কেন? কেন?

প্রশ্নের ঢেউ নিয়ে চঞ্চল হয় স্ুবর্ণের মন।

পরের শনিবার চঞ্চল গোস্বামী বেশ একটু সময় করে নিয়ে দেড়টার সময়েই কাজ গুছিয়ে মেসে ফিরে এলো। তার বরাদ্দ সপ্তাহের চায়ের পাতার প্যাকেট রেখে নিজে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলে। চারটের সময় দীপকের বাড়ি যাওয়ার কথা। কাজেই সাড়ে তিনটের মধ্যে অনিলের বাড়ি পৌছিয়ে তাদের নিয়ে যেতে হবে দীপকের বাড়ি। চামেলী-বৌদির একটু সাজগোছ আছে তার জন্যে সময় ধরে রাখতেই হবে চঞ্চলকে।

এই সব ভেবে চঞ্চল এখনই তৈরি হয়ে নিলে মেস থেকে বেরিয়ে যেতে। তখন প্রায় তিনটে বাজে? কারণ শ্রীনিবাস বাবু এসে যান যদি তা হলে বলে বসবেন ঠিকই—আরে কোথায় যাবেন বসুন একটু গল্প করি দুজনায়। আধা ছুটি ভোগ করি গালগল্প করে।

তাঁর কথা এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে সংকোচ হবে চঞ্চলের। কিন্তু সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই শ্রীনিবাস বাবু এসেই হাজির হলেন।

তাঁকে দেখেই মনের ভাব মনে রেখে চঞ্চল বলে ওঠে—আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম, দেখবেন আজ একটু দেরি হতে পারে ফিরতে।

—তা বেশ, আজ শনিবারটা আমায় একলা ফেলে যাবেন, যান। আপনার বাবার চিঠি পেয়েছেন?

—কই? না তো! চঞ্চল সবিস্ময়ে বলে ওঠে।

—চিঠির বাক্সেই যে রয়েছে তা হলে। তাজ্জব ব্যাপার দেখি। এখনো দেখেন নি। সকালে যাবার সময় দেখে গিয়েছি।

শ্রীনিবাস বাবু কথা শেষ করতেই ঘরের বাইরে গেলেন এবং চিঠির বাক্স থেকে একটি পোষ্ট কার্ড এনে দিলেন। চঞ্চল পড়ে দেখলে বাবা লিখছেন—তাঁর শরীর খারাপ কিছু অর্থ যদি পাঠায় ভালো হয়, মাতৃদেবীরও শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। গ্রামে বেজায় কষ্টের জীবন হয়েছে। এর আগে এতটা কষ্টকর গ্রামজীবন হয় নি কখনো।

চিঠি পড়ে সে যে কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না। শ্রীনিবাস বাবুকে বললে—আপনি যে কি উপকার করলেন তা কি বলবো। আপনার

দেওয়া পোষ্ট কার্ডে লেখা পত্রের জবাবও এলো আপনার হাত দিয়ে। ভারী ভালো লাগলো। আমি এখন বেরোচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যের পরও হতে পারে।

—ঠিক আছে যান। আমি একা শুয়ে শুয়ে ঘরের কড়িকাঠ গণনা করি। এক দুই তিন করে। বেশ ছেলে, যান আর দেরি করেন কেন এখানে বুড়োর সঙ্গে কচকচিয়ে।

—না না, সে কথা বলছেন কেন? এসে যাব যত তাড়াতাড়ি হয়।

—তাড়ার কিছু নেই, প্রেমসে ঘুরে আসুন। আমি এ ঘর আগলে থাকছি।

চঞ্চল চলে এলো অনিলের বাড়ি।

তারা দুজনেই তখন তৈরি হয়েই বসে ছিল। চঞ্চলকে দেখেই চামেলী বলে ওঠে—খুব সময় গেন। আমরা কখন থেকে বসেই আছি, বসেই আছি। ভাবলুম ভুলে যান নি তো।

—তা ভুলিয়ে দেবার মতোই অবস্থা। গত মাসে বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছি, এ মাসেও পয়লা তারিখে। এখনো মাস কাবার হলো না আবার বাবা টাকা পাঠাতে লিখেছেন। আমি কেমন থাকি সে সব কোনো সন্ধান করার নেই, শুধু টাকা চাই। ছেলে টাকার গাছ পুঁতেছে।

অনিল কথাগুলো শুনে ভাবলে সত্যি এ অবস্থায় চঞ্চলের বিয়ের প্রসঙ্গে কথা বলা তাদের ঠিক হচ্ছে না। যাই হোক এখন চলা যাক।

বলে উঠলো অনিল—চল ভাই, চল, আর দেরি করে লাভ নেই দীপক অপেক্ষা করে রয়েছে।

—চল চল, আর দেরি কেন?

—আপনার অপেক্ষায় থেকেই তো! চামেলী বলে ওঠে।

তখন চঞ্চল বললে চামেলীর কথার রেশ ধরেই।

—তা চলে গেলেই পারতেন।

—তেমন ভাবে যাবার হলে কি আর অপেক্ষায় থাকা হত মশাই, কখন চলে যাওয়া হত।

—আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নেই, চল তো। অনিল বললে।

এর পর আর দেরি করা চলে না। তিন জনে বেরিয়ে গেলো।

দীপককুমারের বাড়ি দেখে চামেলী আসতে আসতে চঞ্চলের দিকে চেয়ে বললে—এইটা দীপক বাবুর বাড়ি? বাঃ, কি সুন্দর!

—এই রে, তোমার মাথা ঘুরে গেল না কি দেখে! অনিল বলে ওঠে।

—কি যে বাজে কথা বল। কোনো কথা বলার উপায় নেই। চামেলীর কথা আর কারো কানে যাবার আগেই চঞ্চল ততক্ষণে দীপকের বসার ঘরে ঢুকে গিয়েছে, অনিলও। চামেলীও পিছনে যায়। দীপক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—কি সৌভাগ্য আমার। চলুন আপনাকে মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। মা তো কখন থেকে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

চামেলী বলেই ফেললো—এই চঞ্চল বাবুর জন্যেই অপেক্ষা করে করে। তার পর এলেন, তবে তো।

—বারে, বেশ পরের ওপর দোষ দেওয়া ?

চঞ্চল বললে নকল বিব্রতের ভান করে।

—সত্যি যা তাই বলেছি। ভণিতা করে কিছু বলতে পারি ন'।

দীপক তখন চামেলীকে সমর্থন করে বলে—ঠিকই তো। যা সত্যি তাই বলবেন ভণিতার দরকার কি ? চলুন মায়ের কাছে।

দীপকের সঙ্গে চামেলী মায়ের কাছে বাড়ির ভেতরে চলে যেতে অনিল আর চঞ্চল ঘরের চারদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে থাকলো। কত আসবাব পত্তর। কত সুন্দর ভাবে তা ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা।

ভারী ভালো লাগলো অনিল আর চঞ্চলেরও। সেদিনের আসায় এত দিকে চোখ দিতে পারে নি চঞ্চল, লজ্জায় বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক।

অনিল বললে—তোর মুখে দীপকের ব্যক্তিজীবনের পুরবীর প্রসঙ্গ শুনে পর্যন্ত আমার তো বটেই চামেলীরও মনটা বড় সহানুভূতিতে ভরে গিয়েছে। দীপকের মতো ছেলে, তার জীবনে একি ? ভাগ্যের পরিহাস ?

—তাই তো ভাই, মনটায় বড় দাগা দিয়েছে আমার। চঞ্চলের কথার শেষ হতে না হতেই দীপক ঘরে ঢুকে বলে—কিছু মনে করিস না ভাই, তোদের একলা বসিয়ে রেখে মায়ের কাছে চামেলী-বৌদিকে পৌঁছিয়ে দিতে যাই।

—না না, তার জন্যে কি হল ? অনিল বেশ সহজ ভাবে বললে।

চঞ্চলের মুখচোখের ভাবে যেন ফুটে উঠলো—এ কথাগুলো তারও মনের কথা বলার মতো হয়েছে।

—আধাবিকৃত-মস্তিষ্কের মেয়েপুরুষের মনস্তত্ব নিয়ে চর্চা চলে ভাই অনিল, সুস্থ মানুষ দেখতে পেয়ে আর তাদের সঙ্গে দুদণ্ড বসে গল্পগুজব করতে পেয়ে আজ একটু বেশ নিজেকে হাল্‌কা মনে হচ্ছে। সব সময় এই সব করুণ জীবনের ইতিহাস ঘেঁটে ঘেঁটে প্রাণটা প্রায় শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে।

দীপকের কথাগুলো অনিলের মনে বিশেষভাবে দাগ কেটে গেল যেন। চঞ্চল চুপ করে বসে শুনছে। অনিল বললে—আমার মনে হয় ভাই দীপক, তোর স্ত্রী পূরবীর সঙ্গে একবার দেখা করা যাক। চামেলীও কথা বলুক। সমবয়স্ক মেয়ের সমব্যথী মনোভাব নিয়ে চামেলী পূরবীর মধ্যে সখ্যতায় যদি কিছু সুফল পাওয়া যায়…

অনিলের এই রকম সহানুভূতি ভরা আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় দীপক বেশ অভিভূত হয়ে পড়ে। সে আশ্চর্যও হয় এতটা কি করে অনিল বলছে ?

দীপক জিজ্ঞাসা করলে—আমি তো পূরবীর কথা তেমন কিছু তোকে বলি নি, তুই কি করে জানলি ?

চঞ্চল তখন বললে—ভাই দীপক আমি অনিলকে আর চামেলী-বৌদিকে সেদিন তোর কাছ থেকে যা যা শুনেছি সবই এর মধ্যে একদিন গিয়ে বলে আসি। কোনো অন্যায় করি নি তো ?

—না না, অন্যায় কেন চঞ্চল। আমার বন্ধু তুই আর অনিল, তোদের সঙ্গে আমার জীবনের এমন মর্মপীড়াদায়ক ঘটনার পরিচয় হওয়ায়, আমিই অন্যায় বোধ করছি। তোদের মনটা টনটন করছে যে ব্যথায় তা আমি অনুভব করছি ভাই, আমার সমব্যথী তোরা হচ্ছিস এটা কি কম ভাগ্যের কথা। এই তো এতদিন কোনো সুস্থ কথা বলার জন ছিল না। আমার ভালো লাগতো না আর এই আধাবিকৃত-মস্তিষ্কের মেয়েপুরুষ নিয়ে মন-জানাজানির মধ্যে দিয়ে সময় কাটাতে। তোরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস ভাই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই রাখবো ? তার জন্যে তোর কোনো চিন্তা নেই দীপক। চামেলীও তোদের বিষয়ে বিশেষ বিচলিত হয়ে ভাবছে।

অনিল কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল বললে—আচ্ছা, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। কাল তো রবিবার আছে একবার মানসিক হাসপাতালে গিয়ে পূববী-বৌদির এখন ঠিক কি অবস্থাটা তা দেখতে গেলে কেমন হয়।

—চামেলী তো নতুন মুখ, সে আর আমরা তিন জনে। তা বেশ। বলে উঠল অনিল।

—ওরে বাসরে, যত শালা ডাক্তার গুলো। না না ভাই কিছু মনে করিস না, বেফাঁস কথা একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে বলে। আমার ওপর যে তার সব থেকে রাগ কাজেই আর কিছু দিন না গেলে আমার দেখা করা ঠিক নয়। দীপক বেশ ক্ষোভের সঙ্গে বললে।

অনিল বললে—সে আমরা দেখবো তাদের মধ্যে সব কথা বলে। তুই কিছু ভাবিস নি।

চঞ্চল বললে—এর মধ্যে পূরবী-বৌদির কোনো খবর দিয়েছে?

—হ্যাঁ, তা দিয়েছে, সামান্য শরীর খারাপ চলছিল। ভালোর দিকে যাচ্ছে বলেই আজ ফোনে খবর নিয়েছি। ধীরে ধীরে বললে দীপক।

অনিল দৃঢ়তা নিয়ে বলে উঠলো—তা হলে ভাই আমাদের কালই দেখতে যাওয়া ঠিক হোক। আর শুভ মন নিয়ে কাজ শীঘ্রই করা ভালো। শুভস্য শীঘ্রম্।

—ঠিক আছে তাই হবে।

—কাল কখন তা হলে যাওয়া হবে?

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলে দীপকের দিকে চেয়ে।

দীপক বললে—সকাল আটটায় আমি তোদের তুলতে যাব গাড়ি নিয়ে। চামেলী-বৌদির তখন অসুবিধে হবে না তো?

—আরে অসুবিধে কি? কাজের কাজ আগে। এখানে ব্যক্তিগত সুবিধে অসুবিধের প্রশ্নই নেই। কোনো কিন্তু বোধ মনে আসার কথাই নয় দীপক। ভাই, চামেলী ঠিকই গুছিয়ে নেবে।

অনিলের কথায় দীপক পরম আশ্বাস পায়। আগুন জ্বলছিল তার বুকের ভেতরটায়। যে পূরবীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করলে সেই গৃহিণীই আজ বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে মানসিক হাসপাতালে দিন কাটাচ্ছে—ওঃ, কি অসহ্য বোধ হয় দীপকের। চঞ্চলকে পেয়ে সেদিন থেকে তার তবু একটা আশার আলো যেন নিঃসঙ্গ জীবনটায় দেখতে পেয়েছিল। আর আজ অনিল ও চামেলী সহ চঞ্চলদের সঙ্গে বাড়িতে প্রাণ খুলে কথা বলতে পেয়ে তৃপ্তি বোধ করছে দীপক। সে বললে—দেখ ভাই, আমরা প্রায় বাঁদরের পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। সমাজ সংসারে পুরুষকে পুরুষ মানছে না। একজন মেয়ে আর একজন মেয়েকে গ্রাহ্য করে না। আমি দেখছি আমাদের মধ্যে সহ্যশক্তি বলে যে জিনিসটা ছিল তা ক্রমেই শেষ হয়ে গেছে।

—তার আর দোষ কি বল দীপক। অনিল বলতে থাকে—এই দেখ না, আগের দিনে দশটাকার নোট একটা পকেটে নিয়ে বের হলে মনে হত প্রচুর নিয়ে পথ হাঁটছি আর আজ একশত টাকা থাকলে মনে হয় এ তে কতটুকু কি কেনা যাবে! ক্রমেই বাজার দর বাড়ছে আর অর্থেরও মূল্যমান কমছে—ফলে এমন একটা অর্থনৈতিক চাপে মানুষ নাভিশ্বাস তুলছে যে তাদের

পরিত্রাণের পথ সন্ধান করতে পারছে না অথচ ছুটতে হচ্ছে রুজিরোজগারের জন্যে হন্যে হয়ে।

—আর একটা দিকও ভাববার আছে। চঞ্চল বলে উঠলো। এখন বিজ্ঞান আমাদের সামনে এত ভোগ্য বস্তু তুলে ধরেছে যে আমরা সেইসব আধুনিক উপকরণের অধিকারী হবার জন্যে লালায়িতও হয়ে উঠেছি। আরো রোজগার করতে চাইছি যেনতেনপ্রকারেণ। আমাদের সততাবোধ চলে গেছে। গুলিমারো সততাকে—বলেই অন্ধকার পথে চারটি নগদ অর্থ পকেটে পুরছি। এই তো সমাজজীবীদের কাজ।

দীপক চুপ থাকতে থাকতে বলে ওঠে—সমাজে বেকার আর অল্প আয়ের লোকদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্য প্রায়ই হারিয়ে যায় দেখা যাচ্ছে। আগে এই মনস্তত্ত্ব চিকিৎসার জন্যে যাঁরা আসতেন তাঁরা সমাজের খুবই বিত্তবান সম্প্রদায়ের ছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনের গড়মিল বা বৈষয়িক বঞ্চনা থেকেই আধাবিকৃতির উৎপত্তি দেখা যেত। এখন প্রচুর বেকার ছেলেমেয়ে আসে। আবার খুব স্বল্প আয়ের ঘর থেকেও মেয়েপুরুষ আসে। কি যে হবে? ভাবা যায় না।

—আজকের এই অর্থনৈতিক চাপটায় সমাজ দেহের মেরুদণ্ডটা ভেঙ্গে দিয়েছে। সোজা হয়ে ⁺ ীতে পারছে না যেন। কুঁজো হয়ে গিয়েছে।

অনিলের কথার মাঝেই চঞ্চল বলে ওঠে—আর একটা জিনিস ভুললে চলবে না। আমার কাপড় যতটা আছে আমি যদি কোটটি আমার সেই পরিমাণে করি তা হলে আমার অভাব হয় না। কিন্তু আমি দুবেলা দুমুঠো খেয়ে সাধাসিধে জামাকাপড় পড়ে বেশ দিন চালিয়ে নিতে পারি। কিন্তু আমরা রেডিয়ো থেকে রেডিয়োগ্রামে, সিলিং ফ্যান থেকে এয়ারকণ্ডিসন ঘরে, জালের আলমারি থেকে ফ্রিজের মধ্যে গি[illegible] পৌঁছাতে চাই। নাল্পে সুখমস্তি। আরো চাই আরো চাই। পাগল হয়ে ছুটছি অর্থ রোজগার করতে আর বিজ্ঞানের দান অর্থব্যয়ে গ্রহণ করতে।

—কলকাতায় এখন যা ইলেকট্রিকের লোড শেডিং শুরু হয়েছে তাতে আর বৈজ্ঞানিক অবদান টবদান নিয়ে জীবন অসহ্য করে তুলেছে। ফ্রিজে মাছ মাংস ডিম দুধ সব রাখো কিন্তু বিদ্যুৎ সংকটের সময় তো মেশিন বন্ধ থাকে, মনে না থাকলেই অনেক পরে ফ্রিজের ডালা খোলো, দেখবে কি ভীষণ পচা গন্ধ, সব শেষ।

—কিন্তু সে আর কজন দেখে, এখন ঘর সাজাবার আবশ্যকীয় আসবাব হিসেবে শোভা পায় ঘরে ঘরে। অনিল বললে সকৌতুকে।

চঞ্চল বলতে লাগলো—কি দারুণ একটা অর্থনৈতিক সমস্যা যে আসছে তা আর কি বলবো। গ্রাম বাংলার সামান্য খবর আজ বাবার চিঠিতে পেয়ে মনটা খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে। কি যে হবে?

দীপক বলে ফেললে—ও তাতো শুনি নি। ইস, সে কি কাণ্ড। শালারা রাজনীতির খেলাখেলে আমাদের দেশের বারোটা বাজালে। আমরা ধিনি কেষ্ট হয়ে শুধু নাচতে জানি। কোনো গভীর চিন্তা নেই, চেতনা তো নেইই, চঞ্চলের তো তা হলে একটা বেশ জটিল সমস্যা অনিল।

—হ্যাঁ, ভাই সেই তো। আমিও শুনে পর্যন্ত বড়ই মুষড়ে পড়েছি।

দীপক কি যেন বলতে যাচ্ছিল এই সব কথারই সুরে, এমন সময় একটা ট্রে করে তিন প্লেট খাবার নিয়ে ঢুকলো দীপকের চাকরটি।—মা পাঠিয়ে দিয়েছেন, আয় ভাই অনিল, চঞ্চল।

দীপক জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, মাইজীর কাছে এক বৌমা রয়েছেন, তিনি খেতে বসেছেন তো?

দীপকের চাকরটি বললে—হা, তিনি তো খেতে বসেছেন।

দীপক নিশ্চিন্ত মনে অনিল আর চঞ্চলকে নিয়ে জলযোগ শেষ করলে। চা পর্ব চলছে। কথাও চলছে। রাজনীতির মুণ্ডুপাত বলা চলে।

অনেকটা সময় এইভাবেই কাটছে, ভেতর থেকে খবর এলো—বৌমাজীর খানা হো গিয়া, মাজী খবর ভেজা উনি চলতে চাচ্ছেন।

অনিল বলে উঠলো—বৌমাজীকে ডেকে দাও।

দীপকও সে কথার প্রতিধ্বনি করে বললে—হা ডেকে দাও।

চামেলী আসতেই দীপক বললে—খুব কষ্ট হল তো?

—না না, এ আবার কষ্ট কি? কত কি খাওয়ালেন মা আপনার।

—এটাতে কষ্ট যদি না হয়ে থাকে তবে কালকে সকালে আর একটু যে কষ্টই করতে হবে।

—কি রকম? চামেলী কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে।

দীপক কিছু বলার আগেই চঞ্চল বলে ফেললে—কাল আমরা চারজনে একবার হাসপাতালে পূরবী-বৌদিকে দেখতে যাব।

—ওহো, এ যে আমারই মনের কথা একেবারে।

দীপক এ কথা শুনে আরো আশ্বস্ত হয়।

—ঠিক আছে তাই হবে। আটটার মধ্যে আসবি। কেমন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দীপক জবাব দেয়।

বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তিনজনকে বিদায় জানায় দীপক।

তখন সন্ধ্যের আকাশ ভরা তারারা জ্বলজ্বল করছে।

আশা আর যেন আশ্বাস নিয়ে নক্ষত্রমণ্ডল দূরে সুদূরে—তবু তাদের চিক্‌মিকে আলোর চুম্‌কি চিকন চোখে ধরা দেয়।

অনিল পথে এসেই চামেলীকে বললে—দেখো, আমার সিনিয়ারের অর্থাৎ ওকালতির বড়বাবুর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল, আজ দুজনে বেরোনো হয়েছে সেই কর্তব্যটাও সেরে এলে হয় না?

চামেলী বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ভালোই হয়। আমি যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই রয়েছি।

চঞ্চল বললে—তা যা বৌদিকে নিয়ে। আমি আবার শ্রীনিবাস বাবুর কাছে তাড়াতাড়ি মেসে ফিরে আসবো বলে এসেছি।

অনিল বললে—আচ্ছা, তাই যা, কাল সকালে আসিস ঠিক সময়।

মনে মনে হাসলো সে। কারণ ওখানেই যে একটা বিয়ের কথা বলা ছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দীপক আমাকে নিয়ে যাবে তোদের কাছে।

—আচ্ছা তাই হবে। আমি ঠিক তৈরি থাকবো।

চামেলী এর উত্তরে বললে চঞ্চলকে।

চঞ্চল চলে যেতে, পথের থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে অনিল আর চামেলী চললো হাজরা রোডের দিকে।

সেখানেই তার স্বর্গত জ্যেষ্ঠ আইন ব্যবসায়ীর বাড়ি।

ট্যাক্সির মিটার দেখে ড্রাইভার গাড়ির মধ্যে টাঙানো একটা রেশনকার্ড রাখার প্লাষ্টিকের খামের ভেতর রাখা ভাড়ার টাকায় ৮০ পয়সা হারে বৃদ্ধির তালিকা দেখালে। ভাড়া সেই মতো দিয়ে সস্ত্রীক অনিল সেই বাড়িতে সদর দরজায় হাজির হল। বাইরে থেকেই শুনতে পেলে ঘরের মধ্যে ভদ্রমহিলা অন্য কার কার সঙ্গে কথা বলছেন। কলিং বেল টিপতেই একজন বেয়ারা এলো। সে অনিলকে চিনতো।

বললে—আসুন বাবু। মা তো বসার ঘরেই আছেন।

অনিল সস্ত্রীক ঘরে যেতেই উষা দেবী বললেন—এই যে এসো অনিল এসো, কতদিন আসো নি। ওমা, বৌমাকেও এনেছো, বেশ বেশ।

চামেলী এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করলে। উষা দেবী আলাপ করিয়ে দিলেন ঘরের টেবিলের ওপাশে রাখা চেয়ারে যে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বসেছিল তাদের সঙ্গে।

বললেন—অনিল তুমি তো মনীষকে চেনো না। ওর নাম মনীষ মৈত্র আর এ ইন্দু, ওর স্ত্রী, বুঝতেই পারছো। আর ওদের পরিচয় হচ্ছে মনীষ আমার বর্তমানে একমাত্র ভাইয়ের স্ত্রীর একমাত্র ভাই ও ভাইয়ের বৌ। অনিলের পরিচয় মনীষকে বলি এবার—অনিল সেন ও চামেলী সেন বুঝতেই পারছো ওরা স্বামী-স্ত্রী। অনিল হচ্ছে মিঃ ব্যানার্জির আইন ব্যবসায়ের স্নেহধন্য অনুজ প্রায়।

অনিল আর মনীষ, ইন্দু আর চামেলী এবং চারজনেই তারা পরস্পরে নমস্কার বিনিময় করলে। উষা দেবী বেশ একটা ভারিক্কী ভঙ্গিমায় স্বর্গত স্বামীর চেয়ারে বসে এই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন।

এর মধ্যেই তাঁর মেয়ে এসে গেল। সেও সবাইকে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বসলো দেওয়াল ধারে রাখা একটা চেয়ারে।

উষা দেবী হঠাৎ অনিলের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—কি গো, চা না কফি? মনীষ তোমাদের?

অনিল খুব কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিয়ে বললে—না না, এখন আর কিছু নয়।

মনীষের দিকে উষা দেবী প্রশ্নভরা চোখ তুলে চাইতে সেও বললে—আজ থাক, আর একদিন হবে।

উষা দেবী আর কোনো কথা সে প্রসঙ্গে তুললেনই না।

তখন মেয়ের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—বীথিকে অনিল তো খুবই দেখেছ, মনীষ তুমিও আজ দেখছো, ওর একটা সৎপাত্র পেলে তবেই না বেশ শান্তি পাই। এই একবছরটা তাও কোনো রকমে দু-চোখে রুমাল দিয়ে কাটানো গেল। এবার বীথির দিকে চাইতেই হয়।

এই প্রসঙ্গ উঠতেই বীথি ধীরে ধীরে উষা দেবীর পিছন দিকের বাড়ির ভেতর পানে যাবার দরজা দিয়ে চলে গেল। নিজের বিয়ের কথা সে বসে বসে শুনতে সংকোচ বোধ করলে। এটা অনিল বা মনীষ, চামেলী বা ইন্দু সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পিতৃহারা সন্তান বীথি যেন সুশ্রীরই পর্যায়ে পড়ে। মায়ের আদর পায় ঠিকই তবে বাঁদর হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে

বলেই অনিল শুনেছে দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ বীথির বাবার মুখেই। বীথির নীরব ভাবটা বেশ ভালোই মনে হয় তাদের।

উষা দেবী মেয়ের গুণপনা বর্ণনা করতে আরম্ভ করছিলেন—মেয়েকে তো দর্শনে অনার্স নিয়ে বি এ পাস করানো হয়েছে তার ওপর রবীন্দ্রসংগীত শিখেছে বেশ আবার সেলাই বোনা সব জানা আছে। কি ঠাণ্ডা মেয়ে যে···

অনিল তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বলে বসে—হ্যাঁ, তাতো আমি সবই জানি। বড় ভালো মেয়ে।

—আমি মনীষকে বল্‌ছি অনিল। তুমি তো জানো ওকে দেখেছো। মনীষ আজ প্রথম এলো। ওর বাবা মার সঙ্গে আলাপ আছে ওকেও দেখেছি তবে এমনি বসে কথা বলার মতো সুযোগ আসে নি।

ইন্দু দেখলে একবার মনীষের দিকে চেয়ে। মনীষ অন্যদিকে মুখ ফেরালে। অনিল সেটা লক্ষ্য করে মুখ টিপে হাসি চাপতে গিয়ে দেখলে চামেলীরও ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছে চাপা হাসি।

উষা দেবী বলতে থাকলেন—আজ কর্তা নেই, কে দেখবে বল? এ সব আমাকেই দেখতে হবে। আমাকেই তাঁর হয়ে তদারক করতে হবে। এ আমার কি হতভাগ্য অবস্থা। কোথায় আমি তাঁকে রেখে চলে যাব, না তিনিই চলে গেলেন আমায় ছেড়ে মেয়ের বিয়েটা দেখে শুনে ঠিক করে দাও তো তোমরা। কত চেনা জানা তাঁর ছিল কিন্তু আমার সঙ্গে তো কারো যোগাযোগ তেমন নেই, আমি আগে করি নি।

মনীষ বললে—বাবা চিঠিতে লিখেছেন কাগজে পাত্র চাই কলমে দরকার মনে করেন তো একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা দাও। অনিল তোমার কি মনে হয়?

উষা দেবীর প্রশ্নের উত্তর অনিল তাড়াতাড়িই দিলে—সে তো খুবই ভালো কথা।

—কত লাগবে মনীষ?

—সে যা লাগে আমি বলবো আপনাকে।

—হ্যা হ্যাঁ, তা বলবে অবশ্যই।

এমন সময় মেয়ে ঘরে এলো আবার। উষা দেবী বললেন—বস্ বীথি।

—না মা, আমি বলছিলুম কি, একটু চা বা কফি হোক না এখন, অনেকক্ষণ সব এসেছেন।

—সে তো ঠিক মা। এঁদের আসতেই বললুম কিন্তু কেউ আর তাতে রাজি হয় না।

উষা দেবীর কথায় আবার অনিল বলে উঠলো—এখন ওসব নয়। এইবার আমরা উঠছি। আর একদিন আসবো। মনীষবাবু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ লাগলো।

ইন্দু চেয়েছিল ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে চামেলীর দিকে ; চামেলীও একবার চেয়ে দেখলে ইন্দুর দিকে। তার পর বললে—আবার দেখা হবে, নমস্কার।

চামেলীকে প্রতিনমস্কার জানায় ইন্দু।

—এবার দেখা হলে ভালো করে আলাপ হবে। বললে ইন্দু।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

তার পর চামেলী উষা দেবীকে প্রণাম করতে গেল।

উষা দেবী বলে উঠলেন—দেখ বীথি ওরা উঠেই পরলো। কেন অনিল, এত তাড়া কিসের ?

—অনেকক্ষণ বেরিয়েছি যে। দীপকের বাড়ি হয়ে আসছি তো।

—দীপক কে ? উষা দেবী জিজ্ঞেস করলেন।

—আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু। এখন সে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী। কলকাতায় অভিজাত মুখোপাধ্যায় পরিবারের একমাত্র বংশধর।

দীপক ! শুধু এইটুকু উচ্চারণ করেই উষা দেবী তার পরই চুপ করেন। দীপক নামটা উষা দেবীর মনে ধরে গেল। মনীষও শুনলে তার পরিচয়।

—দিলীপ আমার, দিলীপ কি ফিরবে না ? একমাত্র ছেলে আর এই একমাত্র মেয়ে নিয়ে সংসার ছিল তাঁর। তিনিও চলে গেলেন ছেলের শোকে। আমি বসে আছি এই ফাঁকা বাড়িতে আজও যদি দিলীপ, আমার দিলীপ ফিরে আসে।

উষা দেবী দারুণ আবেগ নিয়ে বলে ওঠেন।

সমস্ত অন্তর যেন কথা বলে উঠেছে।

—হ্যাঁ, সে ফিরে আসবে। আমার মন যে বলছে।

আবার চুপ করে থাকেন উষা দেবী।

—কিছু মনে করবেন না মনীষবাবু, আজ যাই পরে একদিন বেশ ভালো ভাবে আলাপ-পরিচয় হবে, নমস্কার।

—নমস্কার। প্রতিদানে জোড় হাতে মনীষ সৌজন্য প্রকাশ করে।

উষা দেবী একবার মনীষের দিকে আর একবার অনিলের দিকে তাকান।

চামেলী অনিলের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ইন্দুর দিকে চেয়ে আর উষা দেবীর দিকে চেয়ে বলে—চলি আজকে দিদি।

তার পর হাসি মুখে দুজনে পথের দিকে এগিয়ে যায়।

অনিলকে বলে—কাল ভোরেই তৈরি হতে হবে। এদিকে উষা দেবী ছেলের জন্যে কেমন হয়ে গেছেন যেন। আর ওদিকে কি কাণ্ড বলতো? এতদিন পুরবীদি পাগল হয়ে রয়েছে। দীপকবাবুর মা অনেক দুঃখ করলেন।

অনিল বলে—তা তো করবারই কথা গো।

—আমরাও উঠি এইবার দিদি। ঘরের মধ্যে মনীষ বললে।

—উঠবে। উষা দেবী বেশ বিমর্ষ ভাবেই বললেন মনীষকে।

ইন্দু বললে—বাড়িতে দিদিমণি একমাত্র ছেলে রয়েছে তাও আজ বেরোবার সময় ওঁর মাষ্টার মশাই রসময় বাবু হঠাৎ এসে গিয়েছিলেন, বললুম মণির সঙ্গে কথা বলুন, আমরা এখনই আসছি।

—ও, তা হলে তো আর তোমাদেব আটকানো যায় না। এবার ছেলেকে নিয়ে এসো। তবে বীথির বিয়ের জন্যে কাগজে যে পাত্রী চাই কলমে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছেন তোমার বাবা, তাই দাও।

—আচ্ছা, আমি একটা লি..খ দেবো। আসি আজকে—নমস্কার।

—থাক থাক। ইন্দু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে উষা দেবী বললেন—সুখী হও ভাই, কি সুন্দর স্বামী পেয়েছ।

মনীষের দিকে চেয়ে শেষ কথাগুলো বললেন উষা দেবী। তার পর একটু ভেবে বললেন—দীপক বলে যে মনোস্তাত্ত্বিকের কথা অনিল বললে সে বিয়ে করেছে কি না বা না করে থাকলে এবার করবে কি না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতো জিজ্ঞাসা করা হয় নি

—এখন একটু হুঁস করা দরকার আমার অথচ মনটা এমন হয়েছে কিছুতেই কিছু ঠিক পাই না।

—মনে জোড় করতে হবে যে আপনাকে বীথির মুখ চেয়ে অন্ততঃ।

—তোমরা আজ প্রথম এলে, এই দেখো কিছু মিষ্টি মুখ করে তবে যেতে পাবে। কোনো ছাড়ান নেই।

—সে সব হবে একদিন।

—না না আজই। বীথি ফ্রীজ থেকে মিষ্টি অন্ততঃ নিয়ে আয় মা।

অগত্যা একটা মিষ্টির বাক্স নিয়ে এলো—তার থেকে দুজনে দুটি সন্দেশ তুলে মুখে দিলে।

উষা দেবী সতৃপ্ত নয়নে তাকিয়ে থাকেন মনীষ-ইন্দুর চলে যাওয়ার দিকে।

ভর সন্ধ্যায় আজ একটা সংযোগই যেন একটা সংহতি খুঁজছে!

দীপ্তেন্দুর চিঠি পেয়েছে শর্মিলা। সে রবিবারই আসবে যদি ট্রেনের টিকিট পায়, না হলে সোমবার।

সুশোভনও খবর পেয়েছে। মৃণালকুমার যাদুবিদ্যা দেখাবে কাল রবিবার বিকেলে। তার উৎসাহের অন্ত নেই। মাকে সব বলেছে সে, তার প্রিয় শিক্ষক সুবর্ণ বাবুও আসবেন।

মা বললেন—বেশ বেশ, তা আসুন না। ভালোই তো।

—দিদি দিদি। সুশোভন তাড়াহুড়ো করে শর্মিলার ঘরে যায়।

—কি বলছিস। শর্মিলার মনটা মেজাজটা যেন খুশিতেই আজ রয়েছে। শনিবার আজ। দুপুরে ফিরেছে শর্মিলা। ঘরদোর বেশ করে সাফ্ করেছে। বিছানা টেবিল চৌকি সব মুছে দিয়েছে। পুরোনো ফ্যাকাশে সিমেণ্টের মেজে তবু তার ওপর জলনেতার প্রলেপ দিয়ে একটু সাফ করার চেষ্টায় ছিল শর্মিলা। সুশোভনের ডাকে চম্‌কে গিয়ে ভাবে, একি করছে সে?

—দিদি কালকেই মৃণালকুমারকে রাজি করিয়েছি, বিকেলে ম্যাজিক দেখাবে। আমাদের কোচিং ক্লাসের স্যার সুবর্ণ বাবুকেও আসতে বলেছি। আমার বন্ধু দুএকজন তো আসবেই।

—বারে তুই সব ঠিক করে বসেছিস। এখন কোথায় হবে রে?

—কেন এই উঠোনের ধারে। আমরা এই ঘরে বসবো।

—আর মৃণাল?

—ঐ চাতালটার ওপর। বেশ দূর থেকে দেখায় যে ম্যাজিক। কাছে তো নয়।

—তাই বুঝি? ঠিক আছে তাই হবে।

—একটু চা বিস্কুট খাওয়াবে তো দিদি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর তোকে বলতে হবে না।

দিদির কাছে এমন কথা শুনে খুব আনন্দ হয় সুশোভনের। সে বলে—দীপ্তেন্দুদা যদি কালই আসেন তবেই এই সব আয়োজন পুরোপুরি হয়।

—তুই জানলি কি করে?

—কেন? তুমি মাকে সকালে চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলে যে?

—ঠিক ঠিক। তোর কাণ সব দিকে আছে দেখছি।

—আমি সুবর্ণবাবুকে বলেছি আমার দিদির সঙ্গে একটু আলাপ করবেন। দেখবেন কি ভালো দিদি আমার।

শর্মিলা নকল রাগের ভঙ্গিতে বলে—খুব দুষ্টু হয়েছিস তো, চেনা নেই জানা নেই এমন লোকের কাছে বলে বসলি—দিদি আমার কি ভালো। কি ভালো দেখলি রে? শর্মিলা সুর টেনে কথাগুলো বললে।

—তিনি আমার চেনা স্যার। আমি বলেছি, তাতে কি হয়েছে দিদি। তুমি তো সত্যিই ভালো। মাইরি দিদি তোমাকে আর মনের কষ্টে থাকা দেখতে পারি না।

—থাম তুই। পাকামো খালি। শর্মিলা নেতা বালতি হাতে ঘর মোছা শেষ করে উঠোনে চলে যায়। ঘর-মোছা ময়লা জল নদমার জালির ওপর গড়িয়ে ঢেলে দেয়। একগাদা ময়লা জমা গাদ যেন বেরিয়ে গেল তরল হয়ে।

হাল্‌কা লাগছে শর্মিলার মনটা। দীপেন্দুর আসার খবর পেয়েছে। আসছে—হয় কাল, নয় পরশু। আশায় আশায় কত দিন যে তার কেটেছে। এবার একটা যেন উদভ্রান্তির জীবনে হবে উত্তরণ। একটা সোনালি স্বপ্ন নিয়ে মন কর্মচঞ্চল শর্মিলার।

মায়ের কাছে যায় রান্নার ঘরে।

শর্মিলা বলে—মা তোমার ছেলের কাণ্ড শুনেছ।

—হ্যাঁ, রে। মা যেন মেয়ের খুশি ভরা গলায় কথা বলতে শুনলেন বেশ অনেকদিন পর। তিনি খুশি হয়ে জবাব দিলেন।

—ছেলে তোমার মাষ্টারমশাইকেও আসতে বলেছে গো। একটু চা বিস্কুট তো রাখবে ঠিক করে, তাই না?

—বেশ তো তাই হবে। আর নয় তো নিম্‌কি ভেজেও রাখতে পারি। চা-নিম্‌কি খারাপ হবে কি?

—ওহো। তা হলে তো মা, ছেলে তোমার নাচতে থাকবে। তাই করলে বেশ হয়।

—কি আর এমন কষ্ট। কজনই বা আসবে। ও ঠিক করে দেবো আমি। কতটুকু আর ময়দা লাগবে? ওটুকুর সাশ্রয় সংসারে থাকেই।

—আমিও থাকবো তোমার কাজে। কাল তো রবিবার। কিছু ভেবো না, মা। দুজনে সব ঠিক করে দেওয়া যাবে।

সুশোভন পড়ার টেবিল ছেড়ে কোন সময় মা আর দিদির কথা শুনতে লেগেছে, তা কেউ টের পায় নি। খুশিতে তার চোখ মুখ উৎফুল্ল। তার মনেও একটা আশ্চর্য আনন্দ যা তাকে রোমাঞ্চিত করছে। কারণ সে মা আর দিদির তার কাজটুকু উৎড়িয়ে দেওয়ার যৌথ মনের পরিচয় পেয়েছে। সুবর্ণ বাবুকে প্রথম আসতে বলেছে, বন্ধুরা দুএকজন আসবে। খুব সুন্দর হবে ম্যাজিক দেখে চা-নিমকি খাওয়া।

শর্মিলা বেশ উৎসাহ নিয়েই কথা বলছে মায়ের সঙ্গে। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে সুশোভন দাঁড়িয়ে। খুশির হাসিতে তার উজ্জ্বল সরল মুখ।

—আরে তুই কখন চুপি চুপি এখানে এসেগেছিস। পড়াশোনা কর, সে কালকের সব ঠিক আছে রে ঠিক আছে! শর্মিলার কথায় যেন মধু ঝরে।

মা বলে ফেললেন—ভাই বোন মিলে যখন লেগেছিস তখন আর কথায় কাজ কি?

—ও হো। সেটি নয় গো, তুমিই সব করবে। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। তোমার ছেলেটি যা হয় ব্যবস্থা করে করুক।

—দিদির ও সব কথা বলে পেছন হটলে তো আজ আর হবে না। আমার বন্ধুদের, সুবর্ণ বাবুকে বলা হয়ে গিয়েছে।

সুশোভন বেশ যেন একটু বিব্রত অথচ মনে মনে দিদির প্রতি আস্থাও আছে এমন ভাব নিয়ে কথাগুলো বললো।

—শর্মিলার সব কিছু দেখতে হবে। ও ছোট, ছেলেমানুষ।

—আহা, কেমন বড় হয়ে উঠছে দেখছো না তুমি। এখনও ওকে ছেলে মানুষ করে আর রেখো না।

—তা তুই যা বলিস। ও বয়সে তোকে তো অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়েছে। বাপ চলে গেলেন।

মায়ের আবার করুণ স্মৃতি মনে আসছে। শর্মিলা তার বাবাকে তো শৈশবে হারায়। সে কথার স্মরণে মায়ের মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে দেখে শর্মিলা বললে—আচ্ছা মা, বাবার জন্ম মাসতো এই ভাদ্রই, তাই না?

—হ্যাঁ মা, শর্মিলা! মায়ের গলার স্বর বেশ ভারী হয়ে এসেছে। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের সময় তা বেশ বোঝা গেল।

শর্মিলা বললে—সুশোভন, একটা কাজ করিস ভাই, ও ঘরে যে বাবার ছবিটা আছে তাতে একটা মালা দিয়ে দিবি কাল।

—বেশ দিদি, আমি সকালেই মালা নিয়ে আসবো। বাবা আমায় চকলেট কিনে দিতেন বেশ মনে আছে।

—বা রে, তোর মনে আছে দেখছি? শর্মিলা সহজভাবে বলে।

—হ্যাঁ, তা থাকবে বই কি। মা কথা যোগান।

—মা একেবারে সব সময় ছেলের হয়ে কথা বলতে ঠিক আছো। আমি তোমার ছেলেকে খাটো করছি, না উল্টে বড় ছেলে, বড় হচ্ছে তাই তো মনে করিয়ে দিয়েছি।

—আমি আর এমন কি কথা বলেছি শর্মিলা। আমার কথা ধরছিস কেন? আমি তো কোনো···

মায়ের কথা আর শেষ হয় না, তিনি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্নায় রুদ্ধবাক হয়ে যান।

তাঁর হঠাৎ কান্নাটার কারণ সুশোভন ঠিক বুঝতে পারে কিনা বোঝা যায় না। সে হতভম্ব প্রায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শর্মিলা বুঝতে পারে যে মায়ের স্মৃতিতে বাবার ছবি ফুটে উঠেছে। স্বামীর কথা ছেলেমেয়ের মাঝখানে আজ এই বৈধব্যের করুণ জীবনের দিন ভেবে বেদনার সঞ্চার করেছে। সামান্য প্রকাশপথ খুঁজছিল। সেই পথের সন্ধানে থাকতে থাকতে তুচ্ছ কথা ধরার সূত্র নিয়ে ফাঁপিয়ে উঠলো। তাই বললেন একবার কান্নার মধ্যেই—আজ তিনি বেঁচে থাকলে কত খুশিই হতেন। আমার ভাগ্য ছাড়া আর কি?

শর্মিলার মনটা বেশ দীপ্তেন্দুর আসন্ন আগমনের প্রতীক্ষায় আনন্দময়ী হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে মায়ের কান্নার করুণ দৃশ্য কেমন যেন বেমানান লাগে।

—কি আর করবে বল? আমাদেরও ভাগ্য মা।

শর্মিলা সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যায় মায়ের পাশে।

—তুই বিয়ে-থা করে কোথায় নিজের সংসার করবি, তা নয়, তোকে আমাদের দায় মাথায় নিয়ে থাকতে হল। মেয়েকে আমি পেটে ধরে জন্ম দিয়েছি কিন্তু আর কিছু করার ক্ষমতা দেন নি ভগবান। আমার কপাল···

মায়ের কান্নার স্বরের মধ্যে থেকে বলা কথা শেষ করার আগেই শর্মিলা তখন বলে ওঠে—ও কথা কেন বলছো মা, ওসব ভেবো না। আমি তোমার মুখে দুর্বলের মতো কথা বলতে শুনবো ভাবি নি মা। তুমি বুক বেঁধে

নিয়েছো। ঝড় এসে সংসারটা তছনছ করে দিল। কিন্তু তুমিই আমাকে দৃঢ়তা নিয়ে চলতে শেখালে। তাই বলছি। কেন তুমি···

—না মা, না, আমি তোদের এই আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ করে দিচ্ছি। ভারী অন্যায় হল। মনটা এখন প্রায়ই আমার হু হু করে। আজ বাধা ঠেলে দিয়ে মনের কষ্টটা বেরিয়ে এসেছে। তোদের এই আনন্দের মধ্যে তিনি নেই, অথচ আমি জানি তিনিই হতেন সব থেকে খুশি···

—তোমার কান্নায় যে তাঁর আত্মা যেখানেই থাকুক অখুশি হবে মা। তুমি আর কখনো এ ভাবে কেঁদো না মা। আমাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে···

—বুকটায় যে কান্না ঠাসা রয়েছে রে!

—তা থাক মা, তুমিই তো বলতে মামাকে, বুক বেঁধেছি শর্মিলা আর স্থশোভনের মুখের দিকে চেয়ে।

এতক্ষণে স্থশোভনও মায়ের প্রায় পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। সে কোনো কথা বলতে পারছিল না। মায়ের কান্নায় যেন তারও বুকে ব্যথা গুমড়ে উঠছিল। মা স্থশোভনের হাতটা শক্ত করে ধরলেন।

চঞ্চল গোস্বামীর ঘুম ভাঙ্‌লো দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে।

দরজা খুলতেই দেখে দীপক দাঁড়িয়ে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না। ঘুমের চোখ খুলে ভালো করে চেয়ে দেখে ঠিকই তো!

—কি খবর দীপক? কটায় তোর আসার কথা ছিল? ইস্, বেজায় দেরি করে ফেলেছি ভাই আজ ঘুম থেকে উঠতে। কিছু মনে করিস নি।

—আরে, না না, আমিই তো অনেক সকালে চলে এসেছি। আজ ভোর রাত্রিতে ফোন এলো ভোরেই যেন হাসপাতালে যাই। তাই তোদের নিতে এসেছি।

দীপক ধীরে ধীরে কথাগুলি বলতে লাগলো। তার কথায় যেন উত্তাপ নেই। খুব শান্তভাবে বললে।

চঞ্চল বললে—আমি এখনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

—নে তো ভাই তাড়াতাড়ি আজকের মতো। আমি গাড়িতে বসছি।

—আমি এখনি নিচ্ছি তৈরি হয়ে। একটুও দেরি হবে না।

দীপক গাড়িতে গিয়ে বসলো। চঞ্চল এলে যাবে অনিলের বাড়ি। মনটা

কেমন যেন উদাস হয়ে গিয়েছে দীপকের। এক বছরে তারা তো কখনও এ ভাবে ফোন করে বলে নি আসুন। তার শরীর খারাপেও নয়। আশ্চর্য!

অনিলের বাড়িতে গিয়ে ডাক দিতেই অনিল দরজা খুললে। সেও অবাক। চামেলীও এসেছে। সব শুনে তারাও বলে এখনই রওনা হবে দীপকের সঙ্গে। চা-পানের প্রস্তাব চামেলী করলে। দীপক বললে—আমার এখন ইচ্ছে করছে না, কিছু মনে করবেন না।

কথাটা আর কারো মনে সাড়া না জাগালেও চামেলীর মনে বেশ বাজলো। সে বললে—না না, থাক। চা খাওয়া রোজই তো হবে। এই আমি তৈরি হয়ে এলুম বলে। অনিলের দিকে ফিরে বললে—আর একটুও দেরি না করে এখনই চলো। এমনিতেই বেজায় রকম দেরি হয়েছে আর নয় গো। চলো।

চামেলীর কথায় সায় দেয় অনিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—চল দীপক আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি। বললে চঞ্চল।

দীপক আর চঞ্চল গাড়িতে অল্পক্ষণ বসে থাকতে থাকতেই এসে গেল অনিল ও চামেলী।

খুব দ্রুত গতিতে দীপকের গাড়ি ছুটে চললো। চামেলী একবার অনিলের দিকে একবার চঞ্চলের দিকে চেয়ে থাকে। কি দারুণ দ্রুত গাড়ি ছুটছে। ভোরের বেলা রাস্তা ফাঁকা তবু যেন অস্বাভাবিক গতির নেশায় দীপক ছুটিয়েছে তার গাড়ি। ছুটছে—ছুটছে—ছুটছে।

চামেলীর চুলটা উড়ো উড়ো হয়ে চোখে-মুখে ঝাপুর ঝুপুর করছে।

দীপক গাড়ির স্টিয়ারিংটা খুব শক্ত হাতে ধরেই গাড়ির স্পিড্ দিয়েছে প্রাণপণে বাড়িয়ে। হঠাৎ একটা ঝাকানি দিয়ে ব্রেক কষলে দীপক। সে গাড়িটা থেকে নেমে একটা ফটকের কাছে গিয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপলে বারকয়েক। পাশের ছোট জানলা দিয়ে একটা নেপালী দারোয়ান মুখ বাড়ালো।—আপ্‌কো নাম?

দীপক বললে—দীপককুমার মুখার্জি।

নাম শুনেই সে বললে—আইয়ে গাড়ি লেকে, ফটক খুলতে হ্যায়।

দীপক আবার নিজের গাড়িতে এসে বসলো। নেপালী দারোয়ানটা ফটক খুলে দাঁড়াতে দীপক গাড়ি নিয়ে মানসিক হাসপাতালের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলে। বাঁ দিকে গাড়ি রাখার জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালে।

তার পর চারজনে চললো গাড়ি থেকে নেমে অফিস ঘরের দিকে।

দীপককে জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন ডাঃ ঘোষ। প্রথম নমস্কার বিনিময়ের পালাটা নেহাৎ মামুলিভাবে হল। কোনো কথা প্রথমে ডাঃ ঘোষ বললেন না। সকলের মুখই যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

দীপক জিজ্ঞেসই করে ফেললে—পুরবী কেমন আছে ডাঃ ঘোষ?

—আসুন দীপকবাবু। বলছি সব।

ডাঃ ঘোষ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

—পুরবীর সঙ্গে দেখা করা যাবে না? ডাঃ ঘোষ···

দীপক ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে।

অনিল দীপককে বললে—চল ভাই, ডাঃ ঘোষ কি বলতে চাইছেন তাই আগে শুনি।

ডাঃ ঘোষের সঙ্গে চারজনে তাঁর অফিস ঘরে প্রবেশ করলে এবং পাঁচজনে চেয়ারে বসলে।

উৎসুক চোখ তুলে চারজনেই তাকিয়ে থাকে ডাঃ ঘোষের দিকে।

তখন ডাঃ ঘোষই নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—আমি কি যে বলবো দীপক বাবু, আপনি নিজে মনোবিজ্ঞানী, আপনি জানেন পুরবী দেবীর মানসিকতা এমন একটা স্তরে এসে গিয়েছিল যে তা ঘরে ফেরার মতো নয় কিন্তু খুব মর্মান্তিক। সব কাজ এখানে নিজে করতে চাইতেন এবং করতেনও। নিখুঁত কাজ। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা জিজ্ঞাসা করার ফলে দেখা গেল তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। অনেকবার তা দেখা গেছে। গতকাল বলা হয়—সে হবে না, একবার দীপকবাবুর সঙ্গে দেখা করুন। তিনি আপনার জন্যে বিশেষ চিন্তিত। দারুণ উত্তেজিতভাবে বললেন—আমাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলুন। সে তো প্রথম হয় নি আমি খতম হই। আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। তাঁর সহায়িকা বললে যে—না, পুরবী দিদিকে আর কিছু বলে কাজ নেই। তার পর কি যে লিখলে আর কুচি কুচি করে ফেললে, তা রক্ষা করা গেল না। পুরবী দেবীকেও না। চলুন ভিতরে।

—কি বলছেন, ডাঃ ঘোষ? দীপক প্রায় চিৎকার করে বললে।

অনিল দাঁড়িয়ে উঠে দীপকের পিঠে হাত রাখে।

বলে—চল ভাই, দেখে আসি।

ডাঃ ঘোষ বললেন—যে আলমারিতে ঘুমের ওষুধ থাকে তার সন্ধান এই এক বছরে কিভাবে নিয়ে নেয় এবং কাল আলমারির তলার দিকের পাল্লাটার

কাঁচ খুব আস্তে আস্তে ভেঙে ফেলে। এক শিশিটার প্রায় অর্ধেক খেয়েছেন। হুঃ কিছু করা গেল না। এমনিতেই বুকটা দুর্বল ছিল, মাঝরাতে সব শেষ।

ডাঃ ঘোষ আর কথা বলতে পারলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনিল হাত ধরে রইল দীপকের। সে কোনো কথা বলছে না, পাথর যেন। চঞ্চল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল আবার বসে পড়লো।

চামেলীই তখন বললে—ডাক্তার বাবু আমাদের একবার দেখতে হবে।

—হ্যাঁ, চলুন।

ধীরে ধীরে ডাঃ ঘোষকে চারজনেই অনুসরণ করলে।

একটা নতুন আশার ভোরে হঠাৎ ঘনালো মেঘলা অন্ধকার।

—

রবিবারের বিকেলে সুশোভনের কথামত সুবর্ণ এসেছে। সুশোভনের ক্লাবের বন্ধু মণিকেও সে নিমন্ত্রণ করেছে। মণিকে নিয়ে তার বাবা মনীষ ও মা ইন্দু গিয়েছিল উষা দেবীর বাড়ি। ফেরার পথে মণিকে রেখে যাবে এমনিই তারা ঠিক করে। শর্মিলার চোখ ছিল কে আসে কে যায় তাই দেখার জন্তে সদর দরজার দিকে স্থির। এখনও দীপেন্দু এলো না!

মণিকে রেখে মনীষ আর ইন্দু চলে যায় দেখে—চেনা না থাকলেও শর্মিলা পাঠালো সুশোভনকে তাদের থাকার অনুরোধ জানাতে।

সে নিজেও এগিয়ে গেল সদর দরজার কাছে।

তারা সহজেই সে অনুরোধ রক্ষা করলে।

মনীষ ও ইন্দু এলো। আলাপ হল শর্মিলার সঙ্গে। এবং সুবর্ণের সঙ্গেও।

—আচ্ছা, আপনাকে তো ট্রামে অফিস যাওয়া-আসার পথে প্রায়ই দেখি? মনীষ বললে শর্মিলাকে। ইন্দু অবাক হয়।

শর্মিলা মৃদু হেসে মনীষের কথার স্বীকৃতি দেয়। সুবর্ণকে দেখে মনীষ বললে—আপনি তো ট্রামের মধ্যে এঁর টিকিট সেদিন করে দিয়ে সত্যিই খুব অভদ্র ট্রাম কণ্ডাক্টারটার চোখ খুলে দিলেন বলা যায় এবং আমাদেরও বেশ মাথা হেঁট করালেন আপনার কাছে।

শর্মিলা চোখ তুলে সুবর্ণের দিকে চাইল। এক নতুন বিস্ময়ে।

সুবর্ণ লজ্জিত হয়। মনীষকে উত্তর দেয়—না না, সে কি বলছেন?

শর্মিলা বললে—আমি এতক্ষণ ধরে ভাবছিলুম যে তাই তো কোথায় যেন তাঁর সঙ্গে আগে দেখা হয়েছে।

—এই তো, একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন ঘটনাটা।

মনীষ বেশ সরস গলায় বলে ওঠে।

সুবর্ণ আরো রসান দিয়ে বলে ওঠে—এমনিই হয় মশাই।

শর্মিলা লজ্জিতা হয়ে বলে—তা ঠিক নয়, তবে কি জানেন সেদিন উনি তো সেই টিকিট ধরিয়ে দিয়ে সে যাত্রায় মান বাঁচালেন আমার, তার পর কথা তো বলেন নি। কথা না হওয়ার ফলে মুখের দিকে চাওয়া চাওয়ি তো হল না, অবকাশ হল কই?

—ঠিক, ঠিক।

মনীষ বেশ মনের মতো জবাব শুনেছে এমনভাবে বলে ওঠে।

সুবর্ণ বলে—তার পর আজই দেখা। সুশোভনই সংযোগ করিয়ে দিলে। বড়ই আশ্চর্যভাবে দেখা হল। আপনি না বললে ধরাই যেতো না।

—তা হলে আমার আশায় একটা স্মৃতির সল্‌তে উস্কিয়ে দেওয়া হ'ল বলুন।

মনীষের কথায় সবাই হাসতে থাকে।

ইন্দুও হাসে তবে শর্মিলার দিকে চেয়ে দেখে বার বার।

মৃণালকুমারকে নিয়ে সুশোভন ব্যস্ত। মণি ও তার অন্যান্য বন্ধুরা তাকে ঘিরে ধরে ম্যাজিক দেখার পর নানা প্রশ্ন করছে।

শর্মিলা ও তার মা চা তৈরি করে নিম্‌কি সহ তা পরিবেশন করছেন। বড় একটা কাঁসার থালায় কয়েকটি চায়ের কাপ বসিয়ে আনছে সুবর্ণ ও মনীষের কাছে।

ইন্দু বলছে—আমি যাই আপনাদের সঙ্গে কাজে লাগি গিয়ে, ছেলেদেরও তো দিতে হবে চা-নিম্‌কি।

—বেশ তো খুব ভালো, চলুন চলুন। মায়ের কাছে চলুন।

সাদর সমর্থন জানায় শর্মিলা।

শর্মিলার সঙ্গে ইন্দু প্রথম আলাপেই বেশ মিলে যায়।

মায়ের সঙ্গেও আলাপ করে নেয়।

নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে থাকে সুবর্ণ আর মনীষ।

চা-নিম্‌কি খেয়ে মৃণালকুমার আর অন্যান্য সুশোভনের বন্ধুরা চলে যায়। সুশোভন মণিকে নিয়ে নিজের পড়ার টেবিলে বসে গল্প করছে। তার স্ট্যাম্প জমানোর খাতাটাও মণিকে দেখায়। কত দেশ বিদেশের রকমারী ডাক টিকিট। দীপেন্দুর কথা মনে হয় সুশোভনের, কত ডাক টিকিট দিতেন।

শর্মিলা ভাবে দীপ্তেন্দু বোধ হয় আজ আর এলো না বা তার কলকাতায় এসে এখানে উঠতে সংকোচ বোধ হয়েছে। যদিও সঠিক গাড়ির কথা বলে নি তবু সন্ধ্যার অনেকটা সময় তো কেটে গেছে—কে জানে?

ইন্দুকে পেয়ে শর্মিলা আর তার মা বেশ গল্প করছে।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

সুশোভন এগিয়ে গেল। ভাবলে তার কোনো বন্ধু এসেছে।

শর্মিলাও আগ্রহ নিয়ে সদর দরজার কাছে চলে আসে।

দরজা খুলতে সুশোভন দেখে একজন ছোটো খাটো দেখতে বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে।

শর্মিলাও ভালো করে চেয়ে দেখলে, তার মনে হল, বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী একজন।

—কাকে চাই? সুশোভন প্রশ্ন করে বসে।

—শর্মিলা দেবী থাকেন এখানে? ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন।

শর্মিলা অবাক হয়ে যায় বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী তার নাম করছেন শুনে।

সুশোভনকে বলে শর্মিলা—ঘরে বসা।

মাও ইন্দুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখছিলেন—কে এলো। তারও মনে হচ্ছিল কি হল এখনও দীপ্তেন্দু তো এলো না। তিনি ভাবছেন প্রতিনিয়ত যে মেয়ের মনেকাষ্টের একটা সুখী পরিণতি যদি হয় তা হলেই তো!

সুশোভন ব্রহ্মচারীকে ঘরে বসায়। সুবর্ণ ও মনীষ চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের আলাপ বন্ধ রেখে। মুখে কারো কোনো কথা নেই। ব্রহ্মচারীকে দেখে তারা অবাক হয়েছে। আচমকা ইনি আবার কে এলেন গুটিগুটি! ব্রহ্মচারী বেশ বিমর্ষ মুখে ঘরে এলেন ও চেয়ারে বসলেন। মনীষ ও সুবর্ণ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ী করে। সুশোভন পড়ার টেবিলে চলে যায় মণির কাছে। এঘরের পাশেই তার পড়ার ঘর।

শর্মিলা এসে দাঁড়ায় ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে। সে ভাবে—কে ইনি, কি বলতে এসেছেন। এঁর সঙ্গে কখনো তো দেখা হয় নি, অথচ তার নাম করে এসেছেন। এত নীরব ভাব কেন? আশ্চর্য হয় শর্মিলা।

কপালে রসতিলক আঁকা ব্রহ্মচারী মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন।

সুবর্ণ ও মনীষ ভাবলে তারা রয়েছে বলে বোধ হয় তিনি কোনো কথা বলছেন না। দুজনে চোখাচোখি হতে বললেন—সুবর্ণবাবু আজ উঠি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও।

শর্মিলা বললে—না না, উঠছেন কেন, বসুন না। অবশ্য খুব তাড়া যদি না থাকে। পরে শর্মিলা ব্রহ্মচারীর দিকে চেয়ে বললে—আমি শর্মিলা। আমি আপনাকে তো…

কথা শেষ হওয়ার আগেই ব্রহ্মচারী চোখের জল মুছে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন—দীপ্তেন্দু সরকারকে চেনেন?

—নিশ্চয়ই চিনি! কেন? অবাক হয়ে শর্মিলা প্রশ্ন করে।

সুবর্ণ ও মনীষ তাকায় ব্রহ্মচারী আর শর্মিলার দিকে। শর্মিলার চোখে উদ্বিগ্ন চাউনি। শর্মিলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে ইন্দু।

—মায়ের সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভালো লাগলো।

মনীষকে বলছে সহজ মনে ইন্দু।

মনীষ বললে—মেয়েকে দেখেই মাকে আন্দাজ করা যাচ্ছে।

—তা যা বলেছেন।

সুবর্ণ মনীষের কথার সপ্রশংস সমর্থন ছোট্ট কথায় ব্যক্ত করলে।

ইন্দু সুবর্ণের দিকে চাইল কথাটা শুনেই। সে বলে উঠলো—সত্যি কি সুন্দর মিষ্টি ব্যবহার, কত আন্তরিক!

শর্মিলার এ সব প্রশংসার কথা কানেই যাচ্ছে না যেন। ব্রহ্মচারীর দিকে প্রশ্ন ভরা চোখে চেয়ে। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে।

তিনি ঢোক গিলে যেন কথা বলতে কষ্টই হচ্ছে এমন ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন—আমি বৃন্দাবন থেকে ফিরছি। আমার সঙ্গে একই ট্রেনে দীপ্তেন্দু সরকারও ছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুবই খুশি হয়ে শর্মিলা দেবীর ঠিকানায় দেখা করতে বলেন।

—না, তিনি তো এখনো আসেন নি? শর্মিলা বলে ওঠে।

ব্রহ্মচারী বললেন—রাতের ট্রেনে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় অনেক যাত্রী ছিল মাঝপথে নেমেওছেন অনেকে। রাত্রি তখন তিনটে বা এমনি একটা সময়ে স্ত্রীলোকদের চিৎকার শোনা গেল। আমি তো মহাপ্রভুর নাম জপছি। এখনও কানে বাজছে তাঁর কথা—'বড় বাড় বেড়েছে শালাদের। নিরীহ যাত্রীদের ওপর ডাকাতি! দিন তো আপনার লাঠিটা, দেখি একবার।' বাবারে উঃ, তার পরই সেই ঘটনা। দীপ্তেন্দু বাবু আমার হাতের লাঠিটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন দুর্বৃত্তদের দিকে। আমি কোনো কথা বলার শক্তি প্রায় হারিয়ে বসেছি তখন। ধস্তাধস্তি চলছে তাদের সঙ্গে। হরিমাধবঃ! এমন সময়

দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে তাদের দলের লোকেরা ফেলে দেয়। তারাও উধাও। হরি...

শর্মিলা—মা গো। একি হল আমার।

মা ছুটে এসে শর্মিলাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন। ইন্দুও সঙ্গে সঙ্গে যান।

ব্রহ্মচারী চোখ মুছতে থাকেন। সুবর্ণ ও মনীষ হতবাক। সুশোভন ও মণি পাশের ঘর থেকে বসার ঘরের দরজার সামনে অবাকভাবে তাকিয়ে থাকে।

কোন এক ইন্দ্রজালের খেলায় সমস্ত আনন্দস্রোত মুহূর্তে যেন বিস্বাদ ও বিষণ্ণপ্রায়।

অনেকগুলি একাকী দিন কাটিয়ে দীপককুমার আবার তার আধাবিকৃত-মস্তিষ্কের চিকিৎসায় অধিত বিদ্যার যথার্থ সদ্ব্যবহারে লেগেছে। নিজের বসার ঘরে বসে আছে বড় আলোটা জালিয়ে। ভাবছে চঞ্চলকে দিয়ে আর পূরবীর লেখা গানে সুর দিয়ে গাওয়ানো হল না। সামনে একটি পূরবীর ছবি ঝুলছে দেওয়ালে, দীপককুমার দেখছে চেয়ে—বাঃ বড় সুন্দর ছবিটা হয়েছে।

দেরাজ থেকে পূরবীর খাতাটাও হাতে নিয়েছে। পাতা উল্টেই পড়তে লাগলো একটা গান—

বাতাসে ছড়ানো কত প্রিয়তম বাণী
কোন কথা বলে এসে চুপি চুপি জানি।
প্রাণের দিগন্ত যত প্রতিক্ষণে অবিরত
নতুন সীমানা চায় মন অভিমানী।
হৃদয়ের গভীরে কি ভালোবাসা তার
অনুভবে ফুল ফোটে মানসী মায়ার।
বিপুল ইচ্ছার তেজে আপন প্রদীপ সেজে
শিখা কাঁপা আলো নিয়ে নিজে সুখী মানি।

দরজায় কে যেন টোকা দিলে। দীপককুমার পড়া থামিয়ে রেখেই বলে —কে? আসুন।

চঞ্চল ঘরে ঢুকলো। বললে—কেমন আছিস?

—ভালোই। এইমাত্র তোর কথাই মনে হচ্ছিল।

—খুব মন রেখে কথা বলা হচ্ছে। থাক ভাই...

দীপক বলে ওঠে—হাতে নাতে প্রমাণ রয়েছে, পূরবীর খাতা নিয়ে ভাবছিলুম চঞ্চলের আর সুর দিয়ে গান করা হল না।

—আরে আমি আবার গান গাই কিই বা ছাই তার ঠিক নেই।

—তা হোক, তবু তো একটা আশা হয়েছিল।

চঞ্চলের মনে কথাটা লাগলো। মৃত স্ত্রীর স্মৃতিতে দীপক বেশ মগ্নই রয়েছে তা বুঝলে। চঞ্চল বললে—দেখি খাতাটা?

—এই নে। দীপককুমার খাতাটা দেয় চঞ্চলকে।

চঞ্চল খাতার একটা পাতা খুলে গাইতেই লাগলো—

ঘর যে আমার কোনখানে ঠিক কোন দেয়ালের বন্দীতে!

বন্দিত নয় চরণ চিহ্ন, স্পন্দিতময় হৃদয় ভিন্ন

নন্দনলোকে মানস রম্য বীণার সুরের ফন্দিতে।

গানের জগৎ হারায় ছন্দ ভালোলাগা সুখ জাগালে দ্বন্দ্ব,

আনন্দ সুরে বেজায় মুগ্ধ, প্রাণের বিকাশ স্পন্দিতে।

—বা বা, বড় সুন্দর সুর হয়েছে। ভালো লাগলো ভাই।

চঞ্চল বেশ লজ্জিত হয়। বলে—না ভাই এতো কিছুই নয় সুর তো অতি সাদামাটা ভাবে এখনি হল। পূরবী-বৌদির বাণীবন্ধন চমৎকার।

দীপককুমার কোনো কথা বলছে না। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে নীরবে। এই দেখে চঞ্চল আর পূরবী-বৌদির প্রসঙ্গ তুললে না।

দীপককুমারের বেয়ারা এসে টেবিলে রাখলে একজনের উপস্থিতির নাম লেখা চিরকুট।

নামটা পড়ে ঠিক চেনা মনে হল না দীপকের। বললে—চঞ্চল, তুই আমার বাড়ির ভেতরে যা, মায়ের সঙ্গে ততক্ষণ কথা বল। পূরবীর মৃত্যুর পর থেকে মা তো তোদের খবর প্রায়ই নেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই যাই।

চঞ্চল চলে যেতে বেয়ারা দীপকের কাছে দরজা ঠেলে ভেতরে যাবার পথ দেখালে অতিথিদ্বয়ের। একজন মেয়ে একজন পুরুষ। পরস্পর নমস্কার বিনিময় চলে। দীপককুমার বলে—বসুন সুবর্ণবাবু, বসুন শর্মিলা দেবী।

দীপককুমার নানারকম ভেবে দেখলে কার অসুস্থতা। শর্মিলার উদাস দৃষ্টি। দীপকের মনে গভীর রেখাপাত করে।

—আপনি আলোচনা করুন, আমি বাইরে বসার ঘরে বসছি।

যেমনি স্বর্ণ চেয়ার ছেড়ে উঠেছে ওমনি নজর পৌঁছল পেছনে দেওয়ালে পুরবীর ছবির দিকে। চমকে ওঠে স্বর্ণ। দীপককুমার লক্ষ্য করে নি স্বর্ণের চমকানো। স্বর্ণই প্রশ্ন করে—এটা কার ছবি?

—আমার মৃত স্ত্রীর ছবি। পুরবী…

আর কোনো কথা শোনার মন রইল না স্বর্ণের, শুধু স্বর্ণ একবার দীপককুমারের দিকে চেয়ে ঘরের বাইরে তখনই চলে আসে। ছট্ফট্ করতে থাকে স্বর্ণ। পুরবী মৃত স্ত্রী দীপককুমারের।

মৃত!

অবাক ভাব স্বর্ণের। দীপ্তেন্দুর হত্যার সংবাদ শোনার পর থেকে শর্মিলার যে মানসিক অবসন্নতা ও বিষণ্ণতা তার চিকিৎসার জন্যে এসে স্বর্ণের একি মর্মান্তিক কথা শোনা হল। প্রকাশের অযোগ্য। মন যে মানে না। বারবার চোখ মুছতে থাকে।

পুরবী মৃত!

হু হু করছে বুকটা। স্বর্ণ ভাবে ছাত্রীজীবনের চাউনি নিয়েই সে বউ হয়েছিল। দেখা হবে না ভেবে ছিল পুরবী। দেখা হল ছবিতেই নিদারুণ সংবাদ দিয়ে। এখন সে কেবলই ছবি। এখনই যে পুরবীর চিঠিগুলো আপন মনে ফিরে ফিরে পড়তে মন চাইছে স্বর্ণের।

স্মৃতি হয়ে আছে পুরবী এবং আজ থেকে স্মৃতি মাত্রই। চুপ করে তন্ময় ভাবনায় মগ্ন স্বর্ণ। দীপককুমারের অতিথিদের বসার জন্য সাজানো সোফায় গা এলিয়ে অনেকটা সময় একভাবে এই শঙ্কটা কাটালো। বেখেয়ালী ও বেহিসেবী ভাবেই যেন অনেকটা সময় গড়িয়ে গিয়েছে পুরবীর চিন্তায়। শর্মিলা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরে তবু হুঁস নেই স্বর্ণের। দীপককুমারও শর্মিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে।

—এই যে। স্বর্ণবাবু।

স্বর্ণের চমক্ ভাঙলো দীপককুমারের ডাকে। সে দেখলে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে শর্মিলা। এই কি সেই শর্মিলা যে তার সঙ্গেই এসেছে? কেমন যেন তার চোখে এখন নতুন ঢঙে নতুন রঙে দেখা মনে হচ্ছে। সবুজ পাড়ের সাদা জমির মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ির আঁচল সরে গিয়েছে, ডান দিকের স্তনের চূড়োটি সাদা সিল্কের ব্লাউজ সমেত বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শর্মিলার ঠোঁটে হাসির মৃদু রেখার ক্ষীণ আভা।

মুখ তুলে স্বর্ণ দেখলে শর্মিলার বুকের আঁচলের অবিন্যস্ত ভাব এবং তার পর কোনো কথা না বলে শুধু আট টাকা দীপককুমারের হাতে দিয়ে শর্মিলাকে বললে—আজ যাওয়া যাক।

—হ্যাঁ। এখন মনটা বেশ হাল্কা লাগছে। দীপকবাবু, আজকের মতো তা হলে আসি। নমস্কার।

শর্মিলা বললে দীপককুমারের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে।

স্বর্ণের কানে শর্মিলার এই কথাটা যেন কেমন ভাবে বেজে উঠলো 'আজকের মতো তা হলে আসি'। স্বর্ণ আর আসতে চায় না। শর্মিলার মনের ছবি যেন স্বর্ণ দেখতে পায় আবার আসারই তার আগ্রহের। সৌজন্যমূলক শুধু তাই দুহাত তুলে স্বর্ণ জানায় নমস্কার।

দীপককুমারেরও প্রীতিময় কণ্ঠে শুধুই উচ্চারিত হয়—নমস্কার।

ততক্ষণে স্বর্ণ প্রায় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, শর্মিলাও ফুটপাত দিয়ে হাঁটছে পিছন দিকে তাকাতে তাকাতে। ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসির রেখা, চোখ দুটি স্বপ্নালু।

আর দীপককুমারের চোখে বা মনে?

মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি কি মনোলীন? না, শুধুমাত্রই সৌজন্যময়?

নাকি সুদূরের প্রতিমা নৈকট্যে দর্শন!

যাই হোক তবু দীপককুমার তাকিয়ে থাকে, শর্মিলা আর স্বর্ণ চলে যায়।

হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হল!

চঞ্চল মেসের ঘরের জানলাটা বন্ধ করে দেয়। বিছানার এক প্রান্তে প্রথম বৃষ্টির ছিটেফোঁটা লেগেছে। চঞ্চল হাত বুলিয়ে সেই ভিজে ফোঁটায় শুকনো ভাব আনতে চায়।

এই উনচল্লিশী চঞ্চলের মনের কোণায় একটু কি সরসতা আছে? সে তো শুধুই কাজের মধ্যে দিয়ে কর্তব্য করে চলে।

—হ্যাঁ, কেমন যেন চামেলী বৌদিকে এই বর্ষার সন্ধ্যে বড় বেশি করে মনে আসে! চঞ্চলের নিজেরই অবাক লাগে। যাক না তারা বড় উকিলের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক দেখা করতে! যাক না তাদের সেই উষাদেবীর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের মধ্যেই মাথা গলাতে! থাক ও সব চিন্তা ওদেরই মাথায়। গায়ে পড়ে উপকার—হয় তো আদিখ্যেতা!

চঞ্চল ভাবে—নিজের বাবা-মায়ের হাতে তো আরো কিছু পাঠাতে হবে। ওঃ ভাবা যায় না, গ্রামবাংলায় তাঁরা যা কষ্টের মধ্যে রয়েছেন! অন্তত পঞ্চাশ-ষাট টাকা তো কালই মনি-অর্ডার করা হোক তার পর নিজের যেমন ভাবে হোক চলে যাবে। কতটুকুই-বা কি করা যায় সামান্য রোজগারে!

বাইরে ততক্ষণে বৃষ্টির সামান্য রিম্‌ঝিম্ শব্দ রয়েছেই, চঞ্চলের কানেও বেশ সে শব্দ আসে। জানলাটা একবার খুলতে গেল তার পর সে ভাবলে—থাক বন্ধ করা, শুয়ে নিই। ক্লান্ত লাগছে বেশ। আড়মোড়া ভেঙে আলিস্যি ছাড়াতে চায় শুয়ে শুয়ে—তবু যেন আলস্য যায় না।

—এই সামান্য বৃষ্টির ছোঁয়াতেই আল্‌সেমী যে!

চঞ্চল চম্‌কে যায় কথাটা শুনে। ফিরে তাকায় শুয়ে থাকতে থাকতেই দরজার দিকে, তার পর উঠে পড়তে উদ্যত হয়।

—না না, বললুম বলেই ওঠার দরকার কি? আমারও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করচে। কি ক্লান্তই না বোধ হয় এই ভিড়ের ট্রামে-বাসে চেপে ঘরে ফিরে এলে। একেবারে ধস্তাধস্তি করে আসা তো!

শ্রীনিবাস বাবু বেশ হাল্‌কা ভাবেই কথাগুলি চঞ্চলকে বলেন। সহজ সরলতা তাঁর এই পরিণত বার্ধক্যেও রয়েছে, যা যুবক চঞ্চলকে বিশেষভাবে একঘেয়েমী থেকে স্নেহ স্নিগ্ধদান করে। সে উপলব্ধি করে একটা আপন মনের আশ্রয় প্রাপ্তির ছায়া।

শ্রীনিবাস বাবু বেশ সাবধানী মানুষ রোদ-জলের জন্যে ছাতাটি সঙ্গে নিয়েই প্রতিদিন অফিসে যান। আজও তাই। ফলে ভিজে যান নি। তবু বললেন—কি, এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা বলি এবার। বর্ষার আবহাওয়া এসেগিয়েছে শরতেও যে!

—তা যা বলেছেন শ্রীনিবাস বাবু, বৃষ্টির আমেজে ভালোই জমবে। তবে আজ দীপককুমার মুখার্জি আমার বন্ধুকে আসতে বলেছি যে, তাই অপেক্ষা করছি একটু। বৃষ্টির জন্যে হয়তো দেরি হচ্ছে, এই এলো বলে।

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো। তা হলে আমি তাঁর সঙ্গে বসেই চা পান করবো, আলাপও হবে।

—সে কি? আপনি এখন এক কাপ নিন তার পর সে আমাদের সঙ্গে তো হবেই। আমি সেই সময় নেবো তাই বলছি, আপনি জলঘর থেকে আসুন আমি বলছি আপনার চায়ের কথা।

চঞ্চলের কথা শেষ হতে না হতেই শ্রীনিবাস বাবু বলে বসলেন—শুন্ তো এখন, আমি আসছি এখনই।

চঞ্চল দেখলে জামাকাপড় যেমন গায়ে দিয়ে ফিরেছিলেন সেই অবস্থাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শ্রীনিবাস বাবু।

চঞ্চল নিজের তক্তাপোষের ওপর পাতা বিছানায় বেশ টান টান হয়ে শুয়েই রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরলেন শ্রীনিবাস বাবু। হাতে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধার ডাটি আর এক পাতা ধূপকাঠি।

চঞ্চল বলে ওঠে—একি শ্রীনিবাস বাবু? এ সব কি আনলেন?

—চুপ, কোনো কথা নয়—শুধু শুয়ে শুয়ে এখন দেখা। এমন চোখ পাকিয়ে কথা কয়টা বললেন শ্রীনিবাস বাবু যে দেশের দারুণ অবস্থার কথায় ভাবনা-বিষন্ন মনা চঞ্চলও না হেসে থাকতে পারলো না।

শ্রীনিবাস বাবু ঘরের একটি কোণে পানীয় জলরাখার মুখভাঙা কুজো নিয়ে এসে তাতেই রজনীগন্ধার ডাটিগুলি রাখলেন আর দুটি ধূপকাঠি ঘরের দুকোণায় খাঁজে খাঁজে গুজে জ্বালিয়ে দিলেন। ঘরটা সুগন্ধে ভরপুর হয়ে উঠতে লাগলো।

—আপনায় যে কি বলে ধন্যবাদ জানাই।

—আবার আদিখ্যেতা।

প্রায় ধমকের সুরেই বলে উঠলেন শ্রীনিবাস বাবু।

চঞ্চল বলতে যাচ্ছে—না না, দেখুন আপনি এতটা করে দিলেন; এ যে একেবারে অপূর্ব...

এমন সময় দরজার কাছে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—কি চঞ্চল, আছো তো?

শ্রীনিবাস বাবু এগিয়ে গেলেন। বললেন—আসুন, আসুন। তা যা বলেছেন। আপনার বন্ধুর কথা আর কইবেন না। হয় তো দেখবেন আপনি নিমন্ত্রিত হয়েছেন অথচ এসে দেখলেন চঞ্চল বাবুরই পাত্তা নেই। অবিবাহিত যুবক মশাই! কখন কোথায়...

চঞ্চল ততক্ষণে উঠে এসে শ্রীনিবাস বাবুর কাছে দাঁড়িয়ে দীপককুমারকে অভ্যর্থনা করছে। খুব খুশির ভাব ফুটে উঠেছে চঞ্চলের চোখে মুখে। যাক, প্রথম অভ্যর্থনাটা শ্রীনিবাস বাবুর দ্বারা হওয়ায় বেশ একটা তৃপ্তি বোধ হচ্ছে। এখন আর চঞ্চলের কোনো ভাবনা নেই, শ্রীনিবাস বাবুই মেসের সব লোক

দিয়ে সাধারণত তাদের আহার ব্যবস্থার তদারক করেন, তিনিই দেখবেন। তিনি বেশ আগ্রহী এ সব বিষয়ে। চঞ্চলের এতক্ষণ একটা বেশ দুশ্চিন্তা ছিল এই জন্তে যে, খেয়ালের বসে সেদিন দীপকের মায়ের কাছে আজ দীপকের খাওয়ার নিমন্ত্রণ তো করেছে কিন্তু সে অভ্যর্থিত হবে কেমন ভাবে! এখন শ্রীনিবাস বাবু উৎসাহী হয়েছে দেখে বেশ তৃপ্তি বোধ হচ্ছে; না হলে খুবই খারাপ লাগতো চঞ্চলের।

দীপককুমারকে নিয়ে ঘরে এসে বসলো শ্রীনিবাস বাবু আর চঞ্চল।

—বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে আসায় কষ্ট হয় নি আশা করি?

শ্রীনিবাস বাবু বললেন।

—না না, কষ্ট কিসের। চঞ্চলের ইচ্ছে আমি আজ আপনাদের সঙ্গে সন্ধেটা কাটাই এতে আর আসতে কষ্ট মনে হবে কি? এতো আমার পরম সৌভাগ্য। সাধারণের থেকে দূরেই জীবনের ফেলে আসা বছরগুলো কেটেছে—শুধু আধাবিকৃত-মস্তিষ্কের মেয়েপুরুষের মন নিয়ে সময় কাটাতে হয়েছে···

—তার মানে? ঠিক বুঝতে পারছি না তো।

প্রশ্ন করে ওঠেন শ্রীনিবাস বাবু।

তখন এর জবাব চঞ্চলই দিতে মুখ খোলে। এতক্ষণ সে যে কৃতজ্ঞতার ভারে বিনম্র হয়েছিল। বন্ধু হলেও দীপককুমারের মতো পুরুষ এসেছে তার সামান্ত মেসে নিমন্ত্র. রক্ষা করতে, ভাবতেই যেন অভিভূত হয়ে পড়ছে। যাই হোক চঞ্চল বললে—শ্রীনিবাস বাবুকে বলা হয় নি দীপককুমার মুখার্জি ডাক্তার কিন্তু সাধারণ চিকিৎসায় নয় সে মনোবিজ্ঞানী হিসেবে কলকাতায় সুপরিচিত। আজকাল সাময়িক মনোব্যাধিটা বিশেষ প্রসার লাভ করেছে—দীপক তারই চিকিৎসায় সুনামী তাই বলছে আধাবিকৃত-মস্তিষ্কের মেয়েপুরুষ নিয়ে সময় কাটে।

—ও হো, এবার বুঝেছি। আমি ভাবছি কি যে অনেক মেয়েছেলের সঙ্গ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দীপকবাবু।

শ্রীনিবাস বাবুর কথার রসিকতাটা ধরতে পেরে দীপককুমার একটু যাকে বলে আরক্তিম হয়ে ওঠে লজ্জায়। তার ফরসা গায়ের রঙে নিটোল মুখমণ্ডল যেন আলাদা শ্রী ধারণ করে আরক্তিম লজ্জার আভায়। চঞ্চল উপভোগ্য ভাবটাকে নিয়ে সপ্রসন্ন চাউনি তুলে ধরে দীপককুমারের মুখের দিকে।

—দীপক আমাদের কলেজ জীবনের বন্ধু কিন্তু কোনোদিন কোনো মেয়ের

প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে নি শ্রীনিবাস বাবু, এমন কি খুব মেলামেশি করতে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গেও তেমন একটা দেখা যেতো না। ভীষণ রকমের গম্ভীর আর তার সঙ্গে লাজুকও বলা যায়।

—সে কি? দীপককুমার নাম শুনেই তো ভেবে নিয়েছিলুম যে আপনি সিনেমার নায়ক প্রায়। চেহারায় অবশ্য তাই।

—কি যে বলেন শ্রীনিবাস বাবু, মাকাল ফলও তো বলতে পারেন।

দীপককুমারের সরস কথায় পাল্টা জবাব দিলেন শ্রীনিবাস বাবু মেসের ঘরের বিছানায় বসতে বসতে—মাকাল কি মাকালীর রাঙা ছেলে তা জানি না মশাই, চঞ্চলবাবুর বন্ধু আর বড় মনোবিজ্ঞানী, নামী লোক; কি সৌভাগ্য যে এই মেসের তা আর কি বলবো? চঞ্চলবাবুর সগৃহবাসী বলেই অবশ্য বিশেষ সৌভাগ্যবান হয়েছি।

—দীপক যে আসতে রাজি হয়েছে এই যথেষ্ট।

—এমন কথা বলছিস কেন চঞ্চল? আমি তো আগেও তোকে ডাকতে এসেছি এখানে।

—আরে সে আসা তো এমনি।

—আজকের আসায় যে চঞ্চল আমারই টান বেশি, তুই পূরবীর লেখা গানে স্থর দিয়ে গেয়ে শোনাবি বলেছিস সেটি কি আমার কম আকর্ষণের আর পরে যা ব্যবস্থা সে তো আমার রসনার পরম উপভোগ্য ভাই। আজকের সবটাই যে আমারই—শ্রীনিবাস বাবুর বা তোর কোনো কিছুর তো অবকাশই নেই।

—হ্যাঁ, ঠিক করেছেন দীপককুমার চঞ্চলবাবু এবার তা হলে এসরাজ বার করে ধরেন পূরবী দেবীর গান গাইতে।

—শ্রীনিবাস বাবুকে বলা হয় নি, দীপককুমারের সদ্য পরলোকগতা স্ত্রী পূরবী দেবী। তাঁর গানে স্থর দিয়ে দুএকটা যে আজ শোনাবো তা সেইদিনই দীপককুমারকে কথা দেওয়া হয়ে আছে।

—তবে আরম্ভ করুন। আমি ঠাকুরের কাছ থেকে এখনি আসছি, চায়ের কথাও বলে আসি।

শ্রীনিবাস বাবুর সবদিকের দৃষ্টি রাখার পরিচয় আবার পেয়ে চঞ্চল বেশ মনে মনে তৃপ্তি বোধ করে। বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি একবার ওদিকটা দেখে আস্থন, আমি এসরাজ নিয়ে তৈরি হচ্ছি গানের জন্তে।

দেওয়ালের একটা কোণে রাখা সাদার ওপর পিয়াজী ফুলফুল ছিট কাপড়ের ওয়ার ঢাকা এসরাজ নিয়ে আসে চঞ্চল। দীপক বসে তার পাশে সেই বিছানাতেই। পূরবীর লেখা গান শোনার আগ্রহ রয়েছে তার চোখে-মুখে।

চঞ্চল জানলাটা খুলে দিলে। ততক্ষণে বৃষ্টি একেবারে থেমেছে। আকাশে তারা ফুটেছে। গান ধরলে—

অবুঝ হৃদয় সে সবুজ তোতা পাখি
বাসনা দাঁড়ের চিকন কিনারে থাকি
ঝুলিয়ে সে লেজ আপন খুশিতে দুলিয়ে শরীর শেখানো বুলিতে.
মাতিয়ে দেবার চায় যে মিলন রাখি।
আকাশ অসীম নীলাভ নিবিড় তীরে
প্রাণের আলোয় ডানা মেলে উড়ে ধীরে
অজানা জগতে অদেখা হাসিতে পাবে বা পাবে না ভালো কি বাসিতে
দোল খায় তবু আশার প্রলেপ মাখি।

চঞ্চল গানের কণ্ঠে মিল রেখে সুন্দর এসরাজের সুরও তুলেছে। পাশের ঘরের দুচারজনও শ্রীনিবাস বাবুর পাশে এসে বসেছেন তাঁর বিছানায়। গান থামতে দীপক বললে—বেশ সুর হয়েছে, ভারী ভালো লাগলো।

চঞ্চল আবার দীপককুমারের সঙ্গে অন্যজনদের পরিচয় পর্ব সমাধা করে এসরাজে সুর তুললে।

আল্‌তো হাতের ছোঁয়া পায় নি অনেক দিন—
স্পর্শকাতর মন,
আল্‌তো অধরে মধু ছোঁয় নি অনেক দিন—
কি জানি সে কোন্ জন?
শান্ত বিকেল বেলা
রঙ্ ফোটা ফিকে আকাশে এতটুকু মধু আদরের
পল্‌কা প্রেমের ধন,
স্পর্শ সুখের প্রেম লাগায় রঙ্ প্রলেপ—
হাল্‌কা মাতাল মন।

দীপককুমার গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়। চঞ্চলও বেশ দরদ দিয়ে গাইতে থাকে। সবাই যেন বেশ উপভোগ করছে। শ্রীনিবাস বাবু, গানটি থামতেই বলে উঠলেন—বড় মধুর রসের গান চঞ্চল বাবু বেশ হয়েছে। বাঃ…

এই সময় মেসের লোকটি চায়ের কাপ কয়েকটি আর কেতলি নিয়ে এলো চা দিতে। শ্রীনিবাস বাবু এক কাপ চা নিয়ে দীপককুমারকে দিলেন এবং অন্যান্য সকলেও নিলেন। বর্ষার আবহাওয়ায় চাটা বেশ তৃপ্তির স্বাদ বয়ে আনলো এমনি পরিবেশে।

চা পান পর্ব সমাধা করে শুধু এসরাজে কয়েকটি সুর বাজালে চঞ্চল। তার পর গাইতে থাকলো—

আষাঢ়ের মেঘদূতী মৌসুমী বাতাসে
বলাকারা ডানা মেলে আশ্রিত আকাশে,
ছেঁড়া মেঘ নভনীলে চপলা চোখের মিলে
ঘিরে ঘিরে নিয়ে চলে
প্রাণের প্রকাশ প্রিয় অজানা আবাসে।
ললিতা রজনী ঘন মেঘলা আবেশে
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ নূপুর সুরেশে—
রুপালী সুরের ধারা, দূরের সীমানা হারা
বাসনায় মনোবীণা—
বাজায় বিরহী বাণী নিশি অবকাশে॥

—দীপকবাবু, চমৎকার গান ধরলেন দেখছি চঞ্চলবাবু। খুব রস দেওয়া ভাব। চমৎকার গান। চমৎকার···শ্রীনিবাসবাবু বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সকলের মুখেই খুশির হাসি। দীপক বড় বেশি অন্যমনোস্ক যেন। চঞ্চলের সেটা এবার বেশ চোখে পড়লো। তবু সে এসরাজে শুধুই সুর তুলে পরিবেশটা রমনীয় করতে চেষ্টা করতেই লাগলো। তার রেওয়াজ তেমন নেই তবু মেসের বাসিন্দারা বেশ উপভোগ করতে লাগলো এবং দীপকও, যদিও তার মনটা দূরে—অনেক দূরে হাঁটা দিয়েছে বললেও ভুল হবে না। পুরবীর গানের মর্ম কি? বা প্রাক্ বিবাহের কি মর্মগাথাই মাত্র এগুলি? শুধুই প্রশ্নের ঢেউ তোলপাড় করছে বুকের মধ্যে, একটা মন-জানার পরীক্ষায় হয় তো!

শ্রীনিবাস বাবু এর মধ্যে একবার উঠেগেলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন—এইবার চঞ্চলবাবুর বাজনা রাখতে হবে, ওদিকে সব তৈরি।

চঞ্চল এসরাজে শেষসুরের টান দিয়ে বাজনা থামালে। দীপককুমারকে নিয়ে সবাই ঘর থেকে বাইরে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচের তলার একটা ঘরে এলো। এখানে এক-একজন বসার ছোট ছোট চেটাই সারি সারি

পাতা রয়েছে। তারই ওপর ওপর দীপককুমারকে নিয়ে সবাই বসলে। দুজন আগে থেকেই বসে ছিলেন। শ্রীনিবাস বাবুই তাঁদের সঙ্গে দীপককুমারের আলাপ করিয়ে দিলেন। নমস্কার বিনিময় হল।

—ঠাকুর কই গো? শ্রীনিবাস বাবু বসে বসেই হাঁক দিলেন।

—এই যে যাই আজ্ঞে, সব এসে গিয়েছেন?

—আরো আসবো না, কি বলো গো ঠাকুর? শ্রীনিবাস বাবু উত্তর দিয়ে উঠলেন। চঞ্চল চুপচাপ দীপককুমারের পাশের চেটাই আসনে বসেছে। শ্রীনিবাস বাবুই সব তদারক করছেন।

—তেরো মাসে বছর যে ঠাকুরের কি আর বলবেন শ্রীনিবাস বাবু। এর পাল্লায়···মেসের বাসিন্দার কথা শেষ হতে না হতেই ঠাকুর এসে ঢুকলো ঘরে। দুহাতে থালা দুটি।

শ্রীনিবাস বাবু বলে উঠলেন—আগে এখানে দাও ঠাকুর, অতিথি ইনি।

—হ্যাঁ, এই যে, জানি বাবু এতদিন দিয়ে আসছি। বলেই ঠাকুর দীপককুমারের সামনে আর তার পাশে বসা চঞ্চলকে থালা দিয়ে গেল। দীপক দেখলে প্রচুর ভাত তরকারী ভাজায় থালা ভর্তি।

আবার ঠাকুর আসাতেই দীপক বলে উঠলো—ভাই চঞ্চল, আমি এত ভাত তো খেতে পারবো না। কিছু কমিয়ে নিয়ে যেতে বল।

কথাটা ঠাকুর শুনে বলে ফেললো—বাবু, খেতে খেতে কমিয়ে ফেলেন। কি এমন বেশী ভাত দিয়েছি।

ঠাকুর আরো দুজন-দুজনের থালা বয়ে বয়ে আনতে লাগলো। সবার দেওয়া হয়েগেলে শ্রীনিবাস বাবু বললেন—এবার আরম্ভ করা যাক।

দীপক বলে উঠলো—আমার কিন্তু ভাত একটু কমিয়ে নিতে বলুন শ্রীনিবাস বাবু, চঞ্চল জানে আমি কম খাই।

অন্য একজন তখনই বলে উঠলেন—কি এমন বেশি দিয়েছে যে আগেই তোলাতুলির কথা ভাবছেন।

—না না, শুধু শুধু নষ্ট করে লাভ কি আজকের বাজারে।

দীপক উত্তর দেয় বেশ স্বাভাবিক গলায়।

চঞ্চল এবার ডাকে—ঠাকুর।

ঠাকুর এলে চঞ্চলই বলে—বাবুর একটু ভাত কমিয়ে দিতে হবে। উনি অত পারবেন না গো।

—আচ্ছা আচ্ছা, এই দিচ্ছি। ঠাকুর আর একটা থালা নিয়ে এসে তাতে খানিকটা ভাত দীপককুমারের থালা থেকে তুলে নিলে।

দীপককুমার আরো খানিকটা তুলতে বলে। তখন ঠাকুর বলে—বাবু আপনার কথা রেখে যা তোলবার তা তুলেছি। এবার আমাদের কথায় সব খেতে হবে।

এমন ভাবে ঠাকুর কথাগুলো বললে যে, দীপক আর না করতে পারলে না। যদিও থালায় তখনও যে পরিমাণ ভাত ছিল তা দীপকের পক্ষে যথেষ্টই বেশি। তবু দীপককুমার ঠাকুরের এমন আন্তরিক ভাব বুঝে চুপ করেই গেল। শ্রীনিবাস বাবু বললেন—এবার আরম্ভ করুন দীপকবাবু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে। দীপককুমার বলে ওঠে।

সবাই ভাতের থালায় মনোযোগ দিতে থাকেন।

—ডাল তরকারী আর চাই তো বলবেন নইলে মাংসটার হাঁড়ি আনবো। ঠাকুরের কথা শুনে আবার দীপক চোখ তুলে তাকায়।

ডাল তরকারী আর কেউ চাইল না। কিছুটা পরে ঠাকুরই নিজে ডাল দিতে এলো।

শ্রীনিবাস বাবু বলে উঠলেন—ঠাকুর খুব চালাক, ডাল খাইয়ে পেট ভরিয়ে দেবে আর মাংস খাওয়া যাবে না। সেটি হচ্ছে না মাংস ছাড়া হবে না।

—সেতো আছেই, তার পর কাঁচা পেঁপের চাটনিও আছে বাবু।

—আরে, চমৎকার ঠাকুর। শ্রীনিবাস বাবুর ব্যবস্থা চমৎকার হয়েছে। অন্য একজন বলে উঠলেন খেতে খেতে।

চঞ্চল দেখলে দীপকের ডাল তরকারী ভাজা খাওয়া হয়েগিয়েছে। সে বললে—এবার ঠাকুর, মাংসটাই নিয়ে এসো।

—এই যে আনি। ঠাকুর গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁড়ি নিয়ে খাবার ঘরে প্রবেশ করলে। বড় হাতার একহাতা মাংস দীপকের থালায় দিতেই দীপক বলে ওঠে—করেন কি করেন কি? এত দিচ্ছেন কেন?

—খাবার জন্যে বাবু। অবাক করলেন এক হাতা দিতে না দিতেই এই কথা। আপনার মতো গোটা কয়েক বাবু থাকলে মেসের ভাড়ার আর খালি কোনো দিন হবে না।

—তা যা বলেছে ঠাকুর। দীপকবাবু কিছুই তো খাচ্ছেন না। শ্রীনিবাস বাবু বলে ওঠেন।

—এই তো খাচ্ছি, সব রকমই তো খাবো। আবার কাঁচা পেঁপের চাটনি করেছেন ঠাকুর। কাজেই পেটে তার জন্তে জায়গাটুকু রেখে খেতে হবে তো?

—অতো মাপ করে কেন খাবেন?

শ্রীনিবাস বাবু বললেন নরম গলায়। এবং চঞ্চলের দিকে তিনি চাইলেনও যেন দীপককুমারকে এ কথা তারই বলা উচিত ছিল।

—আপনাকে আর অতো হিসেব করে খেতে হবে না বাবু, খানতো। কথা বলতে বলতেই কয়েক খণ্ড মাংস হাঁড়ি থেকে হাতায় তুলে ঠাকুর দিলেন দিয়ে দীপকের পাতে।

দীপককুমার চমকে উঠেই বলে ওঠে—একি করছেন, আর কি পারি। এবে বেজায় হয়ে গেল।

চঞ্চল তখন ঠাকুরকে বলে ওঠে—না না, জোর করে ওকে বিব্রত করার প্রয়োজন নেই। ও সব রকম একটু একটু খাবে নিজের মতো করে, সেটাই ভালো ঠাকুর।

শ্রীনিবাস বাবুও বলেন—হঁ্যা হঁ্যা, নিজের সুবিধা মতো খান। ঠাকুর আমায় দাও একটু মাংস।

—ওরে বাস রে, আজ শ্রীনিবাস বাবু মাংস চেয়েছেন তা হলে সত্যিই রান্না ভালো হয়েছে ঠাকুর।

বললেন একজন।

এর কথায় ঠাকুর বললেন—ভালো রোজই হয় রান্না, মনের মতো অতিথি এসেছেন তাই রান্না ভালো লেগেছে আজ শ্রীনিবাস বাবুর।

দীপককুমার এবার সত্যিই চমকে ওঠে ঠাকুরের কথায়।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে চাটনির চমৎকার স্বাদ নিয়ে আহার পর্ব শেষ করে দীপককুমার। শ্রীনিবাস বাবুও চঞ্চলের সঙ্গে ওপরের ঘরে নিয়ে আসে দীপককুমারকে।

একটুক্ষণ পরে দীপককুমারই বলে—ভাই চঞ্চল, চলি এবার। দারুণ খাওয়া হল। শ্রীনিবাস বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারী ভালো লাগলো। আসবেন একদিন চঞ্চলের সঙ্গে।

—হঁ্যা হঁ্যা, যাব বইকি। উত্তর দিলেন শ্রীনিবাস বাবু। বসুন একটু দুই বন্ধুতে। আমি আসছি এখনি।

শ্রীনিবাস বাবু সামনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

চঞ্চল বললে—সেদিন মা বলছিলেন। একটু থেমে আবার বলতে থাকে—দেখে শুনে দীপকের একটা বিয়ে……

—কি বলছিস চঞ্চল—ওসব কথা এখন থাক। আমি ভাবতে পারছি না।

চঞ্চল আর কিছু বললে না। পরিবেশটাকে মানিয়ে নিতে সে বললে—কেমন লাগলো এই শ্রীনিবাস বাবুকে? ভালো না?

—সে আর বলতে। বেশ মানুষটি। দীপককুমার উত্তর করে সহজভাবেই।

চঞ্চল বলে—ওঁর হাসির তলায় চাপা আছে জীবনের কান্না—স্ত্রী পুত্র সব হারিয়েছেন পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায়, ভাবা যায় না ভাই।

—তাই না কি? ইস্…

দীপককুমার উদাস মনে বলে উঠলো সমব্যথী হয়ে।

শ্রীনিবাস বাবু হাতে পান নিয়ে তখনই ঘরে ঢুকলেন। দীপককুমারকে দিয়ে নিজেও খেলেন, চঞ্চলকেও দিলেন।

হাসি মুখে দীপককুমার বললে—অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই পান পর্যন্ত হল, এবার চলি চঞ্চল। আসি শ্রীনিবাস বাবু।

চঞ্চল তাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে সিঁড়ি দিয়ে তার সঙ্গে নামলে; নমস্কার বিনিময় হল শ্রীনিবাস বাবুর আর দীপককুমারের।

শর্মিলা চমকে ওঠে নিজের তন্ময়তার মধ্যেই। কি গভীরভাবে সে আত্মমগ্ন হয়েগিয়েছিল এতক্ষণ!

—এইযে মা যাই।

শর্মিলার উত্তর শুনতে হল মাকে রান্না ঘর থেকে তারই শোবার ঘরে এসে। অনেকবার ডাকাডাকি করেছেন কিন্তু শর্মিলার কোনো উত্তর আসেনি তাই তিনি হাতের রান্না শেষ করে এসেছেন মেয়েকে দেখতে—কি হল শর্মিলার! ফিরলো সুবর্ণের সঙ্গে তার পর থেকে নিজের ঘরেই তো রয়েছে; কিন্তু খেতে বসার জন্যে ডেকে সারা নেই কেন? প্রশ্ন আবার তোলপাড় করে মায়ের মনে। ডাক্তার দেখাচ্ছে শরীর মনের জন্যে—দুগ্‌গা দুগ্‌গা, ভালো হোক মেয়েটা। ইস্, দীপেন্দুর ফিরে আসতে আসতেও আশা তো হলোই না, একেবারে সব শেষ হয়েগেল। অমন পরোপকারী ছেলে হয় না। তার জন্যে মন মাথা ঠিক রাখা শর্মিলার সম্ভব নয় বুঝি, তবু…মা ভাবতে ভাবতে

মেয়ের কাছে উঠে এলেন। দেখলেন বিছানায় বেশ টান টান হয়ে শুয়ে রয়েছে শর্মিলা।

মায়ের ডাক কানে পৌঁছায় নি বা মেয়ে উত্তর দেয় নি—কোনটা যে ঠিক মা যেন ধরতে পারলেন না।

—ওঠ মা, চল এবার খেয়ে নে।

—হ্যাঁ গো মা হ্যাঁ, চলো।

মা তবু কি যেন ভেবে ঘরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

—চল, ওঠ শর্মিলা। মা যেন ছোট মেয়েকে খেতে ডাকছেন। তাই আবার বললেন মেয়েকে কারণ মেয়ের বিছানা ছেড়ে ওঠার কোনো লক্ষণই ছিল না যে। এমনিই হচ্ছে শর্মিলার আজকাল সব রকমের কাজেই।

আজ যেন আরো একটু অন্য রকম। মা মনের ভাব মনেই রাখলেন। মেয়েকে ভাবলেন শুধু ডাকা নয় এখন একটু আদর একটু স্পর্শ দিয়ে কাছে আরো কাছে টানতে হবে। তিনি বললেন কাছে গিয়ে বিছানায় বসে মাথায় হাত বুলিয়ে—শর্মিলা, চল্ চল্ মা, যা পারিস খেয়ে নে একটু।

শর্মিলা উঠে বসে বিছানায়। যেন নিজের সম্বিত ফিরে পেয়েছে।

মাও দাঁড়িয়ে ওঠেন।

তাড়াতাড়ি শাড়িটা ঠিক করে নিয়ে শর্মিলা মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই রান্নার ঘরে চলে আসে। শুধু আঁচলে জড়িয়ে শরীরটাকে নয় মনটাকেও সামলে নিতে চায় সে।

মা সস্নেহে রাত্রির খাবার গুছিয়ে দিচ্ছেন থালায়।

সুশোভন নিজের মনে খাচ্ছিল পিয়াজ কলির চচ্চড়ি দিয়ে মায়ের দেওয়া হাতে-বেলা রুটি। শর্মিলাকে দেখেই বলে ওঠে—কি গো দিদি, মা যে তোমায় অনেকক্ষণ থেকে খেতে ডাক ছিলেন। ঘুমিয়ে ছিলে বোধ হয়?

—হ্যাঁ, তুই তো আমায় ঘুমোতেই দেখলি।

বেশ অভিমানের সুরে শর্মিলা কথাগুলো সুশোভনের উত্তরে বলে বসলো। সুশোভন দিদির মুখের দিকে শুধু চাইল। মা ইশারায় সুশোভনকে চুপ করতে বললেন। মেয়ের মনটা যে কেমন হয়েছে তা আর কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক মা হয়ে তিনি বেশ বুঝেছেন।

থালায় করলা ভাজা, খান কয়েক হাতে-বেলা রুটি, একটি বাটিতে পিয়াজ কলির চচ্চড়ি আর একটি বাটিতে ছোলার ডাল দিয়ে মেয়ের কাছে মা রাতের খাবার দিলেন এগিয়ে।

শর্মিলা বসতে বসতেই মায়ের দেওয়া খাবারের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—আচ্ছা মা, তুমি পিয়াজ কলির রান্না খাও কি যে, আমায় চচ্চড়ি রেঁধে দিয়েছ। আমি খাবো না।

—সে কি? তুই খাবি না কেন?

মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

শর্মিলা বললে—আর কি খাওয়া চলে, না সে আর হয় না, মা পিয়াজ কলির রান্নাটা সুশোভনকেই দাও।

—আমি খেয়েছি তো দিদি!

—তা তুই খাস নি বলেছি কি! না মা, আমি আর খাবো না।

—দেখ শর্মিলা, ও কথা বলতে নেই, কি বলি আর তোকে, ও কথা মনেও রাখিস নি। খা দেখি,

—না মা, না, এই নে সুশোভন।

শর্মিলা পিয়াজ কলির চচ্চড়ির বাটিটি সরিয়ে দেয় সুশোভনের দিকে।

সুশোভন হক্‌চকিয়ে যায়। একবার মায়ের দিকে একবার দিদির দিকে চাইতে থাকে সে। কি যে করবে কি যে বলবে ঠিক করতে পারে না।

মাই তখন বললেন—শর্মিলা, মনটা খারাপ হয়ে আছে তো আমারও, সে কথা বুঝি কিন্তু পিয়াজ খাবো না বলাটি কি ঠিক হচ্ছে মা, লোকে শুনলে বলবে কি? আমি কি বলবো লোকের কাছে। এ যে লজ্জার কথা হবে।

—আমি খাবো না, আমি খাবো না মা, বলছি তো···

কথাগুলো শর্মিলা এমন ভাবে বলে উঠলো যে আর এ বিষয়ে জোর করা ঠিক নয় ভেবে মা সুশোভনকে বললেন—তুই বাবা খেয়ে নে ওটুকু, দিদির যখন ইচ্ছে নয় তখন নয় থাক আজকের মতো।

—আজকের মতো কেন, কোনোদিন খাবো না আর। খাবো না গো, খাওয়া চলে না।

কথাটা শেষ করার আগেই যেন শর্মিলার গলা পর্যন্ত কান্নায় গুমড়ে ওঠে। আর কিছু বলে না।

সুশোভন ভেবে উঠতে পারে না, তবু ভাবে। এবং সে বলেই বসে—দীপেন্দুদার জন্তে কষ্ট তো হবেই গো মা, দিদির।

—তুই আর পাকামো করিস না, চুপ কর।

মা ধম্‌কে উঠলেও চম্‌কে যান ছোটছেলের এই অনুভূতি-সম্পন্ন মনের পরিচয় পেয়ে।

শর্মিলা মুখ নিচু করে চোখের জল কোনো রকমে ঢাকতে চেয়ে খেতে থাকে বেশ তাড়াতাড়িই। দু-এক ফোঁটা কি বেশিই হবে টপ্‌টপ্‌ করে থালায় ঝরেছেও। আরো যেন লজ্জা লজ্জা করে শর্মিলার। ঝাপ্‌সা লাগে চোখ ভরা জলের মধ্যে দিয়ে দেখা খাবার থালা।

মা নিজের থালাটি সাজিয়ে খেতে আরম্ভ করবেন, কি-করবেন না ভাবছেন। সুশোভন উঠে যায় তার খাবারটুকু খেয়ে। শর্মিলাও একটু পরে।

ঘুমের আগে খাবার জন্যে দীপককুমার একটা বড়ি ওষুধ খেতে দিয়েছে। শর্মিলা একগেলাস জল নিয়ে শোবার আগে গিলে নিলে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে শর্মিলা ভাবছে। ভাবছে যে দীপককুমারকে দেখে এবং কথা বলে এমন মনটা তার তোলপাড় করা ঝড় বইছে কেন? সুবর্ণকেও তো সে দেখছে কিন্তু কই এমন তো মনে হয় নি। তার সেই ট্রামের টিকিটের দাম দেওয়া বা এই যে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের ভালো চিন্তা করা এর মধ্যে শর্মিলা দেখছে সুবর্ণের পরোপকারী সহৃদয়তার মন। সে বড় প্রয়োজনীয় পুরুষ তার এই অসহায় সংসার জীবনে।

শর্মিলা দেখেছে তার ম ক সুবর্ণ এলেই কি খুশি যে হন তা লুকিয়ে রাখতে পারেন না, বেশ প্রকাশ হয়েই তা পড়ে তাঁর ব্যবহারে কথাবার্তায়। সুবর্ণ তাই এখন তো তাদের সংসারের সবকিছু ভালোমন্দের অখণ্ড অংশ হয়ে গিয়েছে।

যতবার ভেবেছে শর্মিলা, না আর সুবর্ণকে এভাবে সব কাজেই সংসারের একাত্ম হতে দেবে না ততই যেন সুবর্ণকে সংসারের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে যেতে দেখেছে। মায়ের কি দরকার তা যেন শর্মিলার চেয়ে সুবর্ণই বেশি সহজে বুঝে নিচ্ছে এখন। মা সুবর্ণকেই সব কথা বলছেন। সব কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে, ভালোমন্দের অংশিদারই হয়ে গিয়েছে সুবর্ণ। কোনো পর্দা টানার আর অবকাশ নেই এই সংসারের সঙ্গে সুবর্ণ রায়ের। শর্মিলার মনে হচ্ছে এটা কি করে হয়ে গেল। নিস্পৃহ ভাবে সুবর্ণ আসে যথাকর্তব্য করে। সুশোভনের লেখাপড়ার দায়িত্বও কি রকম ভাবে যেন নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে সুবর্ণ।

সুশোভন তো একেবারে লেপ্‌টে গিয়েছে সুবর্ণের নির্দেশের জন্যে।

লেখাপড়ায় যেন তার আগ্রহও বেশ আগের চেয়ে বেশিই হয়েছে। ভাইটাকে স্নেহ করে বেশ, ভাইয়ের শ্রদ্ধাও তার প্রতি অগাধ। ম্যাজিক দেখার সেই বিকেল থেকে এ বাড়িতে আসার রেওয়াজটা সুবর্ণের সমানেই রয়েছে।

হঠাৎ শর্মিলার আবার সেই বিকেলের পর সন্ধের সময়ে অভাবনীয় দুর্ঘটনার খবর শোনার কথা স্মরণে এসে যায়। বুকটা দারুণ ভাবে হুহু করে ওঠে। কেমন যেন বুকটা পিসে যায় ব্যথায় ব্যথায়। তার মনে হয় এই বুঝি বুকের যন্ত্রটাই বিকল হয়ে যাবে। বুকের মধ্যে বেশ যন্ত্রণাও বোধ করে শর্মিলা।

আশ্চর্য হয় শর্মিলা—তার পরও বেঁচে আছে সে। সে মাথার মধ্যে একটা নাগর দোলায় চোর্কিবাজীর ঘোর যেন অনুভব করে। অকুল পাথারের মধ্যে সুবর্ণকে সংসারের হিতাহিতের মধ্যে পেয়েছে।

শর্মিলা ভাবে—কিন্তু কেন? কেন সে তাকে ডাক্তার দেখাবার নাম করে মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেল? তার তো মাথার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতার কিছু খেলা চলছে না। তার তো কোনো রকম উত্তেজনা বোধ আসছে না। তবে বলতে পারে দীপককুমারের সাহচর্যে একটা উত্তেজক সান্নিধ্যবোধ যেন হয়েছে।

ইস্। এমন চিন্তা করেই শর্মিলা চমকে ওঠে নিজের মনেই।

কেন? কেন এই চিন্তা এলো?

ফের ভাবতে ভাবতেই শর্মিলা ঘুমের মধ্যেই কেমন যেন হারিয়ে যায়। সে হারিয়ে যায় নিজের ভাবনায়।

সুশোভনের কেমন যেন ভয় করে দিদিকে এখন। কি যে হবে তাই ভাবছে। অথচ কতই খুশির মন নিয়ে থাকতে দেখেছে দিদিকে সুশোভন। রাত্রির খাবার খেয়ে সে শুয়ে পড়তে গিয়েও পড়ার টেবিলে বসে তার ডাক টিকিট জমানোর খাতা খুলে উল্টেপাল্টে দেখছে আর ভাবছে।

পিয়াজ কলির চচ্চরি তো দিদি-খুবই আগ্রহ নিয়ে এই কিছু দিন আগেও খেয়েছে। কই তখন তো মনে হয় নি যে মা খায় না, বা কেন মা রাঁধছে! খুব আশ্চর্য ভাবে দিদির মনটা কেমন কেমন হয়ে উঠছে! ইস্, দীপ্তেন্দুদার মৃত্যুটা যে এমন ভাবে দিদিকে উতলা করে তুলবে, এমন ভাবে সব থেকে সব ছেড়ে দিয়ে কি রকম যেন করে ভুলবে—আর ভাবতে ভালো লাগলো না অথচ

মাথায় তো অন্ত ভাবনা আসছে না তার, আর চোখ দিয়ে দেখছে ডাকটিকিটের খাতা কিন্তু মনটার অনেকক্ষণই দিদির মনটার কথাই মনে আসছে। ।

—একি তুই এখনো পড়ার টেবিলে। যা যা শুয়ে পড় বাবা। মায়ের কথায় চমক্ ভাঙলো সুশোভনের। —যা শুয়ে পড় আর রাত করে না, কাল ভোর ভোর উঠে আবার পড়বি।

—হ্যাঁ গো মা, তাই যাই শুতে।

—তা ওঠ, চেয়ারে তো বসেই রয়েছিস।

মা বেশ আবেগ দিয়ে বললেন।

—এই উঠছি মা, আর একটু দেখে নিই মা।

—কি দেখছিস রে?

—দেখো না মা, কত চমৎকার সব টিকিট জমানো রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলোই দীপেন্দুদার দেওয়া চিঠির থেকে দিদি দিয়েছে।

কথাটা মায়ের বুকে আবার নতুন একটা ব্যথার গভীর ক্ষতস্থান উন্মোচিত করলে। মা সুশোভনের কথায় শুধু বললেন—আচ্ছা হয়েছে দেখা, এখন ও সব তুলে রাখ, শুয়ে পড় এবার। দুগ্‌গা দুগ্‌গা···

সুশোভন মায়ের এই 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা' বলার মধ্যে বিশেষ মনের ভাবটি ঠিক ধরতে চেষ্টা করেই হোক বা সবটার মধ্যে একটা আব্‌ছা কিছু মনোভঙ্গি রয়েছে ভেবেই হোক, সে তখনই ডাকটিকিটের খাতাটা দেরাজে তুলে রাখলে। রেলে আসার সময় বদলোকেরা দীপেন্দুদাকে ফেলে মেরেছে—এই ভাবনায় সুশোভন কেমন ভয়ও পেলে। আর কোনো কথা না বলে শুয়েছে তার বিছানায়। মাও শুয়ে পড়লেন। তিনি তখনও বিশেষ ভাবে স্বর টেনে টেনে বলে চলেছেন—'দুগ্‌গা দুগ্‌গা'।

কি জানি কেন সুশোভন রাতের বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে শুয়েও এই শব্দ মায়ের বিশেষ কণ্ঠস্বরে যেন শুনতে পাচ্ছে। একটা ধ্বনি যেন এসে ধাক্কা দিচ্ছে সুশোভনের মনে।

তাই তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চাইছে, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতে চাইছে এখনই। সুশোভনের শিশু বুকের অশান্ত ভাবও হয়তো ঘুমের মধ্যেই শুধু শান্ত হবে!

স্বর্ণ বাড়ি এসেই শুতে যাচ্ছিল। শর্মিলাকে বাড়িতে পৌছিয়ে সে এখানে সোজা চলে এসেছে।

মনের মধ্যে পূরবীর স্মৃতি শুধুই ঢেউ তুলছে, ঢেউ তুলছে। এ কথা বললে ভুল হবে না যে, উথাল-পাতাল করছে তার বুকটা। কোন স্বপ্নের যেন এক ফেলে আসা ছাত্রজীবনের সোনালি দিন ঝলমল করছে স্মৃতিতে। কিন্তু আজ মৃত্যুর কোলে পূরবী বিদেহী। ভাবতে গিয়েই চমকে ওঠে সুবর্ণ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে, একদিন পূরবী বলেছিল—'তোমার দুচোখের কালো তারায় অসীম প্রেমের সাগর, ঢেউ তোলে যে আমার বুকে।'

সুবর্ণ বেশ মনে করতে পারছে সেদিন রেষ্টুরেন্টের পর্দা ফেলা কেবিনের মধ্যে পূরবীকে দুহাতে জড়িয়ে বলেছিল—তোমার বুকের ওপর ঢেউ তো দুটি কোমল চূড়ো হয়ে উঠেছেই। সফেন হবে কবে গো?

পূরবী তার উত্তরে কেমন যেন লজ্জায় আরক্তিম হয়ে বলেছিল—ইস্. কি অসভ্য!

তার পর, তার পর সুবর্ণ সেদিনের কথা ভাবতে গিয়েও আজ কেমন যেন অবাক হয়ে যায়। কত সহজে সে পূরবীর লাল ব্লাউজের গলায় অনায়াসে হাত ঢুকিয়েছে। কোমল ঢেউ তোলা বুকের মধ্যে হাতের স্পর্শে যথেচ্ছ করেছে ধামসা ধামসি।

পূরবী মাথাটা আল্‌তো করে রেখে দিয়েছিল তো সুবর্ণের বলিষ্ঠ কাঁধেই। সুবর্ণ বেশ মনে করতে পারছে। বড়ই মধুর স্পর্শ পূরবীর নরম বুকের, বড়ই আরামের ছোঁয়াচ লাগা।

সুবর্ণের বুকটা এখন কেবলই ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মনটায় কেমন যেন অসহায় বোধ হচ্ছে। কেমন যেন নিজেকে অক্ষম মনে হচ্ছে। হাতের মধ্যে প্রাণের মধ্যে টেনে এনেও কেন ধরে রাখলো না, বেঁধে রাখলো না সাতপাকে, সংসারের পাকে পাকে। ইস্ কি ভুল, কি ভুল হল।

কিন্তু কেন তাকে এত করে, এমন করে মনে ধরছে—সে তো দীপককুমার মুখার্জির গৃহিণী হয়েছিল। সে তো পরস্ত্রী হয়ে মৃত—আর তার কথা মনে স্থান দেওয়াও পাপ, অপরাধ বিশেষ, আর নয়। সুবর্ণ ভাবে পূরবী ছাত্রজীবনে এসেই শেষ হয়ে গিয়েছে তাকে আর মনে ধরে রাখা অন্যায়।

মনকে লাগাম দিয়ে বাঁধা দরকার। ঘোড়দৌড়ের মাঠ পেয়েছে আর মন দিয়েছে ছুট। না সেটি চলবে না।

কাল রবিবার আছে ঘুম থেকে উঠেই পূরবীর চিঠিগুলো একবার দেখবে।

সুবর্ণ রাত্রিটা ঘুমিয়ে নিতে চোখ বোজে।

কিন্তু সুবর্ণের মন বোঝে আরও গভীর করে পূরবীর স্মৃতি প্রখর রূপ নিয়ে উতলা করে তুলেছে—সে ঘুমের আমেজ খুঁজতে গিয়েও অস্থির হয়ে ওঠে, তার চোখে জল আসে, কান্না পায় প্রথম প্রেমের স্বাদ পাওয়া মেয়ের মৃত্যু সংবাদে। বুকটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে মনে হয় সুবর্ণের।

উঠে পড়েছে বিছানা থেকে। সুবর্ণ তাড়াতাড়ি তখনই ঘরের আলোটাকেও জ্বালিয়ে দেয়।

ঘরের আলো জ্বলে উঠতে দেখে সিদ্ধিনাথ বাবু ভাবলেন—তা হলে তো সুবর্ণ এসেছে। কারণ পাশা খেলায় মত্ত ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী সঙ্গীর সঙ্গে তাই সুবর্ণের বাড়িতে আসার দিকে খেয়ালই হয় নি এতক্ষণ। তিনি সহজ ভাবেই ছেলের ঘরে ঢুকে এসে বলেন—কি রে, কি খুঁজছিস দেরাজে?

—না না বাবা, তেমন কিছু নয়। সহজ ভাবেই উত্তর দিতে চেষ্টা করে সুবর্ণ তবু কোথায় যেন কথাটা গলায় বাধে। সে যে পূরবীর পুরোনো চিঠির গোছাটা নিয়ে এখনই পড়তে বসতে চাই ছিলো। তার পথে বাধা হল সিদ্ধিনাথবাবুর হঠাৎ আসায়।

তাঁর আবার প্রশ্ন—পাশার শেষ দান চেলে উঠছি এমন সময় দেখি ঘরে তোর আলো জ্বোললো। তা বেশ সময়েই হয়েছে, আমারও খাবার সময়, চল তা হলে খাওয়া যাক।

—আজ আর আমার তেমন কিছু খেতে ইচ্ছে নেই বাবা, আমার পেটটা একটু ভারিই রয়েছে।

—সে কি রে, কি খেলি আবার। যা হয় দুখানা রুটি না হয় খা দুধটুকু দিয়ে।

—না না, বাবা। আজ তাও আর পারবো না।

—তা হলে দুধটুকুই না হয় জলের মতো খেয়ে নে, আয়। গরমও করা রয়েছে তোরই জামবাটিতে।

এর পর সুবর্ণ আর কোনো আপত্তি করতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই নিচ্ছি।

সিদ্ধিনাথ বাবুর সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুবর্ণ খাবার জায়গায়। দিতে যাচ্ছিল বাবাকে খাবার থালা ঠিকভাবে গুছিয়ে। সিদ্ধিনাথ বাবুই বললেন—আমি শুধু দুধ রুটি খাব ভেবেছিলুম, তরকারি একটাই করি। তা নিই আমিই…

—কেন শুধুই দুধ রুটি খাবেন ভাবা হয়েছিল ? শরীর ভালো তো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শরীর ভালোই, তবে তোর জন্তেই যা হোক করে তরকারি একটা করে আর নিজের জন্তে কিছু করতে মন চাইল না ; আজ স্বর্ণ, মায়ের কথা মনে কর, তার যে···

—ঠিক বাবা, ঠিক ; আমি মনে রাখি নি এবার অথচ প্রতিবার এই দিনেই তো আমরা মায়ের ছবিতে মালা দিয়ে ধূপ জালিয়ে দিয়ে একটু সেখানে বসেছি। একি, এবার কেন ভুল হয়ে গেল ! ইস্, কি আশ্চর্য ! দেখি ধূপকাঠি জালিয়ে ধরি এখনি।

—আমি বিকেলেই মালা দিয়ে ধূপ দিয়েছি।

—আচ্ছা বাবা, আসছি ও ঘর থেকে।

ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনই রইলেন সিদ্ধিনাথবাবু !

স্বর্ণ চলে আসে সিদ্ধিনাথবাবুর ঘরে। অনুশোচনায় ডুবন্ত মনটা বেশ যেন একটু তৃপ্তির দ্বীপ পেলে মায়ের ছবিতে মালা ঝুলছে দেখে। নীরবে একটু দাঁড়িয়ে থাকলো মায়ের ছবির সামনে। ধূপের ধোঁয়া তখন নেই কিন্তু পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া চন্দনধূপের গন্ধ সামান্যভাবে বাতাসে রয়েছেই। স্বর্ণের মনটা মায়ের স্মৃতিসুরভি যেন পান করলে।

দুধটুকু খেয়ে স্বর্ণ নিজের ঘরে এখন নীরবেই চলে আসে। আর কোনো কথা যেন কইতে ইচ্ছেই করছে না তার। শৈশবে মায়ের স্মৃতি মধুর রূপে আর পরিণত কৈশোরে পুরবীর মায়াবী সান্নিধ্য—সব যেন স্বর্ণ বোধ করছে শুধু অধরা অতীতকে স্মরণে মননে নিদিধ্যাসনে—সব যে অশরীরী আজ। ছুঁতে তো পারছে না ! অন্ধকার, অন্ধকার অমাবস্যার রাত—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির দিকে স্বর্ণ চাইছে কই !

স্বর্ণ এখন বাস্তবে দেখছে, শর্মিলার লাবণ্যময়ী কামিনী শরীর—ইস্ কি ভাবছে ? না না, পুরবীকে যে বড় ভালোবেসেছিল। কেন তাকে ধরে রাখলো না ? বুকটা বেজায় ব্যথায় গুমড়ে উঠে বড় অসহায় করে দিচ্ছে আজ। পুরবীর কি দারুণ আকর্ষণের নরম নিটোল কিশোরী বুকের মায়াবী সান্নিধ্য ?

তবু মনে হয় শুধুই কি পুরবীর স্মৃতি। শুধুই পুরবীর কোমল বুকের নিবিড় ছোঁয়াচ দেওয়া স্মৃতি নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলোর রোমন্থনের একটানা একঘেয়ে এবং একঘেয়েমীর আবারো জীবনচর্চা চলবে ?

স্বর্ণ ভাবে। ভাবে মিতা পূরবী আজ মৃতা—এ কি মর্মান্তিক কথা? কেন পূরবীর মৃত্যু সংবাদ শুনতে হল? কেন এটুকু তার শোনার অবকাশ আজ এলো? দীপককুমারের ঘরে না ঢুকলেই হতো। এখন মনের মধ্যে একটা বিষন্নতা তবু দোলাচল? হারিয়ে যাওয়ার শেষ সংবাদ দিয়ে কি নতুনের প্রবেশ?

তবে কি জীবিতা শর্মিলা তার স্থান নেবে? কিংবা নিয়েই নিয়েছে কি? —স্বর্ণ রায় ভাবে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

রাতের গভীরতায় আরো গভীর ভাবে মনে হয়—নেবে কি তাকে শর্মিলা জীবনের সোনালি স্বপ্নময় আগামী দিনের এক মায়াবী জ্যোৎস্না দিয়ে ভরিয়ে?

স্বর্ণ ভাবে আর ভাবে—ঘুম চোখ বুজে সে থাকতে চেয়েও ভাবে। কি রকম যেন সে নিঝুম মেরে গিয়েছে।

এক সময় হঠাৎ চোখ খুলে দেখলে বাইরে জানলা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির আকাশে তারা মিটমিট্ করছে। এক ভাবে তাকিয়ে থাকে সেদিকে স্বর্ণ রায়। দূরে একটা তারা খস্‌লো। এ শহর তো উঁচু বাড়ির ছাদে ছাদে ভরা, কতটুকুই বা দেখা গেল।

ঘরও অন্ধকার—জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির ওধার দিকে যে নিমগাছটা রয়েছে তার ডালপালা সামান্য নড়ছে, দেখছে স্বর্ণ রায়। সে দিক থেকে দেখলে ঘরের জানলা দিয়ে তা. অন্ধকার ঘরে এসেই পিটপিট করে জ্বলা নীল আলো মাখা শরীরে উড়ছে, ঘুরে ঘুরে উড়ছে এক জোনাকি।

স্বর্ণ রায় দেখছে—ঘুমের বিছানায় শুয়ে এই সব তারই রাত্রির অন্ধকার ঘরে দেখছে। ভাবনায় হারিয়ে গিয়েও দেখছে—কখনও দুচোখ মেলে কখনও বা আধ ঘুম চোখে।

ঘুমোতে গিয়েও সিদ্ধিনাথ বাবু ভাবছেন—স্বর্ণ কি বিয়ের কিছু ঠিক করবে না। বয়স বেড়ে যাচ্ছে আর কবে হবে? সে যদি এখনই না ঠিক করে মনকে—আর ভাবতে পারা যায় না, ছেলের বিয়ে। ঝকমারির যেন এই সংসার হয়েছে!

সিদ্ধিনাথবাবু হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ছবির দিকে অন্ধকারেই তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবেন শুধু, আর অভিযোগের সুরে বলেন—একি ভাবনায় ফেলে গেলে আমায় বলো তো, আমি এখন কি করি? তোমার স্বর্ণ যে কোনো কথাই কানে নেয় না। কি করি এখন? তোমার আদরের স্বর্ণ যে বড় অবুঝই রয়ে গেছে গো!

প্রৌঢ় বিপত্নীক সিদ্ধিনাথ বাবু পুত্র সুবর্ণের বিয়ে দিয়ে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী স্থাপন করতে চান। তিনি ভাবেন—যা তাঁর স্ত্রীর ভাবনার কথা ছিল আজ তাঁর অনুপস্থিতিতে যে তাঁকেই ভাবতে হচ্ছে। প্রতিনিয়তই যে ভাবতে হচ্ছে। ভাগ্যবানের বোঝা তো ভগবানে বয়—তবে তাঁর?

কিন্তু সুবর্ণ কি কথা রাখবে? ঘর বাঁধবে? এমন ভাবে যে আর চলে না! সংসার-শ্রী কই?

সিদ্ধিনাথ বাবুর ভাবনা হয় রাত্রির বিছানায় শুয়ে। কত সাধ করে ছিল তার একমাত্র স্ত্রী ছেলের বিয়ে দিয়ে মেয়ের স্থান পূরণ করবে ভাবী পুত্রবধূ—কিন্তু কিছুই তার পূরণ হয় নি—সব শেষ হয়ে গেল আজকের দিনে। আর ভালো লাগছে না সেদিনের দারুণ দুর্যোগের কথা মনে করতে।

সুবর্ণ মাত্র বছর কয়েকের। কি যত্ন নিয়ে একমাত্র সোনার চাঁদ পুত্রকে মাতৃস্নেহের অঝোর ধারায় লালন পালন করছিল। কত রকম ছড়া কেটে সুর করে করে সুবর্ণকে মজার ছন্দে দুলিয়ে দিতো। শিশু মনে ছড়ার ছন্দ আশ্চর্য প্রেরণা জোগায়।

কিন্তু একদিন সব শেষ হয়ে গেল। সুবর্ণ আর ছড়ার ছন্দ শুনতে পেলে না। হারিয়ে গেল তার ছড়ার ছন্দের আবৃত্তিকারিণী মা। হয় তো ঐ নীল আকাশের তারায়—জানি না কোথায়?

কি এমন রোগ যে হল তাও তো বুঝে উঠতে পারা যায় না। ডাক্তার বললে লোহিত কণিকার অভাব ঘটেছে রক্তে। রক্তও দেওয়া হল —কিন্তু কি যে ছিল বোতলের রক্তে তারাই জানে—আর বাঁচলো না বউ, চলে গেল—ওঃ…।

আর ভাবতে পারেন না সেদিনের কথা সিদ্ধিনাথ বাবু। নীল আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি আর তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে, অশ্রু ঝরে। রাত্রির অন্ধকারে অনন্ত অনর্গলিত চোখের জলে দুগাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তো শেষে তাঁর মাথার বালিশটাই ভিজে ভিজে হয়ে যায়।

বুকটায় একটা ব্যথা বোধ করেন সিদ্ধিনাথবাবু। পাশের টেবিলে রাখা বড়ি একটা রাণতার পাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দেন আর একঢোক জল নেন গেলাস থেকে। এ সব এখন সিদ্ধিনাথ বাবু বিছানার পাশে রেখেই দিয়েছেন—কখন কোনটা কোন সময় দরকার হয় কিছুই বলা যায় না—তাই

এই সাবধানতা। প্রায়ই তাঁর বুকের মাঝখানটায় একটা ব্যথা বোধ হয় তাই ডাক্তারের পরামর্শে চলছেন এই সব বড়ি গিলে।

যদিও তিনি বুঝেছেন যে তাঁর আর বেঁচে থাকার সুখ নেই, তবুও এ কথা ভেবেও কেবলমাত্র সুবর্ণের সুচিন্তায় নিজেকে খাড়া রাখছেন—তাঁর বিয়ে একটা দিয়ে চার হাত এক করতে পারলেই তিনি ভাবেন তাঁর কাজ শেষ হয়—আর কিছুর জন্যে ভাববেন না। পুত্র আর পুত্রবধূকে সংসারে বসিয়ে দিতে পারলেই ভাবেন তাঁর ছুটি—স্ত্রীর ছবির দিকে চাইলেন সিদ্ধিনাথ বাবু।

ভাবেন কালই আবার সুবর্ণকে বিয়ের কথা যা হয় ঠিক কথা বলতে বলবেন। কিছু না হয় তো নিজের শরীরের দোহাই পেরেও জোর করবেন—বাবা সুবর্ণ আর যে শরীর বয়না। বুকের ব্যথাটায় ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে, এখন তো হামেশাই এ রকম হঠাৎ হঠাৎ মানুষের হচ্ছে। আর যে দেরি সয় না, সুবর্ণ কথা রাখবে আশা করি, বড় ভালো—সোনার ছেলে।

পুত্র সুবর্ণের বিবেচনার প্রতি পিতা সিদ্ধিনাথ বাবুর অপরিসীম আস্থা! স্থির দৃষ্টি তাঁর আকাশ ভরা তারায় হয় লীন।

গ্রাম বাংলায় কি করে যে বাবা-মার প্রয়োজন মিটবে বুঝতে পারি না ভাই—চঞ্চল বলে বেশ হতাশ হৃদয়ে।

অনিল বলে—ভাবছিস কেন, এটা সাময়িক একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল গত ক বছর ধরে, তারই পরিণতি ; এই তো এখনকার নতুন সরকারের ব্যবস্থাপনায় সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

—দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় বিশ্বাস রেখে চললে তাই মনে হয় ভাই কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কি তা হবে? কি জানি? কি ভাবে কি করি, শিরে সংক্রান্তি···

—এই তো এ দেশের নবগোষ্ঠি বলছেন তাঁরা শহরে গ্রামে কোনো মানুষকেই আর না খেয়ে মরতে দেবেন না।

—তা হলেই ভালো ভাই, হলেই ভালো। কিন্তু তার আশা যে আমি অন্তত বাবা-মার চিঠির ঠেলায় কিছু বুঝতে পারছি না, যা বুঝে দেখবার মতো মাথা ঠিক করে ভাবতেও পারছি না।

—সে কি রে? অনিল অবাক ভাবে প্রশ্ন করে।

—তা তো বলা হবেই ভাই। কোনো ভাবনা নেই, জমিয়ে পশার হচ্ছে ওকালতির, আর আমার শিয়রে শমন···

চঞ্চলের কথা শেষ হবার আগেই চামেলী যথারীতি চাটা নিয়ে আসে অনিল আর চঞ্চলের জন্তে। বিকেলের এই সময় চামেলীর একটু অবকাশ হয় বসার। চঞ্চল গোস্বামী এলে বেশ গল্প জমে তিন জনের। আজও তেমনি চা-চক্র বসছে। এখানে পেটে খিদে মুখে লাজ নেই।

চায়ের কাপে চুমুক দেয় চঞ্চল।

চামেলী বলে—সে কি, আজ মার্টন স্তুইচ করেছি কেমন হল আগে খেয়ে বলুন, তবে তো চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া উচিত।

—তা ঠিক, তবে চাটা যে আমি আগেই খাই, অন্য কিছু খাবার খেয়ে ফেলার আগে আমার চা প্রথমে খেতেই বেশ লাগে।

অনিল বলে—তা ভালো, যাদের কথা বলার কাজ নয়, দেখছি তাদেরই গলা ভেজাতে হয় আগে।

—উকিল বা কোকিল যা হয় হয়ে বেশ বকবকম হচ্ছে জানি, তবে এটা মুখের নিছক চায়ের স্বাদ গ্রহণ।

—তা ঠিকই আছে জানি, তাই হোক, চা আমি আবার দিচ্ছি এখনই আর এক কাপ।

চামেলীর কথায় চঞ্চল বলে ওঠে—তাই এত ভালো লাগে আমার এখানে, মনের কথাটি একেবারে বলা হল। ওঃ, কি ভালো যে বৌদি, তা আর কি বলব ভাই অনিল। আজ আমি নতুন করে বুঝতে পারছি বৌদিকে।

—থাক, থাক খুব হয়েছে। অত আর দরকার নেই।

চামেলী কপট অনুযোগের সুরে কথাটা বললে। অনিল বেশ উপভোগ করছে। সে বললে—চঞ্চলের তো এবার দেখছি পোয়া বারো। আর চামেলীকে পায় কে, এখন আমার দিকে সুন্দরীর দৃষ্টি ফিরলে হয়?

—খুব হয়েছে। আর ঢঙ্ করে সোহাগ জানাতে হবে না বন্ধুর সামনে।

—ইস্, কি বলছে চামেলী আজ, চঞ্চল কিছু মনে করিস নি ভাই।

—আবার আদিখ্যেতা হচ্ছে। চামেলী রুষ্টভাবে চেয়ে বলে—বসো আরো এক পট তৈরি করে নিয়ে আসি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে এসো।

—তা বলে তোমার জন্তে আর নয় কিন্তু।

—সে কি বৌদি! এক যাত্রায় পৃথক ফল, সেটা কি রকম?

—বেশি কোনোটাই ভালো নয়।

—বেশি আর কি বলছে অনিল !

চঞ্চলের কথায় উত্তর না দিয়ে চামেলী তাকায় অনিলের দিকে।

—আমার কথা আমাকেই খুব সুযোগ বুঝে ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, খুব দুষ্টুমী ! আমার জন্মেও এনো এক কাপ লক্ষ্মী।

অনিলের কথার উত্তরে চামেলী মুখ টিপে হেসে বলে—তুমি আবার কেন খাবে আর এক কাপ, এই তো খেলে। আচ্ছা, না হয়—আধ কাপ আনবো।

—তাতেই হবে।

চঞ্চল বললে—বাবা, এত প্রেম তো দেখা যায় না বড় একটা।

—কি রকম লাগছে, দেখে ?

—ভালো ভাই ভালো, খুবই ভালো।

—তা হলে তোর জন্মে একটা সন্ধানে লাগি ?

—কি যে বলিস ! বাবা-মার চাহিদা মিটিয়ে আমার আর এখন নিজেরই ঘরের প্রয়োজন মিটিয়ে চলে কতটুকু তাই ভাবি ভাই তার পর তো পরের ঘরের মেয়ের ভার নেওয়ার কথা।

—কি যে বলিস চঞ্চল !

—না ভাই, এটাই বাস্তব সত্যি ; আমার কথা থাক।

চঞ্চল খুবই বিষণ্ণভাবে কথা কটা শেষ করে। মনটা তার কেমন কেমনও করে যেন, মুখের কথায় তার আর প্রকাশ নেই, ঘরে জানলা দিয়ে বাইরের পানে উদাসভাবে তাকায়।

অনিলও আর এর পরে এ প্রসঙ্গ মোটেই তোলে না।

নীরবে দুজনেই শেষ করে মার্টন স্যাণ্ডুইচ কয়েকখানা করে। চঞ্চল তো আগেই চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চাটুকু শেষ করে রেখেছিল, অনিল তার চা তৃপ্তির সঙ্গে পান করছে।

বেশ কিছুটা সময় এমনি ভাবে কেটে যায়।

সমস্ত স্তব্ধতা ভাঙিয়ে চামেলী চায়ের কেটলি হাতে ঢোকে বলতে বলতে —এবার কিন্তু অন্য জিনিস এনেছি, কাপে ঢালার আগেই বলতে হবে।

চামেলীর কথায় চমক্ ভাঙে চঞ্চলের।

অনিল বলে ওঠে—আমি তো কফির গন্ধটা তোমার এ ঘরে আসার পূর্বরাগেই ঘ্রাণে পেয়েছি। সেই হিসেবে ঘ্রাণচোর বলতে পার আমাকে।

—ননিচোর তো এত দিন জানতুম অনিল, তা মন্দ বলে নি, এবার থেকে

ঘ্রাণচোর জানা হল। চামেলী বৌদি, কফিতেও কি. অনিলের ঘ্রাণেই অর্ধভোজন; থুরি, কফি আর ভোজন হয় কি করে, অর্ধপান?

—তা নয় তো কি, পুরোটা আজ আর নয়।

—আচ্ছা ঠিক আছে, সময় মতো আমিও মনে করে রাখছি, তোমাকেও বলবো 'পুরোটা আর আজ নয়'।

—ছিঃ ছিঃ কি সব অসভ্য কথা, ধ্যৎ আমি এই কেতলি রেখে যাচ্ছি, তোমরা নাও খাও।

—সে কি বৌদি? আমি তো তা হলে আর নেবোই না।

চঞ্চলের কথায় চামেলী বলে—কি যে সব বলে, মক্কেলদের সঙ্গে মিশে মিশে একেবারে মুখের আগল খুলে গিয়েছে।

—তা দেহের আগল তো খোলে নি চামেলী কারো সামনে, তোমার আর লজ্জা কেন, এতো কথা মাত্র।

—খুব হয়েছে ভনিতা করা, আর সাফাই গাইতে হবে না মশাই। ভালো মানুষ বন্ধু পেয়ে যা নয় তাই করে আড্ডা মারা চলছে।

—চঞ্চলের প্রশংসা চলুক এবার। শোনরে চঞ্চল।

—কেন হিংসা হচ্ছে?

—সে বস্তুটা তো তোমাদের একচেটিয়া গো। কোনো পরস্ত্রীর দিকে হেসে কথা বললে একেবারে এক হাঁড়ি রাগ অভিমান সব এসে হাজির হয়। হিংসায় জ্বলতে থাকো বা জ্বালাতেও থাকো।

—জ্বালাতেই তো থাকি আমরা।

—তা ছাড়া আর কি বলবো, বলো?

—থাক থাক, খুব হয়েছে, পুরুষ-মানুষী উদারতা দেখানো হচ্ছে আবার। মেয়েদের ঘোমটা দিয়ে পর্দার আড়ালে রাখতে পারলেই তো তোমরা বাঁচো, তা আর জানি না যেন।

—হ্যাঁ, তা আর জানবো না, তার প্রমাণ তো তুমিই। এই দেখো না একেবারে পর্দানশিনী। অসূর্যম্পশ্যা চামেলী দেবী।

চঞ্চল এইবার তার মুখ খোলে। সে বলে—নিজেরা যত পারো কথা কাটাকাটি করো ভাই ক্ষতি নেই কিন্তু আমি যে ভাই মার্টন স্যাণ্ডুইচের অপূর্ব স্বাদ গ্রহণের পর কিছু উষ্ণ পানীয় গ্রহণের জন্যে বেশ ব্যগ্র হয়ে রয়েছি।

—এ হে হে, এইরে দেখছেন। আপনি তৃষ্ণার্ত রয়েছেন অথচ আমি তো তার দিকে দৃষ্টিই দিই নি, তার ওপরে দেখুন স্বার্থপরের মতো নিজেরা আবার কথা বলেই চলেছি।

—এতেই প্রমাণ পাচ্ছি যে আপনি অনিলকে কত ভালোবাসেন।

চঞ্চলের কথায় চামেলী লজ্জা পায়। হয় তো তার কান ও গাল দুটি ইষৎ আরক্তিম হয়ে ওঠে।

অনিল বলে—বারে চঞ্চল, খুব যে চামেলীকে 'আপ' করছিস ভাই, আমি যে তলিয়ে যাব শেষে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আর নয়। তলিয়ে যাবে…

চঞ্চলের কথা শেষ হওয়ার আগেই চামেলী বললে—তলিয়ে যাবে কি না জানি না, তবে কফির তলানিটা তোমায় দিচ্ছি না ওটা আমার জন্যেই রাখছি।

চঞ্চলকে চায়ের কাপটা একটু জলে ধুয়ে দিলে কফি পুরো এক কাপ আর অনিলকে তার খাওয়া চায়ের কাপটাতেই জল বুলিয়ে দিলে আধ কাপ। শেষে নিজে আর একটা কাপ নিয়ে এসে কেতলির তলানির কফিটুকু নিজে নিলে। এক কাপের একটু কম হল।

—এটা কি ঠিক হল?

চঞ্চল বলে ওঠে চামেলীর দিকে চেয়ে।

—এটাই তো বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের রীতি। স্বামী ও পরিজনের সবাইকে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই মেয়েরা গ্রহণ করবে।

—অপূর্ব! অনিলকে সত্যিই হিংসা করতে হয়। তুই ভাগ্যবান ভাই এমন তোর স্ত্রীভাগ্য লাভ।

—ওরে বাস, থাক চঞ্চল, থাক আর নয়! এর পর দেখছি আমাকে ঘর ছাড়া করবি তুই।

—তার মানে?

চমকানো কণ্ঠস্বরে চামেলী বলে ওঠে।

—এই তো এবারে তুমি প্রশংসায় পুষ্ট ও তুষ্ট হয়ে এমন আকাশ চুম্বি দর্প নিয়ে ঘরে বসবে যে আমি তখন হয় কেঁউ কেঁউ করবো আর নয় তো মানে মানে—য পলায়তি স জীবতি।

—তোমরা তো সেই ধাতের পুরুষই বটে গো, স্ত্রীর কাছে কেঁউ কেঁউ

করবে বা পালিয়ে বাঁচবে। উল্টে আমাকে পালাতে পথ দেখাবে যাতে নতুন তরুণীর ঘর করা যায়।

—আহা. তা যা বলেছ সুন্দরী! আমার মুখ পাল্টাই হয় গো, তাই বলছো তো? ঠিকই বলছো···

—তা ছাড়া আর কি বলবো বলো?

—দেখো সে পথ তো এখন আমাদের আইনের রাস্তা ধরেই হয়, হামেশাই হয় বিচ্ছেদের মামলা···

—কি যে সব যা তা বকবক করছো।

চঞ্চল বলে—ঠিক তো, বৌদি ঠিকই বলেছেন। অনিল সত্যিই এবার বড় বাজে কথা বলছিস।

—আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, আমি এই মুখটি বন্ধ করছি এবং আধ কাপ কফি পান করতে মনোসংযোগ করছি। তা হলেই তো হবে।

—আরে রাগ করলি নাকি?

—কি যে রাগের কথা হল এমন, যে রাগ করবে। আপনি এখন বলুন তো দেখি কেমন কফি হয়েছে। বন্ধু তো খালি বলে 'কফি হাউসের কফির মতো বাড়িতে আর করতে হয় না'। জানি না বাবা কি মধু আছে ঐ কফি হাউসের কফিতে, না অন্য কিছুতে।

—ও বাবা, এ যে দারুণ অভিযোগ দেখছি, কিরে অনিল উত্তর দে।

—আমি তো ভাই এখন আর মুখ খুলবো না বলেছি, কফির কাপ আগে শেষ করি ভাই।

—বলবে আর কি? আসল কথা বললেই বন্ধু বিগরোয়।

—না না, অনিলকে এতখানি বৌদি বলা যায় না।

—না, তা আর নয়। একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা বন্ধুটি আপনার। ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না।

—আমি কিন্তু ভাই চঞ্চল, মুখ খুলছি না এখন।

—অর্থাৎ খুললে তুমি তুবড়ি ছোটাতে এই তো?

—মোটেই তা ভাববেন না। আর কোনো সাফাই দেবার যোটি নেই মশাইয়ের, শুধু ভেক ধরে বসে থাকা ছাড়া, কতই সাধুপনা জানো মশাই!

—যাক কফিটা যে আমার উপাদেয় পানীয় হল সেটা জানাচ্ছি বৌদি, অনিল নিশ্চয় উপাদেয় কিছু ব্যবস্থা আপনার জন্তে আজ করবে।

চঞ্চলের কথায় অনিল চাইল চামেলীর দিকে স্বপ্নভরা চোখে। চামেলী অনিলের চাউনির ওপর চোখ রেখেই বললে—তোমার কোনো কথা শুনছি না আর, অমন করে চাইলে আর কি হবে!

চঞ্চলের ভারী ভালো লাগলো চামেলী বৌদির কথা বলায় মিষ্টতা আর অনিলের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর প্রতি তাকিয়ে থাকা।

ও প্রাণ প্রেম-প্রীতি প্রকাশের নিরন্তর নির্ঝর যেন—শুধুই প্রবাহমুখকে অর্গল মুক্ত করার অদূরে অপেক্ষিত ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষা।

শ্রীঅরবিন্দের আর শ্রীমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেন ভাবছিল নিজের মনেই মনীষ মৈত্র।

এমন সময় স্ত্রী ইন্দু এসে বললে—কি গো, মহাননদিনী যে পত্র লিখেছেন। দেখো কি সব লিখেছেন, পড়ে দেখো। আচ্ছা ফ্যাসাদের কথা।

—হ্যাঁ? চমকে উঠলো মনীষ। নিজের মধ্যে আপন ভাবনায় ভাবিত ছিল হঠাৎ ইন্দুর কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে এলো। সে তার সাম্প্রতিক পণ্ডিচেরী-পরিভ্রমণের ফেলে আসা যেন স্মৃতিরোমন্থন ছেড়ে এই বর্তমান ভাবনায় ফিরে এলো। বললে—কই দেখি? তোমায় হঠাৎ লিখেছেন তিনি? আশ্চর্য, তোমায় লিখলেন যে বড় ?

—তা তো বলবেই। তোমায় না লিখে আমায় লিখছেন, শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো তো?

—আবার বাজে চিন্তা করছো। কখনও চিঠি তো তিনি লেখেন নি তাই অবাক লাগছে গো। অন্য কথা কেন ভাবছো বলো তো?

—মনের কথা মুখে বলে ফেললেই দোষ! নিজের বুকে হাত দিয়েই দেখো না, বুকটায় কি চোটলাগে নি বলছো, তোমায় লিখবেন মহাননদিনী চিঠি আর তা নয় তিনি আমায় লিখলেন। কোনো যদি বুদ্ধি থাকে তাঁর। নামেই বড় উকিলের বিধবা স্ত্রী। নিজের ঘটে যদি এতটুকুও বুদ্ধি থাকে।

—সারে তা আর বুঝলে না তো? তিনি বড় উকিলের স্ত্রী বলেই এই প্যাচটা খেলেছেন। তুমি গৃহিণী তাই তোমাকে তিনি প্রথম চিঠি দিয়ে নিজের আসন কায়েম করলেন, এইবার থেকে আমাকেই লিখবেন। দেখো তখন আবার তোমার মুখভার না দেখি যেন।

—আমার ভারী বয়েই গেছে মহাননদের চিঠি তোমায় লিখলে মুখভার

করতে। আচ্ছা এই নাও তাঁর চিঠিটি। এবার যা হয় কিছু একটা করতে হবে গিয়ে আমাদেরই, দেখো না পড়ে কি এক ফ্যাসাদের কথা আছে যা না-কি চিঠিতে লেখা যায় নি।

—বলো কি? দেখি কি লিখেছেন?

ইন্দু তৎক্ষণাৎ চিঠিটি দিয়ে দিলে মনীষের হাতে। মনীষ পড়তে থাকলো। লিখছেন—'স্নেহের ইন্দু, তোমাদের সেদিন দেখার পর থেকেই আমার বড় ভালো লেগেছে। যে কদিন এলে ভারী ভালো লাগলো। এই কদিন থেকে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা বিশেষ দরকার হয়েছে। অথচ কর্তার অবর্তমানে টেলিফোনটা আর চালু রাখা হল না। তাই তোমার কর্তাকেও অফিসে যে ফোন করে আসতে বলবো তারও পথ বন্ধ। এখন তোমাকেই চিঠিতে জানাচ্ছি, খুবই দরকার তোমাদের। পত্র পেয়েই যদি একবার আসো তো তা হলে পরামর্শ করে শান্তি পাই। কি যে হবে জানি না। তবে সে সব কথা চিঠিতে কিছু লিখছি না, এলে সব আলাপ হবে তার পর যা হবার তাই আছে আমার ভাগ্যে। তিনি তো আমায় এই সব ভাবনার বোঝায় ফেলে রেখে গেছেন। এখন আমি সেই বোঝা বইছি। কখনও কিছু চিন্তা করতে হয় নি আর এখন সেই চিন্তারই পাহাড় মাথায় নিয়ে রয়েছি। কষ্ট করে এই দিদির কাছে লক্ষ্মী বোন, দুজনে এসো একবারটি তাড়াতাড়ি। ইতি আশীর্বাদিকা উষা দি'—বাস রে, কি হল আবার?

—যাই হোক চিঠিতে যখন ঐ ভাবে লিখেছেন তখন আমাদের তো একবার যেতে হয়, তাই না?

—তা ঠিক, তবে, তুমিও কি যাবে?

—না না, তুমিই যাও মশাই, আমি আর কেন? কি তাই তো মনের ইচ্ছে, বলোই না বাবা খোলাখুলি।

—তা আর নয়, তুমি শুধু কোলাকুলির কথাই ভাবো, দেখো আবার কি কাণ্ডটাই হয় তো হয়েছে।

—হ্যাঁ মশাই তাই জন্যেই তো যেতে হবে এবং চিঠিতে যে ভাবে লিখেছেন তার পর দুজনের না যাওয়ায় কথা থেকে যাবে, তোমার বোনটির আবার তো মুখভার হবে। তখন তোমার মা-বাবার মন খারাপ হবে। তার চেয়ে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি, তুমিও তৈরি হয়ে নিয়ে চলো।

—এখনই?

—হ্যাঁ, তাতে আর কি হয়েছে ?

—মণি এলে কি করবে ? দরজা বন্ধ করে যেতে হবে তো ?

—আরে মশাই আমি কি সে ব্যবস্থা না করেই রয়েছি। মণি গিয়েছে স্থশোভনের বাড়ি। বলেছি আমরা ফেরার সময় ওকে নিয়ে বাড়ি আসবো, সেই ফাঁকে স্থশোভনের দিদিকে, বেশ সুন্দরী গো, তোমার দেখা হবে আর ফাউ হিসেবে আমারও দেখা হবে স্থশোভনের মায়ের সঙ্গে, বড় ঠাণ্ডা বুড়ি মানুষটি।

—তা হলে তো দেখছি তুমি আগে থেকেই সব ব্যবস্থা পাকা করেই রেখেছ। শুধু আমার অফিস থেকে ফেরার অপেক্ষায় ছিলে বল ইন্দু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রাণনাথ ?

—বেশ শ্যামাঙ্গী, এবার তা হলে ঘর দোর বন্ধ করে রওনা দেওয়া যাক তোমার মহাননদের দর্শনে।

—তিষ্ঠ ক্ষণকাল প্রভু, শ্যামাঙ্গী হলেও বাড়ির বধূ তো, কাপড় পাল্টে নিয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে তবেই তো আত্মীয় বাড়ি যাওয়া যাবে। একটু বসলেই আমি তৈরি হয়ে নিতে পারবো।

—ততক্ষণ কিছু ভক্ষণ কর্ম যে করতে হয়।

—তার ব্যবস্থা কি আমি না করেই রেখেছি মশাই। দেখো-না গিয়ে সবই ঠিক আছে, ও ঘরে।

—বাস বাস, তা হলেই হল। আমি খেয়ে নিচ্ছি।

—ওঃ, মহাননদের কাছে যেতে কি উৎসাহ !

—আরে তুমিই তো ব্যবস্থা করলে, আর উৎসাহ দেখলে আমার, বেশ হয়েছে। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

—দেখো বাবা, চুরিটুরি আর কোরো টোরো না, আমিই গিয়েছি ধরা পড়ে আবার কাউ কে চুরি করতে গেলে নিজেই ধরা পড়বে চোর হয়ে।

—খুব হয়েছে থাক গো, তুমি তো আমারই।

মনীষ একেবারে ইন্দুকে দুহাত দিয়ে বুকে টেনে নিলে। তার মুখের নানা জায়গায় চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তুললে।

ইন্দু বললে—কি করো কি করো গো, ছাড়ো ছাড়ো খুব ভালোবাসো গো, জানি তা খুব জানি, এখন আর নয়। চলো যাই তৈরি হয়ে।

ইন্দুও কথা বলতে বলতে মনীষের ঠোঁটে চুমু দিলে আলতো করে।

তার পর মনীষের দু'হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ব্লাউজ ও কাপড়টা ঠিক করতে করতে ঘর থেকে চলে যায়।

মনীষের নেশা ধরে গিয়েছে যেন, সে আবার ইন্দুকে আদর করতে এগিয়ে চলে পাশের ঘরে যাওয়ার পথেই।

ইন্দু দ্রুত চলে যায়। ধরা দেয় না মনীষকে এখন আর।

উষা দেবী বেশ বিমর্ষ ভাব নিয়ে বসে আছেন। মনীষ আর ইন্দুকে পেয়ে তিনি সব কথা বলছেন। মাঝে মাঝে তাঁর গলাটা কথার মধ্যেই তখন বেশ ভারী হয়ে উঠছিল। তিনি গলার খাঁক্রানি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কথা কয়ে যাচ্ছিলেন। কখনও কখনও কান্নার মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিজের জীবনের অনেক কথা বলছেন যা খুব স্বাভাবিক নয় বলাটা। অথচ বলছেন। মনীষ বা ইন্দু অবাক।

—কি হয়েছিল দিদি? ইন্দু প্রশ্ন করে স্বাভাবিক ভাবে।

—আর হওয়ার কথা যদি বললে বোন তা হলে বলি তোমাদের, আমার আর আপনার বলতে কে রইল বলো? যাই হোক তোমরা তো আসছো, তোমাদেরই আপনার মনে করে বলি সব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না! কোনোই কিন্তুর কারণ নেই।

মনীষ আরো ভরসা দেন উষা দেবীকে।

—না না, কিন্তু কিসের, কিছু মাত্র নয়। এই দেখো না কিন্তু যদি বোধ করতুম তা হলে কি এমনি ভাবে চলে আসি বাইরের ঘরে। আর এখন আমার তো ঘরে-বাইরে এক হয়ে গেল! যাঁহাতোক তোমরা এসেছো দেখেছি অমনিই চলে এসেছি যেমন ছিলুম তেমনি বেশে। ইন্দু তো বোন আমার বুঝতেই পারছো মেয়েছেলের কত রকম আঁটোসাঁটো জামায় বাইরে আসতে হয়।

উষা দেবীর এ কথায় ইন্দু লজ্জা পায়, মনীষও মাথা নিচু করে থাকে। তাঁর কথায় একটু আক্ষেপের স্বর, দেহের অগোছালো ভাব।

—পাতলা কাপড়টা গায়ে ছিল ইন্দু, তা যেমন হয় একটা ঢাকা আছে তো, বাস চলে এসেছি গো তোমাদের সামনে। আমার আর কি হবে ঢাকাঢাকি করে, কার জন্যে দেহ? আঁচলই খসে গিয়েছে যে, তিনি গেলেন সব গেল। আমার যে ঘরেরও বাঁধন আলগা হয়ে গেল। মেয়েটাও উঠেছে বিগড়ে, এখনও তো বাড়ি ফেরে নি। কি হবে বলো, তোমরাই বলো এখন!

—তার মানে, কোথায় গিয়েছে ?

মনীষ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে বসে তখনই। ইন্দু চুপ করে প্রশ্নভরা চোখে উষা দেবীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে। মনীষ তো প্রায় উষা দেবীর দিকে চাইতেই লজ্জা পাচ্ছে এমন পাতলা শাড়িতে বুক ঢেকে এসেছেন। কি ফর্সা নিটোল গড়নের শরীর! থলোথলো ভাব। শাড়ির মধ্যে দিয়ে পাছার রঙও ফুটে উঠেছে বেশ। সায়াটুকুও গলিয়ে আসার কথা খেয়ালও হয় নি তাঁর। অবাকই মনে হচ্ছে আজ মনীষের কারণ এতবার এসেছে উষা দেবীর বাড়ি অথচ তাঁকে এমন ভাবে দেখে নি কোনোবার। চল্লিশ উত্তীর্ণা কিন্তু শরীর নিটোল বা যে টোল ফুটে উঠেছে তা লোভনীয়। ইন্দু লক্ষ করলে মনীষ লজ্জা নিয়েও তার চোখ দুটিকে ঠিকই ফাঁকে ফাঁকে উষা দেবীর শরীর প্রদক্ষিণে তৎপর রেখেছে। মনীষের দিকে তাই একবার ইন্দু ভ্রূ দুটো কুঁচকে চাইলে, ঠোঁটের ফাঁকে অবশ্য চাপা হাসি। মনীষ আবার নিজেকে সামলে নেয়।

ইন্দু বলে—তাই তো কোথায় সে ?

—আর কি বলবো, আমার ভাগ্যে এই ছিল ; এই জন্যে আমি রয়েছি, তিনি চলে গেলেন আমায় রেখে।

—না না, সে কথা কেন বলছেন!

—আর কি বলবো, আর কি বলবো না ; ভাবতে পারি না।

—তা সত্যি। ঠিকই…

—তোমরাই বল।

—সংসারে এমনিই দুঃখের সময় এসে যায় আবার তার থেকে সামলেও উঠতে হয়। সংসারে সঙ্ সেজে থাকা মাত্র। আপনার মনের কষ্ট সবাই বুঝি, কিন্তু তবুও…

মনীষ সামলে দিতে চায়, মুখ তুলে কথা বলেই আবার তার মুখ নিচু করে বসে। কি-ই বা বলবে ? দেখেছে টানা টানা দুচোখে জল ভরা, কাঁদছেন উষা দেবী।

মনীষের সলজ্জ ভাব দেখে ইন্দু মুখ টিপে হাসতে গিয়েও উষা দেবীর দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ ভাব নিয়ে অবাক চোখে চায়। ইন্দু এই পরিবেশকে সহজ করতে গিয়ে বলে—জামাই বাবুর চলে যাওয়া দুঃখের খুবই তবু একমাত্র মেয়ের মুখ চেয়ে আপনাকে যে শক্ত হতেই হবে।

—আর শক্ত হব কার জন্তে, কি জন্তে, শেষে কিনা মেয়ের মনে এই ছিল। আর আমার কি মুখ থাকলো বলো?

—হ্যাঁ, কি বলছেন?

—আর বলছি কি বোন, শোনো তবে সাধে কি আর লোক দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাই, নিজে যাওয়ার মতো মনে হচ্ছিল যে। কি করি এখন কি হবে যে তাই ভাবনা, একটা সমাধান একটা বিহিত চিন্তা করতে পারবো যে কি তাবে তাই শুধু এখন আমার ভাবনা গো? বীথিকে যে করে হোক ফিরিয়ে আনতে হবে।

—কি হল বলুন তো?

মনীষ চুপ থাকতে থাকতে একবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে।

ইন্দুও প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে থাকে উষা দেবীর আলুথালু চেহারার দিকে, উদ্‌ভ্রান্ত প্রায় দৃষ্টির দিকে।

—আমি নিজে বুঝতে পারছি না। উষা দেবী কান্নার চোখ দুটি মুছে নিয়ে বলতে থাকলেন—কেন যে এমন করলে, কি হল? মেয়ে আমার চুপচাপ থাকতো। কথা যতটা না বললে নয় ততটাই ইদানিং কইছিল। আমারও মন খারাপ, তাই-বা শুধু কেন, মাথা খারাপ হবার মতো ; তিনি সব ফেলে চলে গেলেন। ভাবি বুঝি মেয়েরও মন খারাপ—অবশ্য আগে অতো মনে করার অবকাশও হয় নি নিজের মনকে শক্ত করে বাঁধতেই চেষ্টা করছিলুম। এরই ফাঁকে মেয়ের মন কোথায় বাঁধা হয়ে গেল। চলে গেল একেবারে। ইস্…আমি কি বলি, কি করি এখন?

—কি ভাবে কি হল? মনীষ প্রশ্ন করে বসে একবার মুখ তুলে, ভাবছে মুখ খুলে জিজ্ঞেসাই করবে।

—আমার বলার নয়। কেন আগে চলে যাইনি কর্তার আগে তাই ভাবি, এই ছিল আমার ভাগ্যে? কা'র কাছে আমি কি যে অপরাধ করেছি? কি লজ্জা…

উষা দেবীর মনটা উতলা ও উদ্বিগ্নে ভরা। নিজের মনের কথা বলতে ডেকেছেন মনীষ ও ইন্দুকে। দুজনে এসে পর্যন্ত কথায় কথায় ডুবে থেকেছে। হাজারো ভাবে কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে সময় চলে কিন্তু কি যে আসল করণীয় তার সমাধান হল কই? হল কি সমস্যার সূত্র সন্ধান?

মনীষ ও ইন্দুর আগ্রহও তাই উষা দেবীর মূল বক্তব্যের বিষয়ে। তাঁর ইচ্ছে বীথিকে ফিরিয়ে আনা যে-কোনো ভাবে হোক।

উষা দেবী আঁচলে চোখ মুছতে থাকেন, মুছতেই থাকেন।

ডিং ডং ডিং ডং…

উষা দেবী বেশ যেন চমকেই উঠলেন কলিং বেলের ডিং ডং আওয়াজে। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখলেন অনিল চামেলী ও অন্য এক ভদ্রলোক। মনীষ ও ইন্দু দেখে চিনতে পারে অনিল ও চামেলীকে আগের একবার উষা দেবীর এই ঘরেই বসে থাকতে দেখে ছিল এবং সামান্য পরিচয়ও হয়। ইন্দুর মহানন্দিনীর অথবা বলা ভালো স্বর্গত মহানন্দাইয়ের ওকালতির ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ উকীল অনিল বাবু। চামেলী তারই স্ত্রী। তৃতীয় জনকে অচেনা লাগছে। কিন্তু উষা দেবী বেশ আত্মীয়তার সুরেই অভ্যর্থনা জানালেন।

—তোমাদের তো আসবার সময়ই হয় না। এসো এসো এই কি তোমার বন্ধু চঞ্চল বাবু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ওতো আসতেই চাইছিল না। আপনার চিঠিতে দারুণ একটা খবর রয়েছে যা লিখতেই পারেন না, এমন একটা কিছু। চঞ্চল সেই চিঠি পড়ে তবে এলো।

—চিঠি না দিয়ে যে আর উপায় ছিল না।

—সে তো বুঝতেই পারছি।

—এসো এসো বসা যাক আগে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

মনীষ ও ইন্দু নমস্কার বিনিময় করে। অনিল বলে—এই যে মনীষ বাবু ভালো তো? আবার দেখা হল, কি ব্যাপার হয়েছে আবার? বীথিকে দেখছি না?

—আর বীথি! সে যে কি করছিল তলে তলে তা কি আর আমি জানতে পেরেছি যে সবাইকে জানাবো।

চামেলী বলে ওঠে—কি বলছেন আপনি?

—যা বলছি ঠিক তাই।

মনীষ বলে ওঠে—আমরাও তো চিঠি পেয়ে কিছু বুঝি নি, এই তো শুনছি কিন্তু কি ভাবে যে কি হল তাতো বুঝছি না। উনি চঞ্চল বাবু আপনার বন্ধু তা এই মাত্র শুনেছি, তাই আশা করি উনি এই ব্যাপারে যদি দিদিকে একটু সহযোগিতা করেন তা হলে বড় ভালো হয়।

মনীষের মুখের কথা তখন প্রায় লুফে নিয়ে বলে উঠলো অনিল—

ঠিক বলেছেন মনীষ বাবু, আমি তো চঞ্চলকে সেই জন্তেই একেবারে সঙ্গে করে নিয়েই এসেছি।

—খুব ভালো করেছেন, খুব ভালো।

চঞ্চল খুব চুপচাপ ছিল লজ্জায়। তবু সে এবার বলে বসে—না না, আমি আর কি, কতটুকুই-বা পারি করতে।

মনীষ বলে—বিন্দু নিয়েই সিন্ধু হবে। আমরা তো আছিই। কোনো কিছু ভাবনার বিষয় হলেই আমরা থাকবো। এখন বীথির খোঁজটা নেওয়া প্রয়োজন দিদির কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিয়ে।

চঞ্চল চমকে ওঠে যেন। বলে—আমায় মাপ করুন। আমি…

—না না, সে কথা বললে তো হবে না। অনিল বাবু যখন সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তার মানে বেশ ভরসা রাখা যায় ভেবেই তো এনেছেন। আমার কপাল মন্দ হয়েছে তাই তো!

উষা দেবী থামলেন।

—অনিলের হটকারিতার বিষয় আর ভরসা রাখবেন না, আমি নিজের মাথা ব্যথায় নিজেই কোনো কিছু করতে পারি না, আবার আমার ওপর আস্থা।

অনিল বলে—ভাই চঞ্চল, এটুকু পারবি, কেন দর বাড়াচ্ছিস ?

উষা দেবী বললেন—আর কথা কাটাকাটিতে দরকার নেই, আমি বেশ বুঝেছি চঞ্চল বাবুকেই সব কথা আমায় বলতে হবে। কি সরল মুখ, কি সহজ চোখের চাউনি! আমার…

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই বলবেন। চামেলী এবার বেশ উৎসাহ নিয়ে তখনই বলে ওঠে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। ইন্দুও আসতে আসতে বলে।

চঞ্চল সবার দিকে অবাক চোখে চেয়ে দেখে তার পর উষা দেবীর দিকে চেয়ে থাকে। উষা দেবীও চঞ্চলের দিকে করুণ দুচোখে তাকিয়ে থাকেন, তাকিয়েই থাকেন।

অনিল, মনীষ, চামেলী, ইন্দু সবাই তাকিয়ে উষা দেবীর দিকে। তার পর চারজনে পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিস্তব্ধ ক্ষণটিকে উৎরিয়ে চলে।

চামেলী বলে—আমরা এবার যাই।

উষা দেবী যেন নিজের সম্বিত ফিরে পান। বলেন—একটু বসে শুনে যাও বীথির, না ওর নাম মুখে আনতে ইচ্ছে করছে না, কি করলে শেষে, বংশের মুখ পোড়ালে। একটা ঢং করে চিঠি লিখে গিয়েছে। আনছি সেটা পড়ে দেখো।

উষা দেবী বসার ঘরের থেকে বাড়ির ভেতরে যাবার দরজা দিয়ে চলে গেলেন। চঞ্চল চেয়ে দেখছে উষা দেবী পাছা দুলিয়ে ঢুকে গেলেন ঘরে!

অনিল বলে উঠলো—কি চঞ্চল?

চামেলী বললে শুধু—এবার আমাদের চলে গেলেই তো হয়। চঞ্চল বাবুকে কিছু একটা বিহিত করতেই হবে। ভীষণ কষ্টের সংবাদ এ যে।

ইন্দু বললে—চঞ্চল বাবু, এটুকু নিশ্চয় নিজের মনে করে করবেন। উষা দেবীর তো আর কেউ রইল না। এক বীথি ছিল, দেখুন যদি খোঁজ করে যোগাযোগ করা যায়। আমার ননদ আবার শুনলে কি বলেন দেখি।

—না না, সে আর কি বলবে। চঞ্চল বাবুর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখবো, তা হলেই হবে।

মনীষ বেশ আশ্বস্ত হয়ে বলে বসলো।

চঞ্চল অবাক হয় আবার। সে বলতে থাকে—সে কি আপনিও এতটা আমার ওপর ভরসা রাখছেন কি করে? আমি তো বুঝতে পারছি না। দেখি চিঠিতে কি হদিশ পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। অনিল বলে বেশ তৃপ্তি নিয়ে।

উষা দেবী ঘরে ঢুকলেন। এবার গায়ে দিয়েছেন একটা সাদা ব্লাউজ এবং সায়াটাও।

এই পরিবর্তনটা ইন্দু ও চামেলীর চোখে ধরা দিয়েছে তাই চোখ চাওয়া-চাওয়ি হতেই দুজনে একটু মুচকি হাসে; মনীষ ও অনিল চঞ্চলের চোখের দিকে চাইতে থাকে।

উষা দেবীর পেছনে একটা লোক চার প্লেট মিষ্টি ও চার গেলাস জল নিয়ে আসে। উষা দেবী বললেন—কি আর দিই। একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে সকলকে। তার পর চিঠিটা পড়ে দেখা হোক।

মনীষ বললে—বেশ বেশ তাই হবে। আজ চঞ্চল বাবুর সম্মানে—

—না না, সে কি, কি বলছেন!

চঞ্চল প্রতিবাদের সুরে কথা বলতে গিয়েও তার কথা সব বলা হয় না।

উষা দেবী তখনই বলে বসলেন—প্রথম এলেন। এবার তো প্রায়ই আসতে হবে।

চঞ্চল অবাক চোখে আবার চাইল উষা দেবীর দিকে। অনিল চাইল চামেলীর দিকে এবং মনীষ ইন্দুর।

দীপককুমার সমস্ত ঘটনা শুনলে চঞ্চলের মুখে।

চঞ্চল বেশ সহানুভূতি এবং সাগ্রহ নিয়ে সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে উষা দেবীর মানসিকতা ও তার কন্যা বীথির পালিয়ে যাওয়ার বিষয় বলছে। এখন দীপককুমারের সঙ্গে আবার আলাপ হওয়ার পর থেকে চঞ্চল সব কথা ঠিক ঠিক ভাবে না বললে যেন তৃপ্তি পায় না। ছাত্রজীবনের আলাপের পর এখন আলাপ যেন আরো গভীরতায় এসে গিয়েছে আরো অন্তরঙ্গতার মধ্যে উপনীত হয়েছে। কারো মনের আগলই যেন থাকার প্রয়োজন হয় না। সব কথা বলা চলে, সব কথা শোনা চলে।

দীপককুমার বললে—তা বেশ, আলাপ হয়েছে উষা দেবীর সঙ্গে সেটা ভালোই, কিন্তু তাঁর পালিয়ে যাওয়া মেয়ের সন্ধান করার ফরমাসটা অনিল চাপিয়ে দিল তোর ঘাড়ে! খুব মজা করেছে দেখছি। অবশ্যই এটা অনুসন্ধান করার মতো। চিঠিতে কি লিখেছে?

—হ্যাঁ সেই চিঠিও এনেছি, এখন পরামর্শ করে এগোতে হবে।

—কি চিঠি দেখি, কার সঙ্গে প্রেম করেছে তা বলেছে কিছু?

—চিঠিতেই সব বলেছে।

—তা হলে তো মিটেই গিয়েছে।

—না ঠিক মিটে যায় নি, মেটাতে হবে কিভাবে তাই নিয়েই আমাদের এখন ভাবনা।

—অনিল দেখেছে চিঠি?

—হ্যাঁ, এবং মনীষ বাবুও।

—তিনি কে? নামটা যেন কেমন লাগছে শুনতে···

—উষা দেবীর ভাইয়ের শ্যালক। পুরো নাম মনীষীমোহন মৈত্র।

—আরে একেবারে ম. ম. ম. যে···

—তা যা বলেছিস, বাপের দেওয়া নাম বটে। কুটুম···

—ওরে বাবা, খুব কাছের কুটুম। তা হলে তাঁর আত্মীয় স্থানীয়, তা তিনি কি বলছেন?

—কি আর বলবেন। অনিল এমনভাব দেখিয়েছে উষা দেবীর কাছে যেন আমি এসব কাজে খুব পোক্ত, মনীষ বাবুও তাই ভেবেছেন।

—তা ভালোই করেছে। তোর একটা হিল্লে করে দিয়েছে বলা চলে। আর বাউণ্ডুলে থাকিস নি।

—খুব হয়েছে, নে চিঠি পড়ে দেখ।

দীপককুমার চিঠি পড়তে থাকে। বীথি লিখছে—'মা জানি তুমি আমার ওপর খুব রাগ করবে কিন্তু তবু যে চিঠি লিখে যাচ্ছি তার কারণ তোমার সঙ্গে আমি তো সম্পর্ক না রেখে থাকতে পারবো না তাই। তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না মা, লক্ষ্মী মা আমার! আমি সোনাদার সঙ্গে যাচ্ছি তাঁর একটা চাকরি করে দেবে আমার বান্ধবী হেনার স্বামীভদ্রলোক। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে রাখি আজ আমরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে চলে যাচ্ছি কোলিয়ারী দেখতে। তোমার জন্যে চিঠিতে এখন অনেক, অনেক চুমু রেখে যাচ্ছি মা আমার, তুমি লক্ষ্মীটি কিছু মনে করো না। চিন্তা করো না কিছু। ইতি তোমার বীথি'

চিঠি পড়া শেষ হতে চঞ্চলের দিকে চাইল দীপককুমার।

চঞ্চল বললে—কি? কিছু বোঝা যাচ্ছে? কোথায় গেছে?

চঞ্চল প্রশ্নভরা চোখে চাইল দীপককুমারের দিকে।

দীপককুমার তখন খুব মৃদু হেসে হেসে শুধু বললে—ডিটেক্‌টিভের এই কাজ করতে ভার পেয়েছিস তুই আর হদিস বলে দিতে হবে আমাকে, এটা কেমন কথা শুনি?

—না ভাই, আমি তো একেবারে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। পুলিশে গিয়ে খবর দিয়েছি আজ সকালে তবে চিঠিটা তাঁরা দেখতে চেয়েছেন তাই আবার অফিসের ফেরৎ গিয়ে এই চিঠিটা নিয়ে আসছি। কাল তো অত ভাবি নি ছাই যে পুলিশের বড়বাবু আবার মেয়ের মাকে লেখা চিঠিটা দেখতে চাইতেও পারেন।

—তা ভাববে কেন বল, সন্ত বিধবার সুনজরের মধ্যে যদি থাকো মন্দ কি?

—কি যে বা নয় তাই বলছিস ভাই। থাক আমার আর এ বিষয়ে সাহায্য দরকার নেই ঢের হয়েছে। আমি চলি।

—আরে, আরে, চঞ্চল চটছিস কেন? তুই আর দেরি করিস নি, অবশ্যই এখন যা উষা দেবীর বাড়ি···

—ফের ঐ সব কথা!

—না না, আমি বলি কি শোন।

—আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার আর এ বিষয়ে শোনার কি সময় আছে?

—তার মানে? কি হলো তোর?

এমন সময় ঘরে এসে ঢোকে অনিল ও চামেলী। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই অনিল বলে ওঠে—তার মানে তো খুবই সোজা। শ্রীমান চঞ্চল এখন হাবুডুবু খাচ্ছেন একেবারে ফুটন্ত শুভ্র যৌবনার লাবণ্যে।

—আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি, তোমরা বেওয়ারিশ ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যার যা খুশি বল, আমি ওসব শুনতে চাই না।

চামেলী কথা কটা বেশ জোর গলায় বললে।

—সেই ভালো, সেই ভালো, মায়ের সঙ্গে কথা বললে তিনিও খুব খুশি হবেন। একা একা থাকেন।

দীপককুমার সহজ ভাবেই কথাটা বললে। চামেলীও এই সহজ ভাব নিয়েই দীপককুমারের মায়ের সঙ্গে গল্প করতে বাড়ির ভেতর দিকে চলে গেল।

—চিঠিটা পড়ে কি মনে হল?

অনিল প্রশ্ন করে দীপককুমারকে।

দীপককুমার বললে—কি করে জানলি?

—জানবার যার প্রয়োজন সে ঠিকই জানতে পারে।

চঞ্চল বললে—নিশ্চয় আমাদের কথা ওঘরে থাকতে থাকতে কান খাড়া করে শুনে থাকবে।

—ঠিক ঠিক, তাই হবে।

—সে যাই হোক, আসল কাজের কথায় আসা যাক। উষা দেবীর কন্যা বীথির সন্ধান চাই।

—চাই তো বললেই হয় না, চোখ কান খুলে রাখলে তবেই সন্ধান পাওয়া যায়।

চঞ্চল এ সব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বেশ চিন্তিত ভাবেই বসে থাকে। দীপককুমারের চোখে ধরা গেলেও বিশেষ কিছু প্রশ্ন না করে কথাই বলে গিয়ে

স্বাভাবিক মেজাজ ফিরিয়ে আনতে চায়। তাই বললে ফের—যাকে বলে অনুসন্ধানীর চোখ চাই।

—আর কত চোখ কান খুলে রাখা যায় ভাই, তা হলে যে চঞ্চলের মতো অবস্থা হবে। সন্ধান বা অনুসন্ধান যাই বলা হোক।

—তার মানে?

অনিলের কথায় অবাক হয়ে দীপককুমার প্রশ্ন করে বসে।

—আমি মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসছি ভাই। চিঠিটা দীপককুমারের কাছেই থাক আমি আর এর মধ্যে থাকছি না।

চঞ্চল বেশ রাগের বসেই কথা কটা বলতে থাকলো।

অনিল বলে ওঠে—না না। সে কি কথা?

—তা মায়ের কাছে যাবার আগে অবশ্যই দেখা করে যাবি, কিন্তু এখন হারানো কন্যার সন্ধানের কি হবে?

—আমি আর ও বিষয়ে কিছুই জানতে চাই না।

—এটা চঞ্চল অভিমানের কথা হয়ে যাচ্ছে যে?

দীপককুমার বললে।

চুপ থাকতে থাকতে অনিলও বললে—ঠিকই তো চঞ্চল, তোর এটা অভিমানের কথা হচ্ছে।

—আর অভিমান! আজ চিঠি এসেছে, বাবা দারুণ অসুস্থ এখনই যেন রওনা হই। দীপককুমার আর ভাই অনিল যা হয় ব্যবস্থা কর উষা দেবীর মেয়ের সন্ধানে আমি তো আজ রাত্রির ট্রেনেই রওনা হব দেশের জন্যে। দেখি আবার বাবার কি হল! সেখানে মা একা। তিনি যে কি করছেন তাই ভাবি।

—সে কি চঞ্চল, তোর এমন একটা দুঃখের খবর রয়েছে অথচ এতক্ষণ কোনো কথাই বলিস নি!

দীপককুমার বেশ সহানুভূতির সঙ্গে কথাগুলি উচ্চারণ করে থামলে। হয় তো নিজের পিতৃবিয়োগের অসহায়তা বোধের অভিজ্ঞতায় চঞ্চলের জীবনে তেমন কিছু এখনই না এলেই ভালো, এমনটাই ভাবছে।

অনিল বললে—কিছু মনে করিস নি চঞ্চল, আমি তোর মনের এমন অবস্থায় ঠাট্টা করেছি এতক্ষণ।

—না না। তোরা কি করে বুঝবি। আমার আজই রওনা হতে হবে। আজ চলি একবার মায়ের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।

চঞ্চল বাড়ির ভেতরের দিকে চলে গেল।

দীপককুমার আর অনিল মুখোমুখি বসে আছে। এমন সময় এসে গেল স্বর্ণ রায় ও শর্মিলা।

দুজনের চোখে একটা উদাসিনতা ও বিষণ্ণতা। শর্মিলার ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় কোঁচকানো কপালের রেখায়।

অনিল অবাক চোখে তাকিয়ে। শর্মিলার প্রতি অনিলের দৃষ্টি যেতেই মনে করতে সে কিছুতেই পারলে না ট্রামের মধ্যে এক দারুণ মজার পরিবেশে দেখা হয়। তবে আগে কোথায় যেন দেখেছে দেখেছে, ভাবছে অথচ আচমকা প্রথম দেখাতেই তো তা জিজ্ঞাসা করা যায় না।

—আসুন আসুন।

দীপককুমার স্বাগতসম্ভাষণ জানায় জোড় হাতে নমস্কার জানিয়ে।

স্বর্ণ রায় বলে—আমরা বাইরের বসার ঘরে বসি, আপনি কথা বলুন।

—না না, এ আমার বন্ধু অনিল। আপনারা এখানেই বসুন। আপনাদের সঙ্গে তো সময় করাই ছিল।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। শর্মিলা বসো তা হলে।

স্বর্ণের কথা শেষ হতেই অনিল বললে আমি বাইরের ঘরে বসি ততক্ষণ! এঁদের সঙ্গে কাজের কথা হয়ে যাক ভাই।

—সে হবে। এখন চঞ্চলের প্রস্তাবে বেশ চিন্তিত রয়েছি। ওর বাবার তেমন তেমন নিশ্চয় কিছু একটা বাড়াবাড়িই হয়েছে না হলে চিঠিতে অমন ভাবেই বা লিখবেন কেন যে পত্রপাঠ দেশের দিকে রওনা হওয়ার কথা!

—আরে থাক ওসব কথা। হয় তো চঞ্চলের জ্ঞাতি পক্ষের অসৎ ব্যবহারে উত্তক্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। নিশ্চয় সে কথা চিঠিতে না লিখে অসুস্থতার কথাই লিখেছেন।

—সে কি হয়? তবে সে যাই হোক এখন উষা দেবীর কন্যা বীথির বিষয়ে কি হবে? সেটাও তো ভাবা দরকার।

—ঠিক কথা ভাই দীপক। অনিল বলে তখন—একটা কিছু করতেই হবে আমাদের। বীথির মাকে লেখা চিঠিতে মনে হচ্ছে ঐ বান্ধবী হেনার আশ্রয়েই রয়েছে বোধ হয়। আমি বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে থাকায় সেদিন তেমন মন দিয়ে চিঠিটা পড়াই হয় নি। শুধু তাই কেন, ঝুটঝামেলার মধ্যে মন বসাতেও তেমন চাই নি।

—সে কথা তো বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তবে সেটুকু চঞ্চল কেন বুঝলো না তাই ভাবছি।

—থাক ওর কথা। আমাদেরই কিছু একটা করতে হবে উষা দেবীর জন্যে, সে যাই হোক। অবিবাহিত হওয়ায় মহিলা-ঘটিত বিষয় হলেই চঞ্চল আগে থেকেই দিশেহারা হয়ে যায় তো, তাই···

—তা তো বটেই।

দীপককুমার ও অনিলের কথার মধ্যে শর্মিলা তো নয়ই সুবর্ণও কোনো কথা বলে নি এতক্ষণ। এবার নিজে থেকেই সুবর্ণ প্রশ্ন করে—কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, কি হয়েছে বলুন তো? উষা দেবীর কথা বলছেন, ইনি কি হাজরার দিকে থাকেন।

—সে কি! আপনি জানলেন কি করে?

অনিল প্রশ্ন করে এবং দীপককুমার তখন প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে থাকে সুবর্ণের মুখের দিকে।

সুবর্ণ বলতে থাকে—না না, তেমন কিছু নয়। এই কিছু দিন আগে শর্মিলার বাড়িতে মনীষ মৈত্র ও তাঁর স্ত্রী ইন্দু দেবীকে আসতে দেখি এবং আলাপও হয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্দু দেবীই তো বলেছেন উষা দেবী হচ্ছেন তাঁর ননদের ননদ। শর্মিলা কথা বলে।

দীপককুমার বেশ উৎসাহিত ভাবে প্রশ্ন করে—তা হলে তো আপনি চেনেন দেখছি।

—না না। আমি কাউকে চিনি না। কি করে চেনা হল বলুন। এক নামে তো দুজনও থাকতে পারেন। আপনারা যে উষা দেবীর কথা বলছেন তিনি আর ইন্দু দেবীর মুখে শোনা উষা দেবীর মধ্যে শুধু তো নামের মিলটুকুই থাকতে পারে আর সবই আলাদা আলাদা হতে পারে। হতেই পারে।

—ছবি দেখলেও চিনতে পারবো না আমরা কারণ চোখে দেখা হয় নি শুধু নামটুকু কানে শোনা হয়েছিল একবার কি দুবার।

দীপককুমার বলে বসলেন—বা রে বা, আপনাদের তো স্মরণ শক্তি খুবই প্রখর দেখছি। ঠিক মনে করে রেখেছেন।

অনিল বললে—তা যা বলেছিস। ঠিকই তো···

—না না, তেমন কিছু নয়। তবে ভোলার মতো ভুলতে পারা যায় কি সব সময় সব কিছু।

কথাগুলো যেন নিজের মনেই বলে ফেলে সুবর্ণ রায় অবাক হয়ে যায় এবং একবার দীপককুমারের ঘরে টাঙানো তার মৃত স্ত্রী পূরবী দেবীর বড় ফটোটার দিকে তাকায়।

দীপককুমার একবার দেখলে সেই দিকে কিন্তু তার চোখ সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসে শর্মিলার চোখে চোখে।

অনিল বলে—আপনি যে মনীষ মৈত্রের ও তাঁর স্ত্রী ইন্দু দেবীর কথা বলছেন তা ঠিকই তারা উষা দেবীর আত্মীয় ও আত্মীয়া হন।

—তা হলে তো ঠিক হয়েছে। সেই উষা দেবী আর আমাদের উষা দেবী একই হল। কিন্তু আমার দীপ্তেন্দু তো এলো না দীপকবাবু?

—চুপ করো, স্থির হও শর্মিলা।

সুবর্ণ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে ওঠে।

শর্মিলা রুমালে চোখ মোছে।

সুবর্ণ তখনও আবার পূরবীর ছবির দিকে চায়।

দীপককুমার বেশ যেন বিচলিত ভাবেই শর্মিলার ভাবান্তরটা লক্ষ্য করে।

অনিল বলে—উষা দেবীর বিষয়ে তা হলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হেনার সন্ধান করতে হয় ভাই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।

দীপককুমার যেন আত্মস্থ হয়ে বলে ওঠে। ততক্ষণ শর্মিলার দিকে মনের প্রচ্ছন্ন গতি প্রবাহিত হচ্ছিল কি?

দীপককুমারের মনে প্রশ্নও জাগে। তবু সব দিক সামলে নিতে তাই বলে —যদি বলিস আমিই না হয় যাই চল তোর সঙ্গে।

এমন সময় শর্মিলা হঠাৎ বলে বসে—সে কি? আমি যে এসে গেছি। আপনি চলে যাবেন। না না, তা হবে না।

—আপনার সঙ্গে আগে কাজের কথা হবে, তবে অন্য সব।

দীপককুমারের এমনি উত্তর পেয়ে শর্মিলা তৃপ্তি বোধ করলেও অনিল যেন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়। তা কথায় প্রকাশ না করে সে শুধু বলে—তা হলে এক কাজ করি আমিই গিয়ে খোঁজ আনি হেনার স্বামীর ঘর কোথায়।

—তা ঠিক। কিন্তু এসব কাজে এক মাথায় সব কিছু ঠিক ঠিক করা যায়

না। পরামর্শ প্রয়োজন হয় ভাই। বেশ বুঝে সুজে এগোতে হবে। তুমি উকীল হলেও এ বিষয়ে একটু দরদ দিয়ে করতে হবে, মুদ্রা তো নেই···

—কি যা তা বলছিস ভাই।

আবার স্বর্ণ রায় নিজে থেকেই বলে বসে—যদি কিছু মনে না করেন আমি যেতে পারি অনিল বাবু আপনার সঙ্গে।

দীপককুমার শর্মিলার দিকে আবার প্রশ্নভরা চোখে চায়। সে বলে—কি বলছেন এখন বলুন আপনি—

—আমার বলার আর আছে কি! আমি···

শর্মিলার কথা আর শেষ হয় না। অনিল বলে ওঠে—তাতে কি হয়েছে, খুব ভালো হল, চলুন স্বর্ণবাবু দয়া করে চলুন। বড় উপকার করা হবে তা হলে একজন সদ্য বিধবা ভদ্রমহিলার এই দারুণ দুর্দিনেই বলছি। একমাত্র সন্তান তাঁর বীথি, কোনো খোঁজ নেই কদিন থেকে। উষা দেবী প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতো অবস্থায় এসে যাবেন কারো সহায়তা যদি না পান।

চমকে বলে ওঠে দীপককুমার—সে কি?

স্বর্ণ রায় বললে—না না, সে সব কেন বলছেন, চলুন আমি যাব।

—সে কি? আপনি, না না, সে হয় না। আমি কিছুতেই যেতে দেবো না, আপনাকে যেতে দেবো না।

—কিছু ভেবো না শর্মিলা। দীপক বাবুর কাছে তুমি কাজের কথা আরম্ভ করো আমি আর অনিল বাবু ততক্ষণ যাই একবার উষা দেবীর মেয়ের সন্ধানে।

—কি কাজের কথা!

শর্মিলার এই রেগে প্রশ্ন করার উত্তরে স্বর্ণ রায় শুধু বললে—শরীরের মনের ভালোমন্দের কথা আর কি?

—আর দরদে কাজ নেই, সবাই···

দীপক বললে—তাই তো উষা দেবীর মেয়ের খোঁজটা?

অনিল বলে—না না, আগে তাঁর মেয়ের বান্ধবীর স্বামীর বাড়ির সন্ধান এবং সে সব বিষয়ে উষা দেবীর কাছ থেকেই এখন তা সংগ্রহ করতে হবে আমাদের।

—ঠিক ঠিক। তাই হবে, চলুন।

স্বর্ণ রায়ের কথা শুনে দীপককুমার বলে—অনিল, কি করবি বল?

—আমি আর কি বলবো, শর্মিলা দেবী যদি অনুমোদন করেন তো—

—আমি অনুমোদন করার কে? কি বলছেন?

শর্মিলার কথার স্বরটা একটু কেমন কেমন যেন শোনালো সকলেরই।

স্বর্ণ আর কথায় কথা না বাড়াতে দিয়ে বলে ওঠে—যে কাজ আগের সে কাজ আগেই করুন অনিল বাবু। এ বিষয়ে খুব দ্রুত কাজে এগোতে হয়, না হলে নানান রকম জটিলতা এসে যেতে পারে।

—ঠিকই বলেছেন স্বর্ণ বাবু। অনিল এগিয়ে যাবার কথা ভাব রে, এই নে সেই চিঠিটা যেটা বীথি তার মাকে লিখে রেখে গিয়েছে।

—দে তা হলে, যাই। চামেলীকে বলিস আসছি···

অনিলের সঙ্গে স্বর্ণ রায়ও ঘর থেকে বাইরে চলে যায়। পর্দা সরিয়ে দরজার চৌকাঠ পেরোতে যাবার সময় আর-একবার পূরবী দেবীর বড় ফটোটার দিকে তাকায়। মুখ ফিরে করুণ দুচোখে চেয়ে দেখেই চলে যায় সে তখন অনিলের সঙ্গে।

এবার শর্মিলার যেন স্বর্ণ রায়ের এই বিশেষ ভাবে চেয়ে দেখা নজর এড়িয়ে গেল না। তাই জিজ্ঞেস করে জানলো, কার ছবি ওটা। শুনে অবশ্য মনটা বেশ করুণায় ভরে রইল। দীপককুমারের জীবনকথাকে আর জীবনের করুণ কাহিনীকে শুনতে মনও যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

দীপককুমার আর শর্মিলা কথা বলছে। কথা বলছে আপন মনের গভীরে ডুব দিয়ে। ফেলে আসা সদ্য-অতীত অথচ অন্তরঙ্গ স্মৃতি। অনেক সময় মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকা হয়ে ওঠে অন্তরের আপন অধিবাসীর মতো। তখন আর কেউ ঢাকা দিয়ে মনকে রাখেন না। পরস্পরের মনখোলা প্রাণঢালা আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। পর্দা টানা থাকলে কেন্দ্রীভূত অতৃপ্ত বা অপ্রকাশ্য ক্ষতস্থানটি উদ্ভাসিত তো হবে না। সহজভাবে এবং সমগ্রভাবে সুপ্রকটিত মানসিকতা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীর হবে বিশ্লেষণ। তাদের মনের তলায় ঢাকামন কখনো চেতন কখনো অবচেতন। এতদিন এদেরই বলেছে দীপককুমার আধাবিকৃত মেয়েপুরুষ। এবার শর্মিলার সঙ্গে অনেক দিন বৈঠক হয়েছে, কথা কয়ে কয়ে অবচেতন মনকে যেন ধরতে পারছে দীপককুমার।

ধরতে পারছে নিজের কাছে নিজেকেও।

শর্মিলাও কি ধরতে পারছে নিজেকে?

দীপককুমার প্রশ্ন করে—মনটা কেমন আছে?

—আর মনটা! একা, ভীষণ একা…

—সবাই একা।

কথাটা দীপককুমার বলে ফেলেই ভাবে তাই তো এমন কথা কেন বলা হয়ে গেল। শর্মিলা তো তার কাছে রোগিনী মাত্র। নিজের একাকী মনকে কেন তুলে ধরবে? তবু বলা হয়ে যায়।

শর্মিলার অবাক চোখে প্রশ্ন—আপনিও!

—নিশ্চয়, ঐ তো পূরবী, আমার গৃহিনী চলে গেল। হঠাৎ চলে গেল আমায় রেখে।

—কোথায়?

—এই পৃথিবীর থেকে।

—সে কি? কতদিন আগে?

—এই তো এক বছর হবে।

—কি হয়ে ছিল তাঁর!

—সে অনেক কথা, এখন থাক, আপনার কথাই হোক।

—না আমি শুনবো, আমায় বলুন।

শর্মিলা ভীষণ আবেগ ভরে অন্তরঙ্গ সুরে বলতে থাকে—আমায় বলতেই হবে, আপনি কেন আমায় পরপর ভাবেন। আমি তো আপনায় সব কথা বলি। আপনি কেন বলেন না। আজ আমায় বলুন না, লক্ষ্মীটি বলুন। পূরবীদির কি হল? কেন চলে গেলেন, কেমন করে। কেমন করে চলে গেলেন?

—সে সব কথা না শুনে, শুহুন বলি আপনার মনের কথা।

দীপককুমার এমন উত্তর দেওয়ায় শর্মিলা বলে বসে—তা হলে আমি আর আপনাকে কোনো কথা আমার বলবো না। আমি আর আসবো নাই বরং সেই ভালো।

—না না, এমন কথা উঠছে কেন। অভিমানের কথা হয়ে যাচ্ছে যে। তার থেকে বলি মনটা যখন আশ্রয় খুঁজছে তখন আশ্রিতই হোক না।

—আবার কি কথা বলছেন?

—ঠিকই কথা। যা এখন বলা দরকার তাই তো শুধু বলছি।

—না না, তা হবে না পূরবীদির কথা চাপা দেওয়া চলবে না অন্ত কথা বলে। আমি আজ সব শুনে তবে উঠবো। আপনি কিন্তু ভীষণ দুষ্টু, খালি আমাকে অন্ত কথায় ভুলিয়ে রাখতে চাইছেন। সেটি আমি কখনোই হতে

দেবো না; দেবো না, দেবো না। এই বসে থাকছি, বলুন, শীগ্‌গীর বলুন। দেখবেন আপনার হাতে এমন চিম্‌টি কাটবো যে তখন রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

—রক্তারক্তি আমার না আপনার ?

—কি বলছেন ?

—সেটা কি আপনার পক্ষে ভালো হবে ! স্বর্ণবাবু শুনলে কি ভাববেন বলুন তো ?

—তিনি কি ভাববেন না ভাববেন সে নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই অথচ দেখছি আপনার ভাবনা এলো কেন শুনি ! আহা, যত বাজে কথা। স্বর্ণ বাবু কি ভাববেন ?

শর্মিলা তখন মুখ বিকৃত করে দীপককুমারের স্বর অনুকরণে শেষ কথা উচ্চারণ করলে। এই বিশেষ বাচনিক ভঙ্গিমাটির অর্থ বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল দীপককুমারের কাছে। শর্মিলার মুখেয় আদলে ধরা রইল মনের ছবি। যে মন দীপ্তেন্দুকে আশা করে যৌবনের প্রথম ফুল নিয়ে উপচার রচনা করে। তার পর, তার পর দীপ্তেন্দু ট্রেনের কামরা থেকে ছিনতাইকারিদের দ্বারা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও প্রাণরক্ষা করে নি, বোধ হয় প্রাণ দিয়েছে, মান নিয়ে প্রাণ দিয়েছে। বীরের মতো। দীপককুমার এ কাহিনী শুনে অবাক হয়ে যায়। বলে —ঠিকই তো খবরের কাগজে এমন ঘটনা পড়েছি। তখন মনটা তো বীরের মতো আত্মবলিদানকারীর প্রতি নীরবে শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছে। আদর্শবান পুরুষ তিনি। সকলেরই অনুকরণীয় তিনি।

—কি বলছেন আপনি ? অনুকরণীয় ! আমার যে কি হবে, আমি যে বড় আশা নিয়ে পথ চেয়ে থেকেছি। সে আসবে, অনেকদিন পর সে আসবে। কিন্তু বুড়ো সাধুটি কি দারুণ কথা শুনিয়ে গেলেন। আমি যে আজও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না। কেমন করে পারবো। মানুষ যে এমন মরিয়া হয়ে গিয়ে একাই সাধুর হাতের ডাণ্ডা নিয়ে এতগুলো গুণ্ডালোকের দিকে এগিয়ে যায় তা ভাবতে পারি ! আপনিই বলুন এমনও সাহস বাঙালীর ঘরেই ছিল ! অবাক, না আশ্চর্য, না কি হতবাক করে দিচ্ছে আমাকে।

—সত্যিই মানুষের মধ্যে যে কি দুর্জয় শক্তি ক্রিয়াশীল তা নিজেই জানা যায় না, তা অপরে কোন ছাড়। আপনি কেন, দীপ্তেন্দু বাবুও কি জানতেন তার মধ্যে অমন একটা দুঃসাহাসিক বীরের বলিষ্ঠ বাহু প্রস্তুত হয়ে আছে, তিনিও তো তা জানতেন না।

—কিন্তু সে তো আমায় জানতো। আমি যে চিঠিতে সব খুলেই লিখি—এসো এসো এসো। আমি আজো আছি, তেমনি ভাবে পথের দিকে চেয়ে। সে রওনা হল যে ট্রেনে সে ট্রেন স্টেশনে পৌছুল কিন্তু সে তার স্টেশনে পৌছিয়ে গেলো কি?

—সে কথার উত্তর বড়ই কঠিন শোনাবে এখন।

—তবু বলুন। আমি বুক বেঁধেছি। সব শুনবো, শুনতে পারবো। আমার আর না শোনার মতো কি রইল বলুন। দীপ্তেন্দু...

—সে তার জীবনের একেবারে বুঝি-বা শেষ স্টেশনে পৌছিয়ে গেল আমার পুরবীরই মতো।

দীপককুমার স্থির দৃষ্টিতে পুরবীর ছবির দিকেই চেয়ে থাকলো। শর্মিলাও একবার পুরবীর ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে দেখতে লাগলো দীপককুমারের মুখ—যে মুখের ছবিতে গভীর বেদনার ছায়া, বিষণ্ণ আর্তি যেন হাহাকার করছে ঠিক তারই মতো একটা হৃদয়ভরা একাকী থাকার ভারবহ নির্জনতার শান্তিতে কিন্তু সে শান্তি সান্ত্বনাহীন, তৃপ্তিহীন, দীপ্তিহীন; শুধুই যেন কালোর কালিমা-ভরা, দৃষ্টি চলে না নিজের বুকের মধ্যে যে ব্যথাটা রয়েছে যা তাকে যেন শুধু গুমড়ে মারে, গুমড়ে মারে।

দুজনের চোখে তাৎক্ষণিক ।স্থরতা।

চম্‌কে ওঠে চঞ্চল দেশে গিয়ে।

প্রথমেই তার চোখে খারাপ লাগলো তাদের সামান্ত বাঁশের বেড়ায় নানান ধরনের লতানো গাছগুলো মরে গিয়েছে দেখে। কলাগাছ যে কটা রয়েছে পুবদিকের জমিতে তার পাতাগুলো না থাকার মতোই। শিউলি গাছটাই যা আছে। এখন শরতের আগমনী তাই অ .ক শিউলি ফুল ফুটেছে, গাছ-তলায় ছড়িয়েও রয়েছে। বেল ফুলের গাছগুলোর শুকনো ডাল দুচারটে এখানে ওখানে জমিতে খ্যাংড়া কাঠির মতো উঁচিয়ে রয়েছে মাত্র। রক্তজবার গাছে একরাশি ফুল দুলছে। তবে তার পাশেই যে অপরাজিতা লতানো ছিল আমগাছে তা আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমের গাছটাও যেন শুকিয়ে আসছে। এ সবই চঞ্চল .ভোরের বেলায় ট্রেন থেকে নেমে দেশের বাড়িতে পৌছিয়ে দেখলে।

কেউ বাইরে নেই। সামনের দরজা ভেজানো। এত ভোরে মা আর

উঠবেন কি করে? রুগ্ন বাবাকে নিয়ে হয় তো রাত জেগে কাটিয়েছেন! কি কষ্টটাই না তিনি ভোগ করছেন। চঞ্চলের মনটাও বেজায় বেদনার্ত হয়ে ওঠে। শৈশবের স্মৃতি নিয়ে এই দেশের কত কিইনা তার প্রিয় মনে হত। মায়ের আদর, বাবার চঞ্চল নামে ডাকা, ঠাকুরমার কাছে বসে মুড়ি খাওয়া। গ্রামের সুবল, ভগবান, ভৈরব, বংশী—কত ছেলে ছিল খেলার সঙ্গী। এই তো চঞ্চল মনে করতে ঠিক পারছে শিউলির গাছ তলায় বসে বসে কত বার মায়ের পূজোর জন্যে শিউলি ফুল তুলে এনে দিয়েছে মাকে। বাবা কি সব সংস্কৃত পুঁথি পাঠ করে ভোরবেলায় দিনের কাজ আরম্ভ করতেন। তাঁর পাঠ শুনতে গ্রামের দুএকজন বৃদ্ধও আসতেন। তিনিও গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠ করতেন অনেক সময়ই। তাঁর শিষ্যও ছিল অনেক। ঠিক বলতে কি গোঁসাই ঘরের গুরুগিরি চঞ্চলের ভালো লাগে নি। তাই কলকাতায় পড়ালেখা করে চাকুরিজীবীর জীবনযাত্রা হল চঞ্চলের। চঞ্চল বেশ মনে করতে পারছে বাবা খুবই অসন্তুষ্ট হন গোঁসাই বংশের জাত-ব্যবসা ছেড়ে চাকুরিজীবীর জীবনযাত্রাকেই চঞ্চল বেছে নেওয়ায়।

মাও বেশ ক্ষুণ্ন হন মনে মনে। তবু চঞ্চল আজ সে সব কথা মনে মনে তোলপাড় করেও দেশের বাড়িতে এসেছে। এসেছে তার বাবার অসুস্থতার সংবাদে হঠাৎ কাল কলকাতায় তার কাছে গিয়েছে তাই। কি হল বাবার?

—কি সুন্দর সাদা পাতিহাঁসটা! পশ্চিমের পুকুরের জলে বেশ তো মুখ ডুবিয়ে মুখ ডুবিয়ে খেলে চলেছে!

চঞ্চলের ভালো লাগলো। পুকুরের পাড়ে এখনো অজস্র সবুজ ঝোপের মতো বুনো গাছ হয়ে রয়েছে—পুকুরের জলে ডুব দিয়েছে কত তাদের লতা। একপাশে অনেকটায় পুকুরের জল কচুরিপানায় ছেয়ে গিয়েছে। যে জায়গায় স্নান করা কাপড় কাচা বা কলসী নিয়ে জল তোলা হয়—সে জায়গাটুকুতেই যা কচুরি পানা নেই। তার মানে গজাবার অবকাশ পায় নি বা উৎপাটিত করা হয়েছে। সেই স্বল্পপরিসরের স্বচ্ছবৃত্তেই সাদা পাতিহাঁসটি দিব্বি খেলছে। মুখ ডুবিয়ে তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠছে সরু বেঁকানো সাদা গলা তুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে। ভারী ভালো লাগলো চঞ্চলের এমন হাঁসের খেলা দেখতে। ছোটবেলায় পুকুরধারে এসে কতবার দেখেছে এ ছবি। কিন্তু আজ যেন নতুন করে ভালো লাগলো। কলকাতার জীবনে এ ছবি তো সহজে চোখে দেখা হয় নি—হারিয়ে যাওয়া ছবিকে নতুন মনে ধরা হচ্ছে যেন আজ চঞ্চলের।

ভোর হলেও এত নিস্তব্ধতা গ্রামের ঘরে চঞ্চলের ঠিক যেন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা গড়মিলের সুরই তার মনকে নাড়া দিচ্ছে। কি হল?

ঠিক কি যে হল তা চঞ্চল তখনই বুঝতে পারলে না। কিন্তু বুঝতে পারলে সে যখন ভেজানো দরজায় কড়ানাড়া দিলে এবং সেই কড়ানাড়ার শব্দে সচকিত হয়ে দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালেন চঞ্চলের মা।

—এ কি?

—আর একটু আগে কেন…

বলেই কেঁদে ফেললেন হাউ হাউ করে চঞ্চলের মা।

চঞ্চল দেখলে বিধবা জেঠিমা এসে হাত ধরলেন মায়ের এবং বললেন—আয় আর দেরি নয়, যা হয়েছে তাতো ফেরার আর নয়, যাক শেষ কাজটুকুই কর ছেলে হয়ে। আয় ঘরের ভেতরে।

চঞ্চল হক্‌চকিয়ে বাকশক্তিরহিত অবস্থায় সদরদরজার চৌকাঠ পেরিয়েছে এমন সময় রুক্ষস্বরের খ্যানখ্যানে ধ্বনি শুনতে পেলে। চম্‌কানোর যেটুকু বাকি ছিল তা শেষ হল এবার।

—আর শহুরেবাবুর জুতো প' য় কেন? ওটুকু এবারটি ছাড়ো।

তাড়াতাড়ি উঠোনের পাশের দাওয়ার এককোণে জুতো জোড়া ছেড়ে দেখলে গ্রামের নাপিতপিসি কথাটা বলতে বলতে মা-জ্যেঠিমার দিকে এগিয়ে আসছেন। চঞ্চলের মনে হল তখন—আবার কি কিছু মাকে বলবেন না-কি? কি জানি? প্রথম নাপিতপিসি কথার ঝাল ভালোই ছিটোলেন। চঞ্চল মায়ের পেছনে পেছনে ঘরের দিকে গেলো।

জেঠিমা মাকে সামলাতে থাকলেন। বলতে থাকলেন—বৌ অনেক পুণ্যি করেছিল তোর সোয়ামী তাই দেখ না তোর এক ছেলে ঠিক এসে গিয়েছে—নাড়ির টান বলে যে কথা আছে না বৌ, তা অব্যর্থ—নাড়িতে টান লাগবেই। আয় চঞ্চল। বাবার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম কর। মনে মনে তাঁর পরম-আত্মার শান্তি প্রার্থনা কর।

চঞ্চল আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলে না। টপ্‌টপ্‌ করে দুচোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগলো। মা, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন আবার—আমার কি হল গো, এবার আর কি হবে বেঁচে থেকে, আমায় কেন নিয়ে গেলে না সঙ্গে করে—আমার…

চঞ্চল জ্যেঠিমার কথামত মনে মনে পিতৃদেবের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করতে করতে শ্রদ্ধাবনত হয়ে মৃতদেহের জোড়াপায়ের বুড়ো আঙুলে দুহাত চেপে ধরে মাথা হেঁট করে কপালে ছোঁয়ালে।

জেঠিমা যেন চঞ্চলের এইভাবে মাথা নত করে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করাটা দেখে তৃপ্তি বোধ করলেন। সে সময় নাপিতপিসি ঘরের চৌকাঠের ওপর বসে তখনও যেন কি সব কথা প্রকাশ্যে বলতে পারছেন না অথচ যেন ঠোঁটের প্রান্তে বিড়বিড়িয়ে উঠছেন।

—আর দেরি করা কেন ডাক্তারি জবাব তো কালই হয়ে গেছে। ভোলা এই এলো বলে লেখা নিয়ে। ছেলে তো এসেগিয়েছে আর দেরি করা কেন? সব জোগাড় যন্তর করতে করতেও তো সময় লাগাবে। ছেলের এই তো এখেনে প্রথম কাজ।

কথাটা বলেই নাপিতপিসি থেমেছে আর জেঠিমা বলে উঠলেন—তোমার ছেলে ভোলাকে দেখো বোন একটু তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আনাতে পারো তো ভালো হয়।

—তাই যাচ্ছি। সেটাই ভালো কথা।

—যাও ভাই, ডেকে নিয়ে এসো, আর দেরি কোরো না মিথ্যে।

—এই যাচ্ছি গো, যাচ্ছি। বাউনের ছেলেও দুচার জন নিয়ে আসতে বলি। ছেলে বলতে তো এই এক…

ঠোঁট উল্টে কথা বলতে বলতেই নাপিতপিসি চলেগেলেন উঠোন পেরিয়ে সদরদরজা খুলে বাইরের বাগানে যাবার রাস্তায়।

চঞ্চল এবার কথা বললে—বাবার কি হল শেষে? আমি কাল বিকেলে মায়ের চিঠি পেয়েই রাত্রির ট্রেনে রওনা হয়েছি। ভোরে গ্রামের পথেও এখন কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। বাগানে ঢুকে কেমন যেন চুপচাপের ভাব দেখে মনটায় ছমছমিয়ে তুলছিল। কখন কি হল আবার?

—আর চঞ্চলরে?

জেঠিমা চঞ্চলের মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকেন তিনি আবার হাউহাউ করে কেঁদে ওঠায়। বললেন—বৌ, মনকে এবারটায় একটু শক্ত করতেই হবে ছেলের মুখ চেয়ে। চঞ্চল রয়েছে উপযুক্ত তোমার ছেলে, আর ভেঙে পড়লে চলে না।

—কি হল শেষে?

চঞ্চলের এবার প্রশ্ন জেঠিমাকে। তিনি একবার বৌয়ের দিকে অর্থাৎ চঞ্চলের মায়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলতে থাকলেন—কি আর বলি বাছা চঞ্চল। তোমার বাবার মতো নির্বিবাদী লোক হয় না। নিজের পাঠ, যযমান এই সব নিয়ে থাকতো। তুমিও জানো আমরাও দেখেছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জেঠিমা সে তো দেখেছি!

—তাই তো বলি, কার যে কখন কি থেকে যে কি হয়, কিছুই বলা যায় না বাছা। বলতে আর কজনই-বা পারে।

—তা তো ঠিকই কথা।

—তুমিই দেখো না, তোমার জেঠামশায় সামান্য একটু রোদে যযমান বাড়িতে দেখা করে বৈশাখের বেলায় বাড়ি ফিরলেন আর একটু পরেই সব শেষ। কেমন যেন তার মুখ চোখ হয়ে যায়। আমি একটু জল মুখে ধরে দিতে পেরেছি এটুকুই সান্ত্বনা বাছা। আর তোমার বাবা, কি যে বলি বাছা, অমন মানুষের এমনি আঘাত পেয়ে চলে যাওয়া?

—আঘাতের কথা কি বলছেন জেঠিমা?

—কি আশ্চর্য তুমি কি কিছুই জানো না?

—কি বিষয়ে বলুন তো জেঠিমা, আমি তো ঠিক যেন কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না?

—দিদি, ওকে তো অ[illegible] কিছু বলা হয় নি চিঠিতে। শুধু পত্রপাঠ চলে আসতে লেখা হয়।

—হ্যাঁ, তাইতো। আমি কালই প্রথম পোষ্টকার্ড মায়ের পেয়েছি, যাতে এখানে আসার কথা বলা হয়েছে বাবার অসুস্থতার কারণে। আমার তো আগে থেকে কোনোকিছুই জানা হয় নি। আমি একেবারে চিঠি পেয়ে আকাশ থেকে পড়েছি। কি করি? এক ডাক্তার বন্ধুকে আর তার মাকে বলি। এমনি বাবার অসুস্থতার কথা বলতেই তিনি তো বলেই বসলেন আমি যেন বাবাকে নিয়ে তাঁদের কলকাতার বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাই।

—আর সে সুযোগ বাছা তোমার বাবা দিলেন না। আগেই চলে গেলেন তোমাদের ছেড়ে।

—দিদি আমার এখন কি হবে!

চঞ্চলের মা আবার একপ্রস্থ কেঁদে উঠলেন।

জেঠিমার মুখের দিকে চঞ্চল প্রশ্নভরা চোখে চেয়ে রয়েছে। তার প্রশ্ন—বাবার কি হল ?

জেঠিমা বলতে আরম্ভ করলেন চঞ্চলের জানার ঔৎসুক্য বুঝে। বললেন—তুমি তো বাছা কলকাতায় থেকে কাজ করো অফিসে। দেশের যে কি কঠিন অবস্থা তা আর কি বলবো ? আমার সামান্য ভাতটুকু কোনোক্রমে জোটে চাষের থেকে। তোমার বাবা-মা দুটি প্রাণীর সেটুকুতেই কোনোক্রমে চলতো, আর তোমার পাঠানো মাসিক বরাদ্দে। আগের যে সব যযমান ঘর ছিল তারা কিছু না কিছু পালপার্বনে দিতো। এখন তাও আবার বন্ধ হয়েছে বেশ ক'বছর।

—হ্যাঁ, তাতো জানি। ফলে তিনি লিখলেই আমি তো টাকা পাঠিয়েছি।

—তাতে কি চলতো বাছা। বৌ জানে সে সব দিনের কথা। এমন হল শেষে এই ভদ্রাসনটি বাঁধা দিয়ে···

—সে কি ? জেঠিমা কি বলছেন ?

—সেই তো শুরু···

—কিসের শুরু জেঠিমা ?

—আর কিসের বাছা !

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা। চুপ করছেন কেন ? বলুন তো কি ব্যাপার ?

—হ্যাঁ, তোমার তো সবটা জানাই উচিত বাছা, তোমার সবটা জানাই উচিত, তবে যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে জ্ঞাতি নিয়ে পিতৃদায় উদ্ধার হতে হবে বাছা।

—তা তো হবেই এবং যা বলবেন তাই করবো। কিন্তু কি যেন চেপে যেতে চাইছেন আমার কাছে। জেঠিমা, আর তো যাঁর যাওয়ার তিনি চলেই গিয়েছেন তবে বিষয়টার শুরু থেকে জানার দোষ কি ?

—না বাছা দোষের নয়, তবে বড় লজ্জার বিষয় বলতে···

চঞ্চল চোখ দুটো জেঠাইমার দিকে তুলে অবাকভাবে বলে—যা বলতে চান বলুন তো, এখনো লজ্জার ?

—হ্যাঁ, সেই কথাই তো, লজ্জার বিষয় আমার কাছে বাছা, কিন্তু যাদের দ্বারা লজ্জার কাজ হয় তাদের লজ্জা হয় না। এই তো এত কাণ্ড হলো, আজ সব শেষ হয়ে গেছে, দাদাকে দেখতেও আসছে না ?

—কাকার কথা বলছেন। তা হলে কি বাবা ভদ্রাসনটির অংশ কাকাকে বন্ধক দিয়েছিলেন?

—সে হলে তো ভালোই ছিল। একজনের সবটা হয়ে যেতো। অপর এক লোক নিয়েছিল সে দেয় আবার কাকাকে বন্ধক।

—তা হলে?

—আর তা হলে বাছা, কাকা পেয়েই বললে, ঘর খালি করো। একেবারে সোজা কথা।

—থাক দিদি, থাক সে কথা এখন। সবই কপাল?

—সেই নিয়েই তো রাগারাগি। তার আগে বেশ কিছুদিন ধরেই তোমার বাবার তো মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে শরীর খারাপ চলছিল। এবং শেষে…

জেঠিমা চুপ করলেন দেখে চঞ্চল অধৈর্য হয়ে ওঠে।

—শেষে কি জেঠিমা, বলুন না?

—ঝাঁটা নিয়ে একেবারে তেড়ে গিয়ে, আর থাক বাছা লজ্জার লজ্জার।

—কবে ঘটলো এমন ঘটনা।

—এই তো পাঁচদিনও হয় নি, তাই না বৌ?

—হ্যাঁ, দিদি তাই, আর কি বলবো। সেদিন থেকে বিছানা নিলেন মাথার যন্ত্রনা নিয়ে, শেষে অচৈতন্ত হয়ে…

—সন্ন্যাস রোগ বলছে ডাক্তারবাবু।

চঞ্চল কোনো কথা বলতে পারছে না। কি বলবে আর! মুখ নিচু করে বসে থাকলো। তার মনে হচ্ছিল কত বাল্যের স্মৃতি—কাকা কত আদর করে ঘুড়ি ওড়াতে শেখাতেন, কত আদর করে পুকুরপাড়ে মাছের খেলা দেখাতেন খৈ ছিটিয়ে দিয়ে জলে। তবে বাবার সঙ্গে খুব একটা কথা বলতে দেখে নি কাকাকে। কাকা পড়াশোনা না করে গ্রামের বখাটে ছোকরাদের সঙ্গে বিড়ি-সিগারেট ফুঁকে রেলস্টেশনের ধারে চায়ের দোকানটায় বসে আড্ডা দিতেন। তাই বাবা একদিন সেই দেখে একেবারে রাগ সামলাতে না পেরে দিয়েছিলেন ঘা কয়েক চড় আর কান ধরে সেখান থেকেই নিয়ে এসেছিলেন ঘরে। তার পর থেকে বাবার সঙ্গে কোনো কথা ছিল না কাকার। জেটামশাই থাকতে থাকতেই পৃথক হয়ে যায় বাড়িঘর জমি-জায়গা। তাই তিনি পৃথকই ছিলেন। কিন্তু একি সেদিনেরই প্রতিশোধ?

চঞ্চল দেখলে মা ঘনঘন চোখ মুছছেন আর জেঠিমা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন।

—এখন কি করবো জেঠিমা ?

—যা হয় করে আজকের কাজটা তোকে করতেই হবে এবং থাকার জন্তে ভাবতে হবে না আমি রয়েছি যখন···

—তাতো ঠিক ; কিন্তু কাকা শেষকালে ?

—থাক চঞ্চল এখন সে কথা।

—আচ্ছা মা, আচ্ছা···

—বৌ চলো ওঘরে যাই।

এরই মধ্যে গ্রামের লোক খবর পেয়ে এসে গেলেন প্রায় ঘরের দরজার সামনের উঠোনে, তাই জেঠিমা চঞ্চলের মাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

—হ্যাঁ, চলুন দিদি।

চঞ্চলের জেঠিমা বেশ আশ্বস্ত হলেন গ্রামের অনেককে আসতে দেখে।—ব্রাহ্মণ ঘরেরও কেউ কেউ রয়েছেন। বেশ হল এসেগেছেন অনেকেই। কাঁধ দেওয়ার লোক হয়ে যাবে অনেকে, তা ছাড়া শিষ্যরা তো আছেই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।

চঞ্চল জবাব দেয় সংক্ষেপে।

—চঞ্চল এসেগেছ, যাক, তা হলে আর ভাবনা নেই। এই ভোলা, ভোলা কই ?

—নাপিতপিসি ডাকতে গিয়েছেন, এলো বলে।

—ঠিক আছে চঞ্চল, কিছু ভেবো না আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। গোঁসাইজী যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন ভাবাই যায় নি। আমাদের পুরুষানুক্রমের গুরু বংশ। আমরা সবাই মিলে তাঁর শেষ কাজটির ব্যবস্থা করছি চঞ্চল, তোমার না বলা চলবে না।

—না না, সুরেশ দাদা, আপনারা যা বলবেন সেই মতোই হবে। আমার আর মাথার ওপরতো কেউ রইল না। আপনারা···

—চঞ্চল কিছুই ভেবো না, সব ঠিক ঠিক হবে। তা তোমার কাকাকে কি পাবো এ কাজে ?

চঞ্চল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো জবাব দিতে পারে না। জেঠিমার লজ্জা যেন চঞ্চলের মনেও এসে গিয়েছে। সেও আর উত্তর দেবার মতো কথা খুঁজে পায় না বা মুখ তুলে চাইবার মতো মনের অবস্থা হয় না।

—থাক চঞ্চল, থাক। তুমি আর কি বলবে সবই তো বুঝতে পারছি? যত নষ্টের গোড়া। 'ক' অক্ষর একটি। আশ্চর্য, এমন বংশে…

একজন খুব আস্তে বলে উঠলেন—'খ' অক্ষরও বলতে পারেন।

ওঁদেরই মধ্যে অপর একজন তখনই বলে উঠলেন—এই যে ভোলা এসে গিয়েছে।

—কই ডাক্তারের সার্টিফিকেট কই?

চঞ্চল জিজ্ঞাসা করলে ভোলাকে দেখতে পেয়ে।

ভোলা বললে—তিনি বললেন, আমাকে তা দেবেন না। ডাক্তারের কি মেজাজ রে বাবা!

—তা হলে সুরেশ দাদা?

চঞ্চল অসহায় ভাবে সুরেশদাদার দিকে চেয়ে তখন বলে ওঠে। তার উত্তরে সুরেশদাদা বললেন—কেন রে ভোলা, ডাক্তারবাবু এ কথা বললেন?

—তা তো বলতে পারি না?

—সে কি? তুই কিছু কারণ জানতে চাইলি না কেন?

—আমি আর কে, ডাক্তারবাবুর এমনি ভাবটা।

—ওঃ তাই নাকি, আচ্ছা চঞ্চল চলো তো একবার। দেখি কি বলেন। তোমরা সবাই থাকো এখানে। আমি আর চঞ্চল শুধু যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে। দেখি কি বলেন।

পিতৃদায়গ্রস্থ চঞ্চল মন্ত্রচালিতের মতো পরের কথায় আদেশপালকমাত্র হয়ে গিয়েছে। নিজের বিবেক বুদ্ধির ধার পাশ দিয়ে না হেঁটে কাজের জন্তে যেমন যখন যথা আজ্ঞা আসে তথা পালন করবে সে।

—চলুন তাই।

অন্ত একজন বললেন—তা হলে আমরা অন্তান্ত সব ব্যবস্থায় থাকি বেলা বাড়ার আগেই যাত্রা করা যাবে শ্মশান মুখে।

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই হোক।

সুরেশদাদার সঙ্গে চঞ্চল বেরিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে যাবার জন্তে!

ভোলা চঞ্চলের বাবার পায়ের কাছে বসে তাঁর চাদর ছুঁয়ে থাকলো। মৃতদেহের সৎকার হওয়ার আগে পর্যন্ত একজন স্পর্শ করে থাকছে।

একে একে মৃতদেহের দিকে দেখে অন্তান্তরা উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন ভোরের রোদের আলো ছড়িয়েছে। তবে সে রোদ তেমন তেজী নয়

উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা কথা কইতে থাকলেন—গোঁসাইজীর জন্যে কে কি আনতে পারবে, শেষ কাজ।

—বৌ, কি যে করা যায়? মনটা খারাপ লাগে যে গোঁসাইবাড়ি সৎকারের জন্যে শিষ্যবাড়ির দান। তবে সবটাই তাঁদেরই বলতে গেলে।

—আর দিদি সে কথা কেন ভাবছেন?

—তা বটে বৌ। ঠিকই···

চঞ্চলের মা আর জেঠিমা আবার এলেন মৃতদেহের ঘরে কথা বলতে বলতে।

ভোলা তখন বাইরে উঠোনে চলে আসে সকলের মাঝখানে। সে দেখছে এরই মধ্যে কে যেন দুটো বড় বাঁশ নিয়ে রাখছে।

—আরে আরে! ভোলা অবাক হয়ে দেখছে যে গোঁসাইজীর ছোট ভাই দুটি বাঁশ রাখছেন উঠোনে।

সবাই দেখলে। তার মধ্যে একজন আর থাকতে না পেরে নাকি-সুরে বলে উঠলো—এটা কি দাঁদার কাঁজের জন্যে?

—হ্যাঁ।

শুধু এইটুকু বলেই উঠোন থেকে চলেগেল। তার পর বাগানের দিকে দেখা গেল তাকে চলে যেতে।

—দাদার শেষ কাজটুকুর জন্যে বাঁশ দিচ্ছে ভায়া।

কে যেন কথাটা বলতেই অন্য একজন বললে—চেপে যা ভাই, চেপে যা।

—না না, ও বাঁশ গোঁসাইজীর কাজে নেওয়া হবে না।

—থাক ভাই, আসল মানুষটিই তো চলে গেলেন, আর কেন? যা হবার হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তির করুক এই করে।

—বারে, তা ঠিক কথাইতো। তাই করুক।

সকলের মধ্যেই বেশ কৌতূহল জেগেছে। অবাক কাণ্ড মনে হয়েছে সকলেরই। যে ভাই দাদার দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতো সেই আজ কাজ উদ্ধার করতে আসছে?

কে যেন কথা কটা পাশের জনকে বললে।

উত্তরে একজন বললে—কত খেলাই জানে ছোকরা।

—চুপ চুপ, কি বলে!

থামিয়ে দেয় একজন তাকে এই আলোচনা।

—আঁমরা দর্শকমাত্র গো। শুধু দেঁখে যাই।

নাকিস্বরে কথা কটা বলেই থেমে গেলো তখনই সে।

—দেখা যাক ও কি কি করে। তোমরা ওকে আর কিছুটি বলবে না।

—না না, আমরা কিছু বলবো না।

—হ্যাঁ, যা আনতে ও পারবে না, তা তোমরা আনবে।

—ঠিক আছে তাই হবে।

—দেখো, শেষযাত্রা নিজের বংশের হাত দিয়ে যতটা হয় ততটাই ভালো।

—কিন্তু চঞ্চল যদি কিছু বলে আবার?

—না না, সে তেমন নয়। আর যদি কিছু বলেও তা আমরা বলে কয়ে বুঝিয়ে দেবো চঞ্চলকে।

—সেই ভালো।

—ভোলা, তুই কি কিছু জানিস, ঠাকুর মশাই কে কাজ করবেন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন।

—না, তাতো শুনি নি।

ভোলার কথা ধরে নাকি-সুরে বলেন—এঁদের তো কাঁজ নারাণ ঠাকুর মশাই কঁরবেন, তা নয় কি? কারণ তিনিই তো গোঁসাইবাড়িতে যাঁতায়াত কঁরতেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।

ভোলা বলে উঠলো নারাণ ঠাকুর মশায়কে আসতে বলতে হবে শুনে।

—তা হলে, ভোলা তুই যা একবার খবর দিয়ে আয়।

—এখন কি পাওয়া যাবে বাড়িতে?

—তা দেখতে তো হবে। নিজের বাড়িতে না থাকেন যে বাড়িতে থাকবেন সেখানে গিয়ে যে তাঁকে ধরে আনতেই হবে এখন। যা ভোলা, যা একবারটি।

—কি বলবো তাঁকে?

—গোঁসাইজীর শেষ কাজের যা যা করণীয় তা সব করতে হবে, এই বলতে হবে, আর কি?

—তাই যাই তা হলে বলতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, যা।

ভোলা উঠোন পেরিয়ে বাগানের দিকে গিয়ে দেখে গোঁসাইজীর ভাই গাছের সব ফুল তুলে নিয়ে আসছেন আর সঙ্গে নারাণ ঠাকুর মশায়।

তাঁকে দেখেই ভোলা বলে উঠলো—ঠাকুর মশাই, এসেগেছেন, আমি ডাকতে যাচ্ছিলুম আপনাকে যে…

—আবার কেন? আমায় তো ভোরে ছোট গোঁসাই ডেকেই এসেছেন দাদার শেষ কাজ করতে। সে বলেই আসে যে ঠিক ঠিক যেন সব ব্যবস্থা করেই চলে আসি। আমি সব ঠিক করে এসেছি। তাইতো বড় দুঃখের যে মেজো গোঁসাই গত হলেন।

—ওঁ, তা বেশ ঠাকুর মশাই। ছোট ভাই ঠিকই করেছেন, চলুন ভেতোরে। তা হলে কি কি করতে হবে শান্তিস্বস্ত্যয়নের জন্যে বলুন এবার।

ভোলা নিয়ে এলো উঠোনের মধ্যে দিয়ে। সবাই দেখলে গোঁসাইজীর ছোটো ভাই প্রচুর ফুল এনে রাখছে উঠোনের দাওয়ায়। তারা শুনলে ভোলার সঙ্গে ঠাকুর মশাইয়ের কথায় যে ছোট গোঁসাই নারাণ ঠাকুরকে ভোরের বেলা শান্তিস্বস্ত্যয়নের কাজ করতে ডেকেই এসেছিল। সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকলো। খুব নিচু গলায় বলাবলি করতে থাকলো—

—তা হলে?

—তা হলে কি আবার?

—ভাই তো দাদার শেষকাজ বেশ ভালোভাবে করবে বলেই মনে হচ্ছে।

—আরে, ভাই যদি দাদার কাজ না করে তো কে করবে?

—তা ঠিক, করলেই ভালো। আমরা বসি গিয়ে ততক্ষণ এই পাশের দাওয়ায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো।

এর মধ্যে সুরেশদাদা এসেগিয়েছেন চঞ্চলকে নিয়ে। তিনি বললেন—ডাক্তারটি বলেছেন এক কথা, আর ভোলা বললে আর এক কথা। তিনি তো ডেথ্ সার্টিফিকেট নিজেই লিখে রেখেছিলেন। যাক সে তো মিটেছে, এখন সব ব্যবস্থা এ দিকের কি হল?

একজন বলে উঠলো—চঞ্চলের কাকা ব্যবস্থায় তো রয়েছেন। চঞ্চল যা বলবে আমরা তাই করবো। নারাণ ঠাকুর মশায়কে পর্যন্ত চঞ্চলের কাকা খবর দিয়ে এসেছেন শান্তিস্বস্ত্যয়নের জন্যে।

সুরেশদাদা এবং চঞ্চল দেখলে তার কাকা ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। পাশে কয়েকটা রজনীগন্ধার ডাটিও রয়েছে।

চঞ্চল বললে—সুরেশদাদা, এ কি?

—ঠিক আছে চঞ্চল। এটাই ভালো হল। করুক করুক।

—তাই হোক।

চঞ্চলকে নিয়ে এবার শান্তিস্বস্ত্যয়নের জন্তে ব্যবস্থায় মনটা দিলেন সুরেশ দাদা। নিশ্চিন্ত হয়েছেন নারাণ ঠাকুর মশায় এসে যাওয়ায়।

—শান্তি। মৃত মানুষটির অমর আত্মার চিরশান্তি হোক। চঞ্চল আর কিছু নয়, সেটাই বড় কথা এখন। সব মনটায় এখন শুধু বলতে থাকতে হবে, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—বাবা চঞ্চল!

মায়ের কান্না জরানো কণ্ঠের ডাক শুনলে।

—যাই মা।

চঞ্চল বললে ধরা ধরা গলায়।

নাপিতপিসি চঞ্চলকে দেখেই বলে উঠলেন—আর দেরি করা কেন, মরা কি বেশিক্ষণ রাখে গেরস্তঘরে? সংসারের হিত দেখবে তো তোমরা বাছা। এখেনে···

কথা শেষ করার আগেই তখনই জেঠিমা বলে উঠলেন—চঞ্চল, এবার বাছা কাপড়টা পাল্টে নিয়ে নারাণ ঠাকুর মশায় শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করেছেন বসতে হবে এখেনে।

—হ্যাঁ, জেঠিমা আসছি। কিন্তু কি কাপড় পরবো?

—পাশের ঘরে কাপড় রেখেছি তাই নিয়ে নে।

মায়ের কথায় চঞ্চল পাশের ঘরে চলে যায় কাপড় বদলাতে।

নাপিতপিসি বলে উঠলেন—কই সংকীর্তনের দল এলো না এখনো। ছোট গোঁসাই তো দাদার শেষযাত্রায় সংকীর্তন দলকে যেন খবর দিয়ে এসেছেন বললেন। অথচ কই···

কথাটি শুনে সবাই চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। কেউ মুখে আর কোনো কথাটি বললেন না। চমকে দেওয়ার মতো কথা।

নারাণ ঠাকুর মশায় মৃতদেহের পাশে বসে কোষাকুষি থেকে জল ছিটিয়ে তখন চারিপাশটা বিশুদ্ধির কাজে লাগলেন। মুখে তিনি বলতে থাকলেন—ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

এর মধ্যেই উঠোনের দিক থেকে য়রে আওয়াজ ভেসে এলো খোলকত্তালের বাজনার আর তার সঙ্গে ভাঙ্গা গলায় দুজনের গেয়ে ওঠা হরিসংকীর্তন। তুলসী

মঞ্চের চার ধারে ঘুরে ঘুরে কীর্তন চলতে লাগলো। কীর্তনিয়ার দল চড়া গলায় ফিরে ফিরে গাইতে থাকলো খোলকত্তালের তালে তালে—'হরেকৃষ্ণ হরেরাম নিতাই গৌর রাধেশ্যাম'।

—কি খবর বলো তো?

চামেলী আজ অনেকদিন যেন খবর পায় নি এই ভাবে বেশ একটা উদ্বেগভরা মন নিয়েই অনিলকে প্রশ্ন করলে।

অনিল বিকেলের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে—কার খবর?

—সে কি বন্ধুকে ভুলেই গেলে? বন্ধুর পিতৃবিয়োগের সেই শ্রাদ্ধশান্তির খবর জানিয়ে চিঠি এলো একটা, বাস তার পর তো আর কিছুই খবর নেই?

—ও, চঞ্চলের কথা বলছো? দীপককুমার তার একটা চিঠি পেয়েছে গতকাল।

চামেলীর সহজ প্রশ্ন—কি লিখেছে!

—আর লিখেছে। বড় বেচারা সে। চঞ্চলের জন্যে সত্যিই এখন মনটা কেমন কেমন করছে।

—খুব হয়েছে, আর বাড়াবাড়ি করতে হবে না। এতক্ষণ তো বন্ধুর কথা মনেই আসছিল না। আমি না মনে করিয়ে দিলে তো মনেই আসতো না। আবার ঢঙ্ দেখো না, বলা হচ্ছে, এখন মনটা কেমন কেমন করছে।

—না না, চামেলী সত্যিই, তোমার গায়ে হাত ছুঁয়ে বলছি বিশ্বাস করো।

—খুব হয়েছে থাক, আর এই বিকেলের আলোয় আমার গা ছুঁয়ে তোমায় সত্যি করতে হবে না। এমনিই বলো তো। উঃ খুব সোহাগ দেখানোর ছল হচ্ছে।

চামেলীর কথায় অনিল হাসি মুখে বলে—এই দেখো, কি কথা থেকে কি কথায় এলে। এইজন্যেই মেয়েদের বলে…

—থাক বাবা থাক, মেয়েদের সম্পর্কে খুব জ্ঞানী তুমি জানি, এখন বন্ধুর খবরটা কি তাই বলো তো দয়া করে।

—সে কথাই বলছি গো।

—হ্যাঁ বলো তো, আর ভণিতায় দরকার নেই।

—সবেতে আমার ভণিতা পাও কোথায় বলো দেখি?

—উকিলগিরি করলে যা হয় আর-কি?

—আচ্ছা আচ্ছা, থাক ও কথা। চঞ্চল বাছারির বাবা তার ছোট ভাইয়ের কাছে সব বিষয় সম্পত্তি মানে ঐ ভদ্রাসন আর একটু ধানজমি ছিল তাও বন্ধকীর হাত ফেরতাই করে দেউলিয়া হয়ে মারা গেলেন।

—সে কি?

—তবে আর মনটা কেমন কেমন করছে বলেছি কি সাধে সুন্দরী!

—থাক আর কথায় সোহাগ দেখিয়ে কাজ নেই।

চামেলী চোখ তুলে মুচ্‌কি হেসে কথাটা বললে। মনের মধ্যে একটা অচেনা সুরের টান যেন ভেসে আসছে তার? তবু তা যেন সে ধরতে পারে না। অনিল বলতে থাকে খুব একটা বোঝদারি কায়দায়।

—বুঝেছি এর অর্থ কি?

—তুমি আবার বুঝবে না! উকিল মানুষ, কোকিলের কপ্‌চানি। অর্থ পাওয়া তো তোমার কথার অর্থ বুঝিয়ে গো।

—ঠিক বলেছ এবার, ঠিক কথা।

—আমি আর বেঠিক বলি কবে?

—চঞ্চলটা দীপককুমারকে লিখেছে এ অবস্থায় কাকা এখন থাকতেই বলেছেন তবুও মনটা বড়ই খারাপ লাগছে কারণ চঞ্চলের বাবার সঙ্গে তার ভাইয়ের শেষ ব্যবহার একেবারে খুবই খারাপ হয় সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ে। তারই আঘাতে পিতৃবিয়োগ চঞ্চলের।

—সে আবার কি? কি বলছো গো।

—হ্যাঁ, চামেলী তাই তো বলল কালকে চিঠিতে খুলে লিখেছে দীপক-কুমারকে। আমাকে অবশ্য ভাবতে বলেছে আইনগত কোনো কিছুতে ফাঁক ধরতে পারি কিনা। চঞ্চল আর কয়েকদিনের মধ্যেই আসছে। দেখি নথি-পত্তর ঘেঁটে কি অবস্থায় রয়েছে।

—তাই তো, এ আবার এক নতুন অশান্তির কথা। কিযে হল হঠাৎ সব। বেশ ছিলেন তিনি নিজের কথকতা পাঠ আর যযমান-শিষ্য নিয়ে। গোঁসাই বংশের জাত-ব্যবসা করতেন।

চামেলী আসল গণ্ডগোলের সূত্রটাই ধরিয়ে দিলে। অনিল তখন বলে উঠ্‌লো—চঞ্চলটা তো তা করে নি বলেই বাপ-মায়ের রাগ ছিল তাদের একমাত্র ছেলের ওপরও।

—তবে কি ভদ্রাসন আর ধানীজমি বন্ধক দিলেন সেই রাগে, ছেলের ওপর রাগ করে কি ?

—নানা, ও লিখেছে, শেষদিকে অর্থের টানাটানি নাকি চরমে এসে পৌঁছিয়ে ছিল।

—অথচ বাপ-মাকে তো বন্ধু তোমার চিঠি পেলেই যখন যেমন পেরেছে টাকা পাঠিয়ে ছিলেন। সে কথা কতবার শুনেছি।

—সবই ঠিক, তবু মেটে নি চাহিদা বা চাহিদা মতো চঞ্চল মেটাতে পারে নি। যেটাই হোক, ঘটনা যা ঘটলো এখন সেটাই 'জানতে পেরে ভাবছি কেবল।

—ছাখো যদি আইনের ফাঁকে কিছুটা উদ্ধার হয়।

—যদি উদ্ধার হবার হয় তো, জানবে চামেলী, তা হলে সবটাই হবে আর না হলে সবটাই গেলো।

অনিল কথা বলতে বলতেই চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে। চামেলী কেতলী থেকে আরো চা ঢেলে দেয়।

—দীপককুমারের মা শুনে বলেছেন, আমি তো চঞ্চলকে বলেই দিয়েছিলুম যে মা-বাবাকে নিয়ে আসতে কলকাতায়। তা এখন মাকে নিয়ে চলে আসতে লেখ! দীপককুমারও কাল চঞ্চলকে মায়ের কথা উল্লেখ করে লিখে দিয়েছে যে চঞ্চল যেন তার মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে।

চামেলীর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে অবাক বিস্ময়ে। সে শুধু বললে —সত্যি! আশ্চর্য তো?

—হ্যাঁ গো চামেলী, সত্যি, এ যুগেও এমন মন আছে।

—দীপকবাবুর মাকে বড় ভালো লাগে আমার সেই প্রথমদিন দেখা থেকেই। মাটির মানুষ। অন্তরটাও যে এত কোমল আর দরদী তা প্রত্যক্ষ বোঝা গেল, তাই নয় কি ? কে আর এই বাজারে ছেলের বন্ধুর মায়ের দায়িত্ব নিতে চান বল।

—ঠিকই তো। প্রথমে তো তিনি বাপ-মা দুজনকেই তাঁর কাছে রেখে চিকিৎসা করাবেন, চঞ্চলকে বলেই দিয়েছিলেন।

অনেক দূরে যেন মনটা চলে গেছে এমনভাবে উদাস চোখ নিয়ে চামেলী জানলার দিকে তাকিয়ে বলে।—শুনেও ভালো লাগে।

—তা আর নয় চামেলী, যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে তাঁরা সেই সামর্থ্যের

উপযুক্ত মর্যাদায় মনের উদারতা উজাড় করে দিতে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক।

—তাই তো, ঠিকই।

—দীপকের মনটাও তো রয়েছে।

—হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই। এই দেখো না তোমার ক্ষেত্রেই, তোমার মন কোনো ব্যাপারে না থাকলে আমি কি আর তা করতে পারি?

—থাক বাবা থাক্, এর মধ্যে আর আমাকে টানাটানি কেন। বেশতো ওদের কথা হচ্ছিল।

রসিকতাটা যে চামেলী ধরতে পেরেছে তা বুঝে আত্মতৃপ্তির স্বরে অনিল বললে—খালি পরস্মৈপদী ;

—তা আর বলবে না, তুমি তো…

অনিলের কথা শেষ হবার আগেই দরজায় কার যেন কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গেল। চামেলী দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অনিল চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে—আমি দেখছি।

চামেলী ভেতরের ঘরের দিকে চলে গেল।

দরজা খুলেই অনিল দেখলে উষা দেবীর বাড়ির লোকটি।

—কি খবর গো?

—মায়ের একটা চিঠি এনেছি।

—কই, দেখি দাও।

অনিল লোকটির হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে খাম থেকে সে চিঠিটা বার করে নিয়ে পড়তে থাকলো। তিনি লিখেছেন—জরুরী প্রয়োজন, আজই যদি সম্ভব হয় দেখা যেন করা হয়। এবং প্রথমে অনেক দিন যোগাযোগ না রাখার জন্যে অভিযোগও করেছেন।

লোকটিকে বলে দিলে অনিল—ঠিক আছে আমি একটু পরে যাচ্ছি।

অনিল দরজা বন্ধ করতে না করতেই চামেলী এসে দাঁড়িয়েছে ভেতর ঘর থেকে বসার ঘরে। জিজ্ঞেস করলে—কার চিঠি এলো? একটু পরে কোথায় যাবে?

—তুমিও চলো না, উষা দেবী জরুরী প্রয়োজনে তলব করেছেন। দেখো আবার কি বলেন।

ঊষা দেবী থামলেন। কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে যেন এমন ব্যক্তিত্ব নিয়ে রয়েছে সুবর্ণ রায় যে তার কথাতেই আসল রায় প্রকাশ পায়।

সুবর্ণ রায় তাঁর সামনের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতেই বলে উঠলো—আর কেন, ওসব আর না ভাবাই ভালো, তাতে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে মন খারাপ করাই হবে শুধু। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পেছনের দিকে ফিরে তাকালেই তো শুধু দুঃখের শুধু বেদনার আঘাত লাগবে। প্রতিটি ক্ষণকে তাৎপর্যময় করে ঐশ্বর্যময় করতে হয়।

—ভারী সুন্দর কথা, ভারী ভালো লাগলো কথাগুলো, পেছনের দিকে ফিরে তাকালেই আঘাত লাগবে। ঠিকই পেছন দিকটায় তো দুঃখের পর দুঃখ। কবে যে সুখের মুখ দেখেছি তা যেন মনেই আসছে না। বীথির কথা সেদিন থেকে শোনার পর মনটা…

—এমনিই হয়। কাছের দুঃখটাই চোখের সামনে রয়েছে তো। নৈকট্যের ক্ষণগুলোই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ থেকে চলচ্চিত্রের মতো পরপর ছবি হয়ে ভেসে ওঠে চোখে অথবা মনের সাগরে ভাবনার ঢেউ তোলে।

সুবর্ণ রায় সায় দিলো ঊষা দেবীর কথায়। ঊষা দেবী ফের বলতে থাকলেন—বীথি মুখের ওপর কি করে বললে যে এখন আসবে না, তা তো ভাবতেই পারছি না। আমার দিকটা ভাবলো না…

—তার মনের কোণে ঘর বাঁধার প্রবল ইচ্ছে, তাই সে যে বন্ধুর স্বামীর কাছে সেই সুযোগই পেয়েছে। আপনারা এতদিন তো তাকে বিয়ের কথা শুনিয়েছেন খোঁজ করছেন বলে, কিন্তু সে তো তার আগেই মন দিয়ে দিয়েছিল তার সোনাদাকে।

—কি যে মেয়ের মনে হল, সে ঐ মেয়েই জানে। পাড়ার একেবারে মস্ত মস্তান, থাক সে কথা, সারাদিন পার্কে শুধু গুলতানী আর বোমবাজিও যে কত [illegible], ছিঃ,ছিঃ…

[illegible]র থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—ওসব কথা এখন আর না বলাই ভালো [illegible] কোলিয়ারিতে চাকরী করছে এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করছে তখন [illegible] তো মানতেই হবে। তা ভিন্ন আর আমাদের এখন উপায় কি?

—শেষকালে বীথি এমন করবে, ইশ্, আমি তো ভাবতেই পারছি না। বেশ মনে আছে, অনেকদিন আগেই হবে তখন কর্তা বেঁচে রয়েছেন। বিকেল বেলা ছাতে একটু পায়চারি করছেন, দেখলেন সোনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিস

দিলে। এবং তার পর সে উপর দিকে চেয়ে কথা বলছে ইশারায় ছাদের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বীথির সঙ্গে।

—সে কি? তা হলে তো বীথির সঙ্গে অনেকদিনের যোগাযোগ দেখছি? অঙ্কুরোদ্গমের সেই ক্ষণটিতে তো আর রুখতে পারেন নি?

—হ্যাঁ, তা সত্যিই।

—কর্তাও ভীষণ রাগী ছিলেন। মেয়েকে এই মারেন কি সেই মারেন। সোনাকেও কিছু…থাক সে কথা, বাস সেই থেকে পড়তে যাওয়া বীথির বন্ধ হল। মেয়ে কেঁদে আকুল।

—মেয়ের পড়া বন্ধ করলে কি হবে মনের যোগ যে হয়ে গিয়েছিল। কর্তা সোনাকে মারধোর করিয়েছিলেন তো তাইতে মেয়ের মন আরো ওর প্রতি ঝুঁকে যায়। মন যে কোমল, ক্ষণিকেই গোলে যায়। মনই যে বড় এখানে সব থেকে। মন দেওয়া হয়ে গেলে আর তো অন্য কথা চলে না। সুযোগ খুঁজতে থাকে মন কেমন করে মিলতে পারে, কেমন করে মেলতে পারে মনচোরের কাছে। ভালোবাসায় যে ঘর বাঁধা হয়।

—মেয়ের মন সোনা চুরি করলে, আশ্চর্য।

—আশ্চর্যের কিছু নেই, সে একজন বেপরোয়া উদ্দাম চঞ্চল যুবশক্তির কাছে তার প্রাণের প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তার নিজের নিঝুম মন নয়, বাড়িতে সে যতই চুপচাপ থাকুক তার আসল ভালোবাসা ছুটেছে উদ্দামতার দিকেই। চঞ্চল সবুজের হাতছানির ক্ষণে এদের জন্ম। এরা উদ্দামতাকেই যে ভালোবাসে। চঞ্চলতাকেই যে ছুটে গিয়ে ধরতে চায়। চঞ্চলক্ষণটিকেই তো এরা চিরন্তন ভাবে।

—তাই তো দেখছি। কি কাণ্ড একেবারে বোমাবাজির যে নায়ক তাকেই তার ভালোবাসতে মন চাইল। ভাবতেই পারা যায় না।

সুবর্ণ রায় বললে খুব জোর দিয়ে—মন যখন দিয়েছে তা দীর্ঘ দিন আগেই জানা ছিল তখন সাবধান অনেকভাবেই প্রয়োজন যে তা [illegible] হয় নি, কাজেই এখন সবটাই মেনে নিতে হবে। তা ছাড়া অন্য [illegible] অন্য পথ ভালো বলে মনেও হয় না।

—বীথিকে দেখে কি রকম মনে হল?

ঊষা দেবী খুব আগ্রহ নিয়ে কথাগুলো বললেন।

সুবর্ণ উত্তর দিলে—বেশ হাসি খুশিতেই রয়েছে দেখেছি।

—হাসিখুশিতেই রয়েছে সোনাকে নিয়ে বন্ধুর ঘরে। একি শুনছি আমি? মা হয়ে আমি কেঁদে মরছি আর মেয়ে বেশ রয়েছে। কি রকম কপাল আমার। ভাগ্য, সবই আমার ভাগ্য!

—তা অবশ্যই। না হলে কর্তা থাকতে থাকতে মেয়ের বিয়েটা যদি দিয়ে যেতেন তা হলে আর এই পরিস্থিতি হতো না।

—চেষ্টা যে করেন নি তা নয়। মনের মতো ঘরবর চাইতে চাইতে সব যে শেষ হয়ে যাবে তা কি ভেবেছিলেন। হঠাৎ চলে গেলেন। আমায় তো একেবারে অথৈ জলে ভাসিয়ে।

স্বর্ণ রায় এবার শুধু বললে—নিজের মনকে শক্ত করে বাঁধতে হবে, সামনে দিকে এগিয়ে চলার জন্যে। পেছনের দুঃখ রয়েছে, ফিরে না তাকিয়ে সামনের যারা তাদের মধ্যে সুখের ছবি দেখাটাই বুদ্ধিমানের। দুঃখের রাতকে ভুলে সুখের সকাল রচনা করা প্রয়োজন। বীথির নতুন ঘরে সুখ আসুক। সে কথাটা মনে থাকলে নিজেরও মনে আনন্দ আসবে।

—বাঃ খুব ভালো লাগছে কথাগুলো। ভারী ভালো লাগছে কিন্তু মনকে তো বাগ মানাতে পারছি না আর এই বাড়ির স্মৃতির মধ্যে থেকে। দম আঁটকে আসছে, কি হবে কি করবো, খালি ভাবছি।

—তবে এক কাজ করলে ভালো হয়।

উষা দেবী দারুণ আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। বললেন—কি কাজ শুনি, শুনি।

—বীথির একটা আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রীতিবন্ধন উৎসব হোক, সেই শুভক্ষণটি সবার মধ্যে দিয়ে আশীর্বাদীর দ্বারা না হলে কি ভালো দেখায়, একটা…

স্বর্ণ রায়ের কথা থামার আগেই উষা দেবী বলে উঠলেন—সে কাজ আমি কি করে করি? কর্তার যে এ কাজে মত ছিল না জানি, তাই এ কাজ আমি প্রাণ থাকতেও করতে পারবো না।

—তা হলে কি বীথি আর সোনাকে সামাজিকভাবে কিছু উৎসব করে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হবে না?

—না, তা কখনোই পারি না।

স্বর্ণ সান্ত্বনার সুরে বললে—সব ক্ষণকে ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলুন। ক্ষণমুহূর্তকেও বৃথা যেতে দেবেন না।

ডিং ডং ডিং ডং…

ঘণ্টা বাজতেই উষা দেবী উঠে গিয়ে দরজাটা খুললেন।

দেখলেন অনিল ও চামেলী এসেছে।

তারা ঘরে স্বর্ণ রায়কে বসে থাকতে দেখে পরস্পরে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলে। অনিল ও চামেলী হাসি হাসি মুখে নমস্কার জানালে স্বর্ণ রায়কে।

—সেই যে বীথির খবর দিয়ে চলে যাওয়া হল, বাস, আর কারো দেখা নেই! কথা বলতে বলতে উষা দেবী ঘরের চেয়ারে বসতে যাবেন অনিল ও চেমেলীকে নিয়ে, এমন সময় আবার ঘণ্টা বাজলো—ডিং ডং ডিং ডং…

—ঐ বুঝি মনীষ ও ইন্দুরা এলো।

উষা দেবী এই কথা বলতে বলতেই এগিয়ে গেলেন সদরদরজা খুলে দিতে।

—এই তো, এত দেরি করে?

উষা দেবীর কথার উত্তরে মনীষ বলতে বলতেই ইন্দুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো —বাড়ি ফিরে খবরটা পেয়েই আসছি তো। দেবীর একটু সাজগোজ আছে তো। কুটুম্ব বাড়িতে আসছি।

—কি যে বাজে কথা বলছো দিদির কাছে। আমার জন্যে দেরি, না দেরি তোমার? ছেলেকে শা-লাদির বাড়ি রেখে তবে এলেন আর দেরি হল আমার! বললে ছেলেকে শর্মিলাদির ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে রেখে যাবো, তাই তো দেরি।

—আচ্ছা আচ্ছা, তা হোক। বসে বসে অনেক কথা আছে…

সকলের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হল।

স্বর্ণ রায় এদের কাছে আবার বললে—বীথির সঙ্গে সোনার একটা সামাজিক প্রীতি উৎসবের দরকার ··· বলে আমার মনে হচ্ছে। তাদের দেখে তো বেশ ভালোই লেগেছে আমার। অবাধ এবং অক্ষুণ্ণ এয়োতির অধিকার পাক।

—হ্যাঁ, তা সত্যিই।

অনিল বললে।

উষা দেবী তখন উচ্চারণ করে ফেললে—সে কি?

—হ্যাঁ, আমিও দেখেছি, বন্ধুর সঙ্গে কথাও হল। সোনাকে তো বেশ ভালো মাইনেরই কাজ কোলিয়ারীতে করে দিয়েছে। এখন তো সরকারী

ব্যবস্থায় চলে এসেছে সব কোলিয়ারীগুলো তাই সাধারণ চাকুরেদের মাইনে-পত্তর ভালোই হয়েছে।

অনিলের কথা শেষ হতেই স্বর্ণ রায় বললে—তা ছাড়া সোনা নিজেকে একেবারে কাজের ছেলে করে ফেলতে চাইছে। সে তো বলেই ফেললো, বেকার জীবন যখন চলে গেলো, তখন আর ভাবনা কি তার! সে নিজের চাকরী আর ঘর সংসার নিয়েই থাকবে। আমায় বললে, কাকা অন্য কিছু আর ভাববো কেন?

—বীথির বন্ধুর স্বামী কোলিয়ারীর সহকারী ম্যানেজার। বেশ বড় দরেরই মানুষ। তার আওতায় এসেছে, মনে হয় সোনা আর বীথি সুখের মুখই দেখে নিয়েছে। এখন তো তাদের সংসারেই রয়েছে। তারা তো দুজন প্রাণী। তাদের একমাত্র ছেলে কলকাতায় পড়াশোনা করে মায়ের কাছে থেকে। কোনো চিন্তা নেই, বেশ আছে বীথি বান্ধবীর সঙ্গে। রান্না-বান্না নিয়ে দুই বান্ধবীতে আছে।

—সত্যি ভাবলেও ভালো লাগে কেমন।

চামেলী কথাটা বলে বসলো ফস্ করে।

ঊষা দেবী কথাটা অন্যভাবে ধরে নিয়ে একটু রাগের মেজাজেই বলে উঠলেন—তা আর নয়, আমার মেয়ে বান্ধবীর ঘরে রয়েছে ভাবতেও ভালো লাগছে। খুব···

—না না, দিদি, আমি সে ভাবে বলি নি।

—তবে আর কি ভাবে শুনি।

—এই দেখুন না, আমার কোন বান্ধবীই নেই কি না, তাই বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না।

ইন্দু এবার চামেলীকে ঠেস পেরে বললো—ঠিকই, আমারও তাই মনে হয়, বান্ধবী ভাগ্য বটে বীথির।

—থাক তোমাদের আদিখ্যেতা খুব হয়েছে।

ঊষা দেবীর কথায় কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করে মনীষ বললো—তা এখন কি করা যায়? একটা সমাধান···

মনীষ কথা শেষ করতে পারে না। তার আগেই ঊষা দেবী তেলেবেগুনে জলে উঠলেন যেন। বললেন—কি যে সব আজেবাজে চিন্তা নিয়ে আসা হয়েছে তা বুঝি না। সমাধান আবার কিসের? কর্তা যা ভালো মনে করেন

নি, আমি কোনো মতেই তাকে মানবো না। আর সেই মানবো না যে তাই জানাতে ডেকেছি আজ। আমি ঠিক করেছি আমার যা আছে নিজস্ব বা আমার যা থাকবে তার অংশটুকুই মেয়ে পাবে আর কর্তার যা কিছু তা তিনি তো উইল করেই গিয়েছেন, তা সেই মতোই হবে।

অনিল বলে উঠলো—উইল? হ্যাঁ, ঠিকই তো তিনি একটা করছিলেন তবে তার খসড়াটা নিজেই করেছিলেন। আমায় আর দেখান নি। কি আছে তাতে?

—এই তো, দেখলেই বোঝা যাবে।

—তা অনিল বাবুকে দেখালেই হয়। কর্তারই অনুজ উকিল…

সুবর্ণ রায় কথাটা বলতেই উষা দেবী টেবিলের দেরাজ থেকে নিয়ে উইলটি অনিলের দিকে মেলে ধরলেন। অনিল মন দিয়ে পাতার পর পাতা পড়তে থাকলো।

সুবর্ণ রায় বললে—জোরে পড়লেই তো হয়।

তখন মনীষ বললে এর উত্তরে—থাক, অনিল বাবু পড়ে নিয়ে বলুন, তা হলেই হবে।

উষা দেবী বললেন—আর কি শুনবে? আমার জীবনকাল পর্যন্ত আমি সব ভোগ করতে পারবো। তার পর সম্পত্তির সব কিছু মেয়ে পাবে যদি সে আমার মনের মতো পাত্রকে বিয়ে করে। কিন্তু তা তো সে করে নি। কাজেই বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের আর কোনো অধিকার নেই। তবে আমি তাকে আমার গয়না যা থাকবে বা নগদ টাকা যা আমার নামে থাকবে তার সবটুকুই বীথিকে দিয়ে দেবো।

—সুন্দর। তাই ভালো।

সুবর্ণ রায় কথাটা আবেগ ভরেই বলে উঠলো।

তখন অনিল উইল পড়া শেষ করে বললে—আপনি ঠিকই বলেছেন, কর্তা উইলে আপনার বলা কথাই লিখে রেখে গি॰॰ছেন।

—হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ। সে কথা তো সে সময় বলেই গিয়েছিলেন।

উষা দেবী বেশ বিজ্ঞের চালে কথাটা বললেন সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

—তা হলে এখন কি করবেন?

মনীষ প্রশ্ন করলে উষা দেবীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে।

অনিল বললে—তাই তো আপনি কি করবেন, বলুন ?

স্থবর্ণ রায় আবার বলেই ফেললে—উনি আর কি করবেন ? উনি কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করবেন।

—কি বলছেন ? না না, তা হয় না দিদি।

চামেলী বলে বসলো।

উষা দেবী তবুও চুপ করে রয়েছেন। তিনি ভাবছেন।

ইন্দু বললে—একেবারে বীথিকে এমনি ভাবে ঠেলে ফেলা কি ঠিক হবে দিদি ?

—আর উপায়ই-বা কি ? আমি তো নিমিত্তি মাত্র। যা করার তাতো তিনি করেই গিয়েছেন।

মনীষ প্রশ্ন করলে—মেয়ে কি এ সব খবর জানে ?

—তা জানে বৈকি ? তাকে জানাবার জন্তেই তো কর্তা এই উইলটি করেছিলেন। মেয়েকে বসিয়ে পড়ে শোনালেন যেদিন কর্তা, সেদিন মেয়ে নিজে মুখে একটা কথাও বললে না। কি জেদী মেয়ে। বাপের বেটি তো। কিছু না পেলেও বাপের জেদটা পেয়েছে ঠিকই, বাপের মতোই জেদী মেয়ে।

অনিল বললে—তবে আপনাদের একমাত্র সন্তান তো, এ উইল নিয়ে মামলা শেষপর্যন্ত আদালতে গেলে নাও টেঁকতে পারে।

—সে কি, কর্তা কি এত কাঁচা কাজ করতে পারেন ?

—না ঠিক কাঁচা কাজ নয়। তিনি মেয়েকে দেখিয়ে পাকা বাঁধন দিলেন ভেবেই করেছিলেন। আসল আইন তো জানেন, যা হবার তা রোধ করা যাবে না। কথাই তো আছে, চঞ্চল জলতরঙ্গ রুধিবে কে ?

মনীষ কথা ধরে বললে —কথাটা বোধ হয়, যৌবন জল তরঙ্গ রুধিবে কে ? তাই না স্থবর্ণ বাবু ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ক্ষণে ঠিক কথা। তিনি জেনেই ছিলেন এ মেয়েকে বাঁধতে পারা যাবে না। সে যতদিন বাগে থাকে ততদিনই মঙ্গল। তাই এই উইল। উটপাখির চোখ লুকিয়ে ঝড় আঁটকানোর মতো আর কি ?

স্থবর্ণ রায় কথা শেষ করতেই উষা দেবী বলে ফেললেন—যাক, তা হলে আমি বাঁচলুম।

স্থবর্ণ রায় বললে—তার মানে ?

অনিল বলে উঠলো—কিসে বাঁচলেন

—বীথি তা হলে বাপের সম্পত্তি পাবে ?

অনিল উত্তর দিলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাবেই তো ?

স্বর্ণ রায় খুশিমনেই বললে—তা হলে বীথির সম্পত্তি পাওয়ায় খুশি হওয়া গেল অথচ তাদের প্রীতিবন্ধনের সামাজিক দায়িত্বটুকু আর বাকি থাকে কেন ? সেই শুভক্ষণের দিনটা ঠিক হোক এবার।

—সে কাজটি কিন্তু আমি কখনোই পারবো না। কর্তা তো সে কাজ প্রাণ থাকতে পারবেনই না বলেছিলেন। আমি অনেকরকমেই তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি কিন্তু তিনি কিছুতেই এ কাজে মত দেন নি।

চামেলী বললে—এখন আপনি সে কাজটুকু করেই ফেলুন দিদি। সবদিক থেকে ভালোই দেখায়। কর্তারা অমন একগুয়েমী করেই থাকেন।

ইন্দু এবার চামেলীর কথায় সাহস পেয়ে বলে উটেছে—ঠিকই তো। এমন বিয়ে তো দিদি, আমরা হামেশাই দেখছি। এতে আর চক্ষুলজ্জার কি আছে ?

—না না, চক্ষুলজ্জার নয় গো। কর্তার ইচ্ছা নয় যে কাজের আমি তা কি করে করি ? আমি তো তা পারি না বোন।

স্বর্ণ রায় আবারও বললে—এই দুঃখটা সেধে আনা হচ্ছে। এখন সামনের দিকে চাইবার সময়। পেছনের দুঃখের জের টানা নয়। শুধু সামনের দিকে চলছে যারা তাদের সুখী করার মন করতে হবে। যে ক্ষণটি বয়ে যাচ্ছে তাকে মধুময় করে তুলতে হয়, মাধুর্যমণ্ডিত করে রাখতে হয় ; খণ্ড খণ্ড মধুর ক্ষণ নিয়েই তো অখণ্ড অমেয় মাধুরিমা।

—সুন্দর, ভারী ভালো লাগছে শুনতে। কিন্তু কি করি ?

উষা দেবীর এ কথার উত্তর স্বর্ণই দিলে—কোনো দ্বিধার তো অবকাশ নেই। তিনি যা ঘটাচ্ছেন তাই ঘটবে। আমরা নিমিত্ত মাত্র। পরলোকগত আত্মা অদৃশ্য থেকে কাজ করাচ্ছেন। এখনো তো তার শক্তিক্রিয়াশীল। না হলে কি বীথির এত সাহস হয় যে সে মাকে ছেড়ে চলে গিয়ে সোনাকে রেজিষ্ট্রী বিয়ে করে।

—তা হলে কি কর্তার আত্মারই প্রেরণায় বীথি···

—অবশ্যই তাই।

অনিল প্রশ্ন —আপনি কি প্ল্যানচেট করেন ?

তবে কি জানেন এই বিষয়টার মধ্যে যখন গভীর

ভাবে চিন্তিত হয়ে থাকি তখন আমি যে ভাবেই হোক শুনেছি এটা বীথির পক্ষে ভালো হবে। পিতৃ-আত্মার যথার্থ নির্দেশও এখন রয়েছে এ কাজে।

—কি বলছেন স্থবর্ণ বাবু। আপনি কি কোনো পরলোকচর্চায় মুগ্ধ হয়ে থাকছেন ?

—হ্যা ঠিকই, এখন থাক তবু ও কথা।

স্থবর্ণ রায় কেমন যেন উদাসভাবে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়েই থাকলো। সবাই বুঝলো ও প্রসঙ্গে বেশি কথা বলতে সে নারাজ।

মনীষ তবুও ফের প্রশ্ন করলে—আপনি কি বীথির পিতৃ-আত্মা কি চাইছেন তা জানতে পেরেছেন ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন, একরকম জানতে পেরেছি।

অনিল এবার স্থবর্ণ রায়ের কথায় অবাক হয়ে যায়। বলে—কি বলছেন সব, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

উষা দেবী তখন তাকিয়ে থাকছেন স্থবর্ণ রায়ের দিকে অবাক তুচোখ তুলে। ইন্দু ও চামেলী তো বটেই।

মনীষই প্রশ্ন করলে—তা হলে তো, এবার আমার ভগ্নিপতিকে খবর পাঠাতেই হয়। আস্থক সে এবার, ভাগ্নির শুভকাজের সব কিছু আনুষ্ঠানিক, যা কিছু করণীয় তার আয়োজন করুক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই তো ; তাই ঠিক হোক তা হলে। তাই ঠিক··· উষা দেবী কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন। কেমন যেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাই দেখে সবাই তাঁর দিকে তো তাকিয়েই থাকলেন। তিনি বুকের কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে মাথার ঘোমটা সামলিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কর্তার ছবির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর নির্দেশ রয়েছে বীথির বিয়ের! তাই তো—ভাবছেন।

স্থবর্ণ রায় বললে—আত্মার যে শক্তি অসীম। সে শক্তি কেমন তা সহজে ভাবা যায় না। আজকের তুনিয়ায় পরমাণু শক্তির মতো। মানুষের দৈহিক শক্তি তো স্থূল কিন্তু আত্মার শক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল। সহজে যা বোঝা যায় না কিন্তু সব সময় ক্রিয়াশীল।

—তা হলে কি তাঁরই আত্মা বীথিকে শক্তি দিয়েছে ?

উষা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে স্থবর্ণ রায় আবার [illegible]—হ্যাঁ, সে কথা তো

আগেই বলেছি। সেই শক্তির জোরেই তো সে এ ঘর ছেড়ে বরের ঘর বেঁধেছে। এখন পরের হলেও—বরেরই ঘর পেয়েছে।

—এ কেমন ঘর বাঁধা। এ কেমন মন পাওয়া গো। আমার যে বড় মন কেমন করছে। কর্তার নির্দেশ কি—তা আমি নিজে শুনতে কি পাবো? আমার যে তাঁর গলার স্বর শুনতে ইচ্ছে করছে।

—দেখি জিজ্ঞেস করবো। যদি সম্ভব হয় তাও হবে।

—হবে, সত্যি হবে? তা হলে বড় তৃপ্তি…

উষা দেবী আবেগ নিয়ে আগ্রহ নিয়ে সুবর্ণ রায়ের কথার উত্তরে তখনই বলে উঠলেন।

অনিল বললে—সুবর্ণ বাবু যখন বলছেন, তখন আমাদের তাঁর কথার মর্যাদা দিয়ে কাজে এগিয়ে যাওয়াই তো ভালো। মনীষবাবু ভগ্নীপতিকে খবর পাঠান যেন ভাগ্নির প্রীতি অনুষ্ঠানের দিনে ঠিক এসে যান। আমরা এদিকে সব কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলি।

—সেই ভালো। আমি চিঠি লিখে দেবো। আমার মা-বাবাও আসবেন সেই সঙ্গে তা হলে। অনেক দিন মেয়ে-জামাইয়ের কাছে রয়েছেন।

ইন্দু বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথাই ভালো।

চামেলী বললে—সুবর্ণবাবু যখন বলছেন দিদি, তখন আর কোনো দ্বিমত করা ঠিক নয়।

সুবর্ণ রায় শুধু বললে—এবার দেখুন যা ভালো হয়।

—ভালো যা তা আপনি তো বলেছেন, সেটাই ঠিক আমাদের মনে হয়। মনীষ জোর দিয়ে কথাটা বললে।

উষা দেবী এবার স্বামীর ছবির দিকে শুধু চেয়ে থাকতে থাকতেই বলে ফেললেন—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হবে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। যা করাবেন তিনি তাই করে যাবো। আমার আর কিছুই বলার নেই।

মনীষ বা অনিল কেউই সুবর্ণ রায়ের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষাকে উপেক্ষা করতে পারে না। এমন একটা সমীহ-আকর্ষণকারী প্রকৃতি এক-একজনের জন্মগত থাকে যাকে বলা যায় বিশিষ্টের অধিকার নিয়েই তাদের জন্মগ্রহণ। সকল সমস্যার সমাধানে, সকল বিষয়ের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনে, সকল কর্মের সাফল্যবিধানের কারণে কিম্বা অকারণে সামাজিক মানুষ মাত্রেই তাদের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে। এমন সব মাথার বোঝা তার কাছে নামিয়ে রাখা যায়।

অথবা বললে ভালো হয় যে নিজের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু সেই সব পরের বোঝা সোজা হয়ে যায় তাদের কাছে, সব ভার লঘু হয়ে যায় বেমালুম।

এমন মানুষ সুবর্ণ রায়। সকল চিন্তার সঠিক সমাধানও তাই তারই কাছ থেকে সকলেই আশা করে থাকে।

এবং সেই আশায় তো উষা দেবীও বেশ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন বা উঠেছেনই বলা চলে। বিশেষ করে একটা পরলোকতত্ত্বের জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষরূপে সুবর্ণ রায় চিহ্নিত হয়ে যাওয়ায়। এ বিষয় দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞানীর অনেক বাণীই আছে, তবু এখানে সুবর্ণ রায় যে সবারই মধ্যে বিশিষ্ট, সেই যখন আভাসে বলেছে যে তার দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে এমন ইঙ্গিত আছে যা অবিশ্বাস করার নয়।

তাই মনীষ শুধু বললে—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

—ঠিক ঠিক।

উষা দেবী বলে উঠলেন। অনিলও তার কথায় সমর্থন জানাতে গিয়েও নিজের উকিলী চালে আঘাত লাগবে তাই বলে বসলে—তবে ভালো করে যাচাই করে বিশ্বাস করলেই ভালো হয়। চালু কথা বলা চলে, মনীষবাবু ঠিকই বলেছেন অবশ্য।

—তা কেন? মনীষবাবু ঠিকই বলেছেন। বিশ্বাস নিয়ে চলতে হবে। সুবর্ণবাবু যখন জোর দিয়ে বলছেন তাঁর কোনো শক্তির মধ্যে সব জানতে পারেন…

চামেলীর কথায় শুধু সায় দেয় ইন্দু। —ঠিক কথা, সব আত্মাই আছেন, আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না। অবশ্য অনেকে নয় কেউ কেউ পারেন।

—না না। অতটা বলা ঠিক হচ্ছে না। সে যাই হোক এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা না হওয়াই ভালো। তবে আপনারা উষা দেবীর এই বিষয়ে চিন্তা করছেন করুন, ওসব কেন?

সুবর্ণ রায়ের কথায় বেশ একটা উদাসীনতা প্রকাশ পেল। সে চায় না ও প্রসঙ্গের বৈঠকখানার আলোচনা। ওটা সে নিজের একান্ত বিশ্বাসে ধরে রেখেছে। জনতার জন্যে নয়, এটার মধ্যে জনবিরল মানসিকতায় বিহার চলে। সুবর্ণ রায় শুধু বললে—আপনারা যাই বলুন বীথি সুখী হবে। আমি আদেশ যথাযথ পেয়েছি।

উষা দেবী ভীষণ খুশি হয়ে গেলেন। বললেন—যাক আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। যা ভালো হয় তাই হোক।

—আর কোনো দিক তা হলে ভাববার নেই তো?

অনিল প্রশ্ন করে বসে তখন উষা দেবীর দিকে ফিরে। তিনি বলে উঠলেন—আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না। কর্তার আদেশ যখন এসেছে তখন হবেই। বীথির ভালো হবে যখন তাই হোক।

—এটাই সম্ভব বলছেন। আমি তো ভেবে পাচ্ছি না এমন এ যুগে হতে পারে বলে। কর্তার অশরীরি আত্মা এসে সুবর্ণ বাবুর সঙ্গে কথা বলে যান।

—আবার ঐ সব কথা।

চামেলী বলে ওঠে অনিলের দিকে চেয়ে।

ইন্দু বললে—ঠিক ঠিক ও বিষয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করা কি ঠিক হচ্ছে?

অনিল বললে—আমি ঠিক বুঝি না ওসব।

—তবে চুপ থাকো।

চামেলী ছোট্ট উত্তর দেয় অনিলকে।

—আমার তো ভারী ইচ্ছে করে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু সে কি হবে?

উষা দেবীর আগ্রহ ভরা প্রশ্নের জবাবে সুবর্ণ শুধু বলে উঠলো—দেখি যদি তাঁর ইচ্ছে হয়, হবে বৈকি।

—সেই আশা নিয়েই রয়েছি। মনে করেই কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

মনীষ বললে—হ্যাঁ! তা হলে তো ভালোই হয়।

সুবর্ণ বললে তখন—আমি চলি এবার। রাত্ত তো হয়ে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে অনিলও বললে—আমরাও উঠি।

মনীষও বললে—আমরাও আজকের মতো এগোই।

উষা দেবী বললেন—সে কি? এখনো তো দশটাই বাজে নি, এর মধ্যেই উঠি উঠি, এটা কেমন হল। না, না; সবাই চলে গেলে হবে কেন? আমি কিন্তু ভীষণভাবেই আশা করে রয়েছি কর্তার সঙ্গে একবারটি কোনোক্রমে যদি একটুক্ষণ কথা বলতে পারি।

—সুবর্ণবাবু, আর একটু যদি থাকেন ভালো হয়।

মনীষ কথা কটা বলেই দাঁড়িয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুও।

অনিলও চামেলীকে নিয়ে উঠেছে।

—আমি এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাই নি। বেফাস কথাও এ বিষয়ে আলোচনা হোক তাও তো চাই না। তাই আচম্‌কা একটু অসতর্ক ভাবে বিশ্বাসবদ্ধ মনের কথা বলা হয়ে গিয়েছে, ও কথা আপনারা না বিশ্বাস করলেও আমি কাজে এগিয়ে যাবো। বীথির যথাযোগ্য সামাজিক শুভকাজ সম্পন্ন করাবো তা যেমন করেই পারি। তাদের শুভক্ষণকে বৃথা বয়ে না যেতে দিতে সহায়তাই করবো।

—না না, সে কি ? আমরা সে বিষয়ে একমত।

মনীষ বিব্রত হয়ে বলে ওঠে।

অনিলও চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে ছিল। সেও বললে—বীথির সামাজিক শুভকাজ হবে অবশ্যই। সে কথা তো আগেই হয়েছে। উষা দেবী মন করেছেন যখন। আবার আমরা আসবো, আজ আসি।

—কর্তার ইচ্ছেতেই হবে। এখন আমি নিমিত্তিমাত্র। সব ঠিক হবে।

উষা দেবীর কথাগুলো এবার বেশ জোরের সঙ্গেই যেন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। সকলে আর দ্বিমত রাখছে না। স্বর্ণ রায় বসে রইল অভ্যাগতরা ঘরের বাইরে চলে এসেছে।

যার যেমন চিন্তা।

শার্মিলার আবার বিয়ের সম্বন্ধ করতেই মন ছুটছে, মায়ের মন বলে কথা। মেয়ের জন্যে কোন মায়ের না মন কাঁদে ? শর্মিলা বাড়ির বাইরে গিয়েছে এই ফাঁকে তার মা ছেলে সুশোভনকে নিয়ে চললেন স্বর্ণ রায়ের বাড়ি। তার বাবা সিদ্ধিনাথ বাবুর কাছে গিয়ে সরাসরি কন্যাদায়গ্রস্থ জননীরূপে হাজির হবেন। তিনি দেখছেন—স্বর্ণ রায়ের মতো ছেলে এখনো অবিবাহিত, আশ্চর্য। কি যে ভালোছেলে ! কেমন পরোপকারী, দরদী ; পরের জন্যে যথেষ্ট উপকারী মন আছে, আর কি সুন্দর স্বভাব ! বিয়ে হয় নি এখনো, আমাদের শর্মিলার জন্যেই তবে বুঝি তার অপেক্ষা ?

এই সব চিন্তা নিয়ে শর্মিলার মা স্বর্ণ রায়ের বাবা সিদ্ধিনাথ বাবুর কাছে চলছেন একমাত্র ছেলে সুশোভনকে সঙ্গে নিয়ে।

বিকেলেই রাত্রির রুটি তরকারী করে রেখেছেন। এসে খাবার দেবার সময় সব কিছু একটু গরম করে দেবেন। বড় পরিশ্রমী মা শর্মিলার। একা সংসারের খুঁটিনাটি সব কিছু করে আসছেন। বিধবা হয়েছেন সেই কবে! শর্মিলা ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীরূপে মাস মাহিনায় যা পায় তাতেই সংসার চালিয়ে দিচ্ছেন। দীপ্তেন্দুর সঙ্গে সব কিছু ঠিক হয়েও হয় না, আবার হবে হবে করে আশা নিয়ে থেকেও শেষসংবাদ এলো দীপ্তেন্দু ট্রেনের মধ্যে ছিনতাইকারীদের সায়েস্তা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। মা হয়ে তবু এবার মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবার চেষ্টাটুকু চালিয়ে যাবেন। ভবিতব্য যার যেখানে হবার তা কেউই খণ্ডাতে পারে না—এ কথায় বিশ্বাসী শর্মিলার মা।

তাই নতুন চেষ্টা তিনি চালাচ্ছেন এবার সুবর্ণের সঙ্গে যদি শর্মিলার বিয়েটা হয়। ভারী ভালো হয়। দুজনে তো বেশ গল্প করে। মনের রোগের চিকিৎসকের কাছেও যায়। এখন তো মেয়ের মন ভালোই লাগছে। শর্মিলার মায়েরও মনে ধরা পড়েছে শর্মিলার ফুর্তি যেন মনে ফুটবো ফুটবো করছে ফের।

শর্মিলার মায়ের ধারণা বোধ হয় সুবর্ণের সাহচর্যে।

মা হয়ে মেয়েকে ভালো করেই জানেন যে, মেয়ের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

তাই নিজেই চলেছেন আসল জায়গায় কথাটা প্রস্তাব করে আসতে। উপযুক্ত ছেলের উপযুক্তা মেয়ে। সংযুক্তা করতে মায়ের মনের ব্যাকুলতা।

সিদ্ধিনাথবাবু সুবর্ণের বাবা, স্ত্রী বিয়োগের পর প্রায় সমবয়সী অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়দের নিয়ে নিজের ঘরে সকাল সন্ধ্যে পাশা খেলা নিয়ে সময় কাটান।

পাশার দান চলছে, খেলা জমে উঠেছে এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।' সিদ্ধিনাথবাবু একটু বেশ বেজার স্বরেই হাঁক দিলেন—কে?

কচি বালকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—সিদ্ধিনাথবাবু আছেন?

—কে আবার এলো? খেলাটা জমে ছিল বেশ।

—তা হোক, দেখা দরকার যেই হোক।

পাশার-সাথী একজন প্রৌঢ়ের উক্তি।

—হ্যাঁ, তাতো দেখবোই।

মৃদুস্বরে বল্‌তে বলতেই উঠে পড়লেন সিদ্ধিনাথবাবু। মনে তাঁর একটা অনিচ্ছার একটা অনীহার শৈথিল্য।

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলেন, দেখলেন তিনি একজন বিধবা প্রৌঢ়া মহিলা আর এক বালক দাঁড়িয়ে। তাঁর সন্ধানে এ এক অভাবনীয় অতিথি। বেশ আশ্চর্য চোখেই চেয়েছেন।

—আমিই সিদ্ধিনাথ রায়। আসুন আপনারা।

সিদ্ধিনাথবাবুর দুটি ঘরের মধ্যে একটি ঘরে পাশার আসর কাজেই অন্য ঘরে নিয়ে বসালেন। সেই ঘর সুবর্ণের। যাই হোক সিদ্ধিনাথবাবুই কথা বললেন—আপনি কোথা থেকে আসছেন? কেন আসছেন? তা জানতে পারি কি?

খুব ধীরে ধীরে মাথার সাদা ধুতির ঘোমটার ফাঁক থেকে বিধবা মহিলা বলছেন—আমি কলকাতা থেকেই আসছি। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের কথা পাড়তে। আপনি যদি রাজি হন তা হলেই সব হয়।

—নানা, সে একেবারেই অসম্ভব।

সিদ্ধিনাথবাবু এবার বেশ সহজ গলায় বলে উঠলেন। তিনি যেন এতক্ষণে তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি বিধবা মহিলাকে আচমকা বিকেলে এক ছেলের হাত ধরে আসতে দেখে অন্য অনেক চিন্তার তাৎক্ষণিক বিচলিত হয়েছিলেন। তার জন্যে বোধ হয় তিনিও লজ্জিত মনে মনে।

—আমার মেয়ে শর্মিলা, তার সঙ্গে আপনার ছেলের পরিচয় বেশ কিছুদিন হয়েছে। বড় ভালো ছেলে সুবর্ণ, আমার মেয়ের কথা আমি নিজে মুখে আর কি বলবো। আপনার ছেলের ভালো লেগেছে মানে বুঝতেই পারছেন কেমন মেয়ে।

—কি বলছেন আপনি? আমার ছেলের···

বেশ অসংকোচে শর্মিলার মা বলতে থাকলেন—না না, আপনি অমত করবেন না। আপনি আর অমত করবেন না।

—সুবর্ণ কি বলেছে যে,···

—আপনিই বলবেন বাবা হয়ে, সে কি বলতে পারে?

—তা কই, আপনার মেয়ের সঙ্গে যে ওর পরিচয় তাতো আগে জানি নি কখনো। কদ্দিনের আলাপ?

—দেখুন আপনাকে দেখে নিয়ে করতে হবে, আমি মেয়ের মা হিসেবে প্রথম বলতে আসতে হয় তাই এসেছি আজ শর্মিলার বাপ বেঁচে থাকলে তিনিই আসতেন। আপনি খোঁজ নিয়ে বুঝে শুনে করবেন।

—কিন্তু মা আপনি তো জানেন না যে ছেলে বিয়ে করার কথা কানেই নেয় না। আমি তো আমার একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবার জন্তে পাগল।

কথাগুলো বলতে বলতেই সিদ্ধিনাথ বাবু কেমন যেন উদাস চোখে ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া একফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

—বেশ, তা হলে তো ঠিকই আছে। তবে আর না না, অসম্ভব এত বলছেন কেন?

—এই যে বললুম মা, আমার ছেলে বিয়ের কথায় কোনো আমল দেয় না আমায়।

—তা বললে তো হবে না, আপনি ছেলের বাপ, আপনাকেই তো আগবাড়ান হয়ে ছেলেকে রাজি করাতেই হবে।

সিদ্ধিনাথবাবু চিন্তিত ভাবেই বললেন—সে চেষ্টা তো অনেক করেছি কিন্তু···

—কিন্তুর কিছু নেই আমাদের ঘর সন্ধান নিয়ে দেখবেন পাল্টি ঘরই হবে। এই সুশোভন তোর বাপের নাম ঠিকানা লিখে দে বাছা একটু সুবর্ণের বাপকে।

—হ্যাঁ মা, এই যে দিচ্ছি। বাবা একটু কাগজ পেন্সিল দিন, লিখে রেখে যাচ্ছি।

—তা লিখে দেবে দিয়ো। মা আমার তো বিশ্বাস হয় না যে সুবর্ণ রাজি হবে। তবে যদি মন বসে থাকে সে আলাদা কথা। এবং এক পক্ষে ভালোই হল আমার আর খুঁজে পেতে এতদিনে যে হাঙ্গামা পোয়াতে হয়েছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলুম।

শর্মিলার মা বেশ খুশি হয়ে বলে ফেললেন—তা হলে সুবর্ণকে বিয়ের কথা বলুন এবার।

—হ্যাঁ, তা বলবো কিন্তু আর বলবার তো অপেক্ষায় নেই কারণ তাদের সঙ্গে তো আলাপ হয়েই রয়েছে বলছেন। শুভদৃষ্টি তো মা তাদের হয়েই গিয়েছে। আমার আর কিছু···

—আপনি কথাটা কেন যে ঐ ভাবে বলছেন? দেখুন মা হয়ে আমি মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি বলে যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে···

—না না, সে কি? আপনি কি বলছেন! আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি। পুত্রদায়গ্রস্থ আমি, কন্যাদায় গ্রস্থের মন যে কি হবে তা বেশ বুঝতে পারছি।

তার ওপর মা আপনি বিধবা, আমি বিপত্নীক। আমার ঘরে বৌমাকে লক্ষ্মীর মতো ঘরের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো কত ভাবি কিন্তু তার আর উপায় দেখি না। এখন ওকথা শুধু ভাবতেই ভালো লাগে!

সিদ্ধিনাথবাবুর কথার জবাবে শর্মিলার মা অসংকোচেই বলেন—আপনি একটু উঠে পড়ে লাগলেই হবে।

—মা, আমি কি কম উঠে পড়ে লেগেছি। সে আজকে নয়। সেই কবে থেকে। কিছুতেই ধরাছোঁয়া যায় না যে স্থবর্ণকে। দুরজ্ঞেয় মা, ছেলে আমার দুরজ্ঞেয়।

নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করে বলে গেলেন শর্মিলার মা—না না, বড় ভালো ছেলে।

—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তবে কি জানেন, তার মনের নাগাল পাওয়া ভার। কোন রাজ্যে যে তার মন, সে শুধু সেই জানে।

—বাপের কাছে সমীহ করে চলে, সব ছেলে কি আর ঘরের মধ্যে মনকে বেঁধে রাখে।

—হ্যাঁ, সে কথা মানছি, পরোপকারী ঘরে পরে উপকার করে থাকে।

সংকোচটা কেটে যাওয়ায় শর্মিলার মা গড়গড় করে কথা কয়ে চলেছেন—তবে, তবে, কি ভালো ছেলে আপনার।

—মুশকিল কি জানেন মা, সে যে এখন কি করে সন্ধে থেকে বাড়ি এলে ঘরের মধ্যে বসে, তা সেই জানে। কথা কয়, না কিছু পাঠ করে নিজের মনে ঠিক বুঝি না; তবে কিছু একটা যে করে তা বেশ মনে হয়। কারণ ও বলে দিয়েছে ওর খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে, ও সময় মতো খেয়ে নেবে। কিন্তু কি জানেন মা, এক এক রাত না খেয়েই কাটিয়ে দেয়।

—সে কি, এতো ভালো কথা নয়। বিয়ের ব্যবস্থা এখনই করুন আর তো দেরি করা চলে না। আপনার ছেলে স্থবর্ণকে কিন্তু আমি যে বড় ভালো বলে জানি তাই…

—না না, ঠিকই বলছেন, আচ্ছা একবার দেখি আজ কথাটা পেরে। সে কি ভাবে যে…

—আমি বলছি সে ভালো ভাবেই কথা শুনবে! দেখুন বাবা একবারটি বলেই দেখুন। আমার খুব বিশ্বাস।

সিদ্ধিনাথবাবু একটু চঞ্চল হয়ে বললেন—তাই বলবো। আপনাদের একটু মিষ্টিমুখ করাই বসুন।

—হ্যাঁ, করবো বাবা, আগে সুবর্ণ রাজি হোক আপনার কথায় তার পর। আমি তো এখন কিছু খাবো না। এই আপনার কথায় যে মিষ্টি রয়েছে তাই খুব হল। বেশ লাগলো আপনার সঙ্গে অল্প আলাপ করে।

—আমারও ভারী ভালো লাগলো। ছেলেকে নিয়ে আবার আসবেন। আমার তো ঘরে কেউ নেই যে আপনাকে অভ্যর্থনা করে, দেখুন যদি যোগাযোগ হয়, হবে। তখন মিষ্টি মুখ করবেন, আমি আর কি বলি এখন, দেখি মা, দেখি আজ একবার কথাটা বলে…

তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন—আপনি বললেই হবে। আমার মন বলছে।

তাতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন—আপনার কথাই সত্যি হয় যেন মা, সত্যি হোক।

—আজ আসি, প্রণাম জানাচ্ছি।

শর্মিলার মা তখনই উঠলেন তক্তাপোষ থেকে। ইশারায় ছেলে সুশোভনকে সুবর্ণের বাবাকে প্রণাম করতে ইঙ্গিত করলেন। সুশোভন পদস্পর্শ করে প্রণাম করলো। তিনি বললেন মাথায় হাত দিয়ে—থাক থাক, খোকা। কি নামটা গো তোমার ?

—সুশোভন।

—বা বেশ নাম তোমার, দিদির নাম কি ?

—শর্মিলা।

—আচ্ছা আচ্ছা, আবার এসো মাকে নিয়ে, আবার আসবেন মা, বড় ভালো লাগলো যে। আবার…

—আসতেই তো চাই, ভবিতব্য যদি থাকে…

—সে কথা যা বলেছেন ভবিতব্য!

সদর দরজা পর্যন্ত সিদ্ধিনাথবাবু এগিয়ে দিলেন।

ফিরে এসে আবার পাশাখেলায় বসলেন। এসেই বললেন—আরে বাবা, সুবর্ণের বিয়ের সম্বন্ধ এলো।

—তা বেশ তো।

বলে উঠলেন পাশার চাল দিতে দিতে সিদ্ধিনাথবাবুর খেলার সঙ্গীজন।

—বেশ তো মুখে বললেই হল না। এখন বিধবা মায়ের মেয়ে তার কথা মা নিজেই এলেন বলতে, আর কেউ নেই না কি? ঠিক বুঝি না।

—তাই না কি? তা হলে তো দেখছি প্রথমেই বেশ খোঁজ খবর নিয়ে তবেই এগোলে ভালো।

সিদ্ধিনাথবাবু উত্তরে বললেন—তা ঠিক, কিন্তু শুনছি স্বর্ণের সঙ্গে মেয়ের পূর্ব পরিচয় রয়েছে। দুজনের বেশ ভালো জানাজানি হয়েছে।

—তা হলে তো মা মেয়েকে দিয়ে ভালো মাছই টোপে তুলেছেন। আর ভাবনার কি আছে?

সিদ্ধিনাথবাবু এর উত্তর তেমন কিছু একটা না দিয়ে শুধু বলে উঠলেন—আচ্ছা, আমি দেখি খবর নিয়ে।

কথাটা বলেই তিনি চুপ করলেন। পাশা খেলায় মন দিলেন আপন নেশায়।

—তবু কথাটা ভেবে দেখে, ভালো করে খোঁজ করে তবেই এগোনো উচিত। আশ্চর্য, কোথাও কিছু নেই একেবারে বাড়ি বয়ে এসে মেয়ের বিয়ের কথা বলতে এসেছেন বিধবা মা হয়ে। ওরে বাস! আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ এভাবে বলতে এলে তো আমি কথাই বলতুম না।

সিদ্ধিনাথবাবু বললেন—সেটা কি ঠিক?

—আর ঠিক-বেঠিক?

—কেন?

সিদ্ধিনাথবাবুর প্রশ্নের উত্তর দেন—কি ধরনের মেয়ে, কি জাতের, সবটুক্ জানতে হবে আগে তার পর তো প্রস্তাব আসবে। তা নয় আগেই প্রস্তাব।

—থাক ভাই ও কথা।

—আমি যে সেই মেয়েটির খোঁজ দিই, তার কি হল?

সিদ্ধিনাথবাবু যেন কথাটা শুনতেই পান নি এমন ভান করে পাশার চালে মন দিলেন। বললেন—কই গো, চালো, চালো···

ছড়ানো মনকে গোটানোতেও বেশ মুনশিয়ানা চাই।

সিদ্ধিনাথবাবু পাশা খেলায় সব কিছুই ভুলে থাকতে চান।

জীবনের অনেকটা অংশই তো থাকে অনালোকিত একেবারে ঘনান্ধকারে আচ্ছাদিত—সামান্য অংশই হয় কিছুটা আলোকিত। সেই আলোকিত

অংশকে ছাপিয়ে জীবনের অনালোকিত ভূভাগকে মানচিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা বড় সহজ নয়। মানবচরিত্রের ইতিহাস বা বিজ্ঞান অনেকেই জানতে পারি কিন্তু তার ভূগোলকে কতটুকু জানতে পারি? কোন দ্রাঘিমায় কার অবস্থিতি এবং কেমন মৃত্তিকাস্তরে? সাদা চোখে যাকে দেখছি বিশিষ্ট ভদ্রলোক বা নেহাতই ইতর—গভীর ভাবে তার সঙ্গে মিলেমিশে দেখা গেল, সেই যে-লোকটিকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলে ভাবা গিয়েছিল আসলে তার মতো বদমাইশ আর দ্বিতীয় নেই ভূ-ভারতে বা সেই যে-লোকটিকে নেহাতই ইতর বলে বরাবর অবজ্ঞাই করে এসেছি, দেখা গেল ঘনিষ্ঠ হয়ে যে, সে-লোকটিরও মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন মহত্ত্ব। তাই সাদা চোখে যা দেখছি তাকেই ধ্রুবধ্যানে ধরে নেওয়ায় যে বিপদ নেই তা হলফ্ করে কেউ-ই বলতে পারেন না। জীবনটাকে একেবারে স্বচ্ছ জল ভাবা যায় না যে—ভাবতে পারলে ভালোই হয় কিন্তু ভাবা এক জিনিস আর বাস্তব জগৎ আর-এক। দুটিকে মেলাতে পারলে চমৎকার হয় কিন্তু বাস্তব সত্য তা কখনোই হতে দেবে না। খানিকটা ঢাকা থাকবেই—যা সহজে আলোকিত হয় না, যা সহজে চোখের সাদা দৃষ্টিতে ধরা যায় না।

হয় তো আমাদের তৃতীয় নয়নের পরিকল্পনা এই কারণেই। যা দুচোখের এক পলকে ধরা গেল না তাই তৃতীয় নয়নে ধরা যাবে। সে আলোকচিত্রে হুবহু প্রতিফলিত হয়—সেই তো আসল দর্পণে দর্শন।

মহাকাল বসে আছেন এই তৃতীয় নয়ন নিয়ে।...

এতক্ষণ বক্তা কথাগুলি একদমে বলে যাচ্ছিলেন। শ্রোতারা চুপ ছিলেন অনেকেই, উস্‌খুস্ করছিলেন দু একজন। বক্তার একটু বিরাম সময় আসতেই একজন তাঁর উস্‌খুসানি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বক্তা বেগতিক দেখে আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন তৎক্ষণাৎ—

মানুষ জীবনে যা দেখে যা শোনে তাই বিশ্বাস করার মন নিয়েই থাকে। যা দেখে নি বা শোনে নি তাকে নয়। কিন্তু এমন কতকগুলি ক্রিয়া-কর্ম থাকে যাকে সাধারণ মানুষ কোনোক্রমেই দেখতে বা শুনতে বা জানতে পারে না। তা প্রায় দৃষ্টির অগোচরে ক্রিয়াশীল। তার অনুধাবন বা অনুসন্ধান একমাত্র বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের ঋষিদৃষ্টিতেই সম্ভব। এবং মানবজীবনের যথার্থ ঋদ্ধি সেখানেই সূচিত হয়।

এর পর আর চুপ না থেকে সেই শ্রোতা ভদ্রলোক যিনি কিছু বলার জন্তে

দাঁড়িয়েছিলেন তিনি চেঁচিয়েই বলে উঠলেন—আপনি কি তা হলে সেই মহাপুরুষ। ভণ্ডামীর আর জায়গা নেই। যত সব…

সমস্ত আসরটি থমথমে ভাব ধারণ করলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই—না শ্রোতার না বক্তার। বক্তা তখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের প্রতি—মুখে প্রসন্ন হাসি।

এখানের উদ্যোক্তাদের কয়েকজন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওঠা ঐ ভদ্রলোকের দিকে ছুটে গিয়ে থামাতে চাইলেন। কেউ কেউ আবার মজা দেখতে গেলেন। তাঁকে সবাই বসিয়ে দিতে এসেছিলেন।

বক্তা হাত তুলে ইশারায় তাঁদের নিষেধ করলেন প্রশ্নকর্তাকে বিরক্ত না করতে। নীরব অন্যান্য শ্রোতারা।

শ্রোতাদের মধ্যে মহিলাও ছিলেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে একজন বিধবা মহিলা হঠাৎ বলে উঠলেন—কি যে হয়েছে দিন কাল, কারো কোনো কিছুতে আর বিশ্বাস নেই। সবেতেই বলা চাই—চলবে না, চলবে না। চলবেটা কি তা হলে, শুনি বাছা সব…

মহিলার কথা আর শেষ হল না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে থেকে অনেক কণ্ঠেই ধ্বনিত হল—ঠাকুমা কথা না কয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। ফোড়ন রান্নায় দিন। এখানে নয়।

এঁ্যা—বলেই কি যেন তিনি বলতে চাইছিলেন চম্‌কে উঠে, তা আর তাঁর বলা হল না তখনই।

এঁ্যা বলে চম্‌কেই থেমে যেতে হল। কিন্তু থেকে থাকা আর হল না তাঁর। হাঁটতে হল বাড়ির পথের দিকে।

—মাসিমা, আর নয় চলুন এবার। কথা কটা বলতে বলতেই ষোল সতেরো বছরের একটি ছেলে তাঁর হাত ধরে বললে—চলুন মাসিমা। খুব কথকতা শোনা হয়েছে এখানে, ঢের হয়েছে, এবার চলুন।

—সে কি রে? চলে যাবো এখেন থেকে?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন তিনি।

—হাঁ হাঁ চলুন তো।

মাসিমাকে প্রায় টেনেই নিয়ে আসে আসরের বাইরে। বলে—বাবারে, কি যে সব বাজে কথা বলাবলি চলে। কেন যে এলেন বুঝি না। এমনি শুনতে কি প্রতি সপ্তাহেই আসেন?

বাড়ির পথে চলতে চলতেই কথা হয়।

—আর কি করি। এখেনে এলে তবু একটু মনটা ভালো বোধ হয়। ধম্মের কথা তবু শোনা হয় কিছু।

—কিন্তু মাসিমা, এখানে যে সব অধম্মের দলই পাকিয়ে উঠছে।

—তা যা বলেছিস বাছা, ঠিক তো; আজ তারই আভাস যেন ফুটলো। বসে শুনলে হয় কথা, তা নয়, যত সব...

—থাক ও কথা মাসিমা, আপনি বাড়ির কাছে এসেগিয়েছেন এবার মায়ের কাছে চলুন।

—ও হ্যাঁ, এই তো বাড়িতেই এনে দিয়েছিস। চল মায়ের কাছে।

—মাসিমা, আপনি এখনো কিন্তু ঠিক নিজের মতো হয়ে থাকতে পারছেন না। পর পর ভাবছেন কেন? নিজেই চলে যান মায়ের কাছে, আমার আবার নিয়ে যেতে হবে কেন? আপনি তো বেশ অনেকদিনই এসেছেন। আর আড়ষ্ট হয়ে কেন থাকবেন?

—বারে বাছা, বেঁচে থাক বাছা, বেশ কথা বলেছিস তো। আর আড়ষ্ট হয়ে কেন থাকবো! ঠিক ঠিক, এ আড়ষ্টতা কেন থাকবে আর?

—দোতলায় যান মায়ের ঘরে। আমি দেখি দাদাবাবুর কোনো কাজ আছে কি না, জিজ্ঞেসা করি।

—হ্যাঁ, বাছা তাই ভালো।

সোজা ভেতর বাড়ির বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তার পর ওপরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকলেন। সিঁড়িতে উঠতে থাকলেন। সিঁড়িতে উঠতে বেশ কষ্ট হয় কারণ এভাবে তাঁর কখনো এমন সিঁড়ি নামা ওঠা করার সুযোগ আসে নি।

জীবনের তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখন এ প্রায় স্বর্গের সিঁড়ি যেন তাঁর কাছে। বড় পরিশ্রমের মনে হয়।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন।

হ্যাঁ, উঠছেন তাঁর জীবনের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতোই তবে বড় দেরিতে, বড় বেদনার বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে—বলা যায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে তবেই।

নিঃস্ব! কারণ গোঁসাইজী চলেগেছেন—সে কথকতা আর গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে হবে না। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে ভেবে যে ব্যবস্থা হল; আজ তাও বরখাস্ত হবে দেখছি। তবে আশ্রয়ের স্বাচ্ছন্দ্যে দুধের আয়োজন আছে।

সে গ্রামের গরুর দুধ না থাকলেও বোতলের দুধ আসছে। পুকুরের জল না থাকলেও কলের জল ঝরছে। বাগানঘেরা একতলা মেটো ঘরের বদলে দোতলা পাকা বাড়ির ছাদে টবের গাছে ফুল ফুটছে। তবু গ্রামের ঘরের মেটো সোঁদা ঘ্রাণ পেতে চাইছে স্বভাবটায়। কেমন যেন বড় আড়ষ্টভাবে থাকতে হচ্ছে এখেনে। সবই যে পোষাকী সাজে সাজানো!

—এই যে গোঁসাই দিদি, আসুন আসুন। কেমন পাঠ শোনা হল?

—আর পাঠ। কর্তার পাঠ যার শোনা নেই তার পক্ষে ভালোই কিন্তু আমার প্রাণ ভরে না, তবু চলছিল, কিন্তু...

—আবার কিন্তুর কি হল দিদি? রাখাল ঠিক মতো ছিল তো?

—সে বাছা তো ঠিক ছিল। দেখছি কলকাতার ব্যাপারই সব আলাদা। কোথা থেকে একদল ছেলে-ছোকরারা আজ এসে যা নয় তাই করে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। বাস আর যায় কোথায়। আপনাদের তো রাখাল একেবারে মাসিমাকে হাত ধরে টানতে টানতে এই বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে যেন তার শান্তি।

—তাই না-কি? তা বেশ করেছে। ছেলেটার বুদ্ধি আছে দেখছি।

—সে আর বলতে। আমায় বলে কি না রান্না ঘরে গিয়ে ফোড়ন দিন। কি জ্যাঠা ছেলে সব! ছ্যা-ছ্যা

—থাকগে দিদি, ও সব কথায় কান না দেওয়াই ভালো।

—তা যা বলেছেন। সেই ভালো। এখেনে এসে এও দেখতে হল।

—হ্যাঁ, এবার আসুন একটু দুধ খান।

—সে কি? আমি কি কচি খুকি যে ঘুরে এসেই খাবো। সন্ধে আহ্নিক করি, তবে তো···

—নিশ্চয় দিদি। সে সব হলে তবেই বলছি।

—চঞ্চল এসেছে, সে আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। আপনি সন্ধে আহ্নিক করে ফেলুন এবার।

—ও চঞ্চল এসেছে এখেনে। তা বেশ। ওর সঙ্গে তা হলে না হয় আগেই কথা বলে নিই!

—না না, তাড়ার কিছু নেই। চঞ্চলরা জলখাবার খাবে এখন, তার পর কথা হবে আপনার সঙ্গে। কাজেই আপনি আহ্নিকটা করেই নিন।

—তাই যাই তা হলে ঠাকুর ঘরে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, যান দিদি। বেশ সন্ধে নেমে আসছে।

রাখাল শাঁখ বাজিয়ে গেল। তার পর সব জায়গায় সুইজ টিপে টিপে আলো জ্বালালো আর একটা ছোট পেতলের ঘটি থেকে নিয়ে গঙ্গাজল ছেটাতে থাকলো সব ঘরের প্রবেশ পথের চৌকাঠে। ধুনোও দিয়ে গেল ঘরে ঘরে—পিতলের ছোট ধুনোচির ওপর হাতপাখা নাড়তে নাড়তে।

—আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল কদিন থেকেই।

—কি কথা গোঁসাই দিদি ?

—আমি গ্রামের ঘরে নিজেই এমনি শাঁখ বাজিয়ে সন্ধেটা তো করেছি সেই কবে থেকে। এখেনে কি সেটা করতে পারি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন পারবেন না ? যা খুশি তাই করবেন। সংকোচ কিসের বলুন তো দিদি। চঞ্চলের মা আপনি। আপনার দাবি অনেকখানি। গোঁসাই বাড়ির বৌ আমাদের বাড়ি থাকছেন একি কম সৌভাগ্য ?

—কি যে বলেন। আমারই সৌভাগ্য এমন বাড়িতে থাকার সুযোগ হওয়ায়। রাখালকে বলেই দেবেন যে কালকে থেকে এখেনে মাসিমা সন্ধে দেবে।

—রাখালকে বলার কি আছে দিদি? ও যেমন দিয়ে আসছে দিক, আপনি ঠাকুর ঘরে আহ্নিকে বসার সময় শাঁখটা বাজিয়ে সন্ধ্যেটা দেবেন। লোকজনের কোনো কাজ বন্ধ করলে আর তা পরে আরম্ভ করার দরকার হলে খুবই অসুবিধে হবে দিদি।

এ কথার পর গোঁসাই মা আর কোনো কথা যে-কোনো কারণেই হোক বলতে পারেন নি। হয় তো আড়ষ্টতা ? নয় তো এর পর বলার মতো কথা ভাবতে পারেন নি তখন। যাই হোক তিনি আহ্নিকের জন্য চলে গেলেন ঠাকুর ঘরের দিকে।

ঘরের মধ্যে বসে ছিলেন দীপককুমারের মা। বসে বসে তিনি ছেঁড়া কাপড়ের যত সব রঙবেরঙের পাড় জড়ো করে রেখেছিলেন তারই পোঁটলাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। এমন সময় চঞ্চলের মা উঠে এলেন। কথা হতে হতে রাখাল এলো, শাঁখ বাজালো এবং গঙ্গাজল ছিটিয়ে ধুনো দিয়ে গেল। দীপককুমারের মা তাঁর কাজে মন দিয়েছেন, পাড়ের সুতো খুলছেন। চটের ওপর নক্সা আসন বুনবেন।

সংকোচ একটা স্বাভাবিক ভাবেই চঞ্চলের মায়ের থাকছে। তাই খুব

তাড়াতাড়ি আহ্নিকের কাজটুকু শেষ করে নিয়ে চলে আসেন। চলে আসেন চঞ্চলের সঙ্গে দেখা করতে।

তিনি দেখলেন তখনো দীপকের মা আগের মতোই পাড়ের সুতো খুলছেন তাঁর ঘরের মেঝেতে একটা ছোটো আসনে বসে।

—আহ্নিক হয়েছে গোঁসাই দিদি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটুকু করতে আর কত সময় যাবে। গ্রামের ঘরে সবটুকু খুটিনাটি কাজ করে তারই ফাঁকে দুবেলা ঠিক আহ্নিকটুকু করতে হয়েছে—আর এখেনে এসে পর্যন্ত তো কোনো কাজই করতে হচ্ছে না। কিছু একটু করি, তাই না? এমনি ভাবে থেকে যাব আর কতদিন?

—কিছু অসুবিধে হচ্ছে না কি, গোঁসাই দিদি?

—না না, অসুবিধে কোথায়? মনটায় কেমন লাগছে এই যা।

—তা লাগুক, আমার কাছেই থাকতে হবে আমি যতদিন বাঁচবো। তার পর ছেলে আমার যা হয় করবে আমার অবর্তমানে।

—সে কি, রাম রাম। এই ভর সন্ধের বেলায় একি অলক্ষুণে চিন্তে। কে আগে যায় তার কি কোনো ঠিক আছে? আমার আর কি রইল? তিনিই চলে গেলেন আমায় রেখে?

—আমারও তো সেই অবস্থা গোঁসাই দিদি। সখ করে ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনলেন। কত আনন্দের! অথচ সেই বউয়ের মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। পাগলা গারদে গিয়ে আত্মহত্যা করলে। কি জানি কি হল সব? কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম হল আবার সেই কর্তাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মা আর ছেলে মাত্র রয়েছি দিদি, গোঁসাই দিদি নিজের মতো মনে করে থাকুন।

তখন আর চঞ্চলের মা দাঁড়িয়ে না থেকে সেইখানেই বসে গেলেন।

—সে কি গোঁসাই মা পাথরের মেঝেতে আসন না পেতেই বসলেন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।

—আর ঠাণ্ডা, আমাদের দেশগ্রামের ঘরের কথা ভাবলে, তার সঙ্গে তুলনে এখেনে তো কিছুই না।

—না না, দিদি বুঝছেন না, পাথরের মেঝে যে?

—তা হোক, কি পরিষ্কার ভুঁই, আমার কি সৌভাগ্য!

—ও কথা কেন বলছেন আবার, সৌভাগ্য আমার।

চঞ্চলের মা আর কি বলবেন ভাবছেন। এমন সময় সিঁড়িতে ওঠার শব্দ শোনা গেল।

—সৌভাগ্যের কথা কি হচ্ছে মা?

—আয় আয়, চঞ্চলকে নিয়ে এসেছিস, ভালোই হল। মায়ের কাছে ছেলেকে আনলি বাবা, বড় ভালো হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা ভালো তো হয়েছে মা, সে কি মুখের কথা, একেবারে মর্মের কথা। আপনি তো মাকে একেবারে খাসা রেখেছেন।

—দীপক শুনছিস চঞ্চলের কথা, গোঁসাই দিদিকে যে আমাদের বাড়িতে রাখতে পেরেছি এই কত!

—সে কি কথা, এতো আমার সৌভাগ্য যে চঞ্চলের মা হওয়ার জন্যে আমি এমন আশ্রয় পেয়েছি। আমার আর কি আছে, কিছুই না; আমার সব, চঞ্চলই সব।

—মা যে কি বাজে কথা বলতে পারো তাই ভাবছি। দীপকের মাই সব। তিনি যখন সেদিন শুনলেন যে, বাবার অসুখের কথা জানিয়ে চিঠি এসেছে এবং পত্রপাঠ যেতে হচ্ছে; তখনই বললেন, কিছু সংকোচ রেখো না, মা-বাবাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি চলে এসো। দীপক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। সেই আসা হল কিন্তু বাবাকে আর আনতে পারি নি, তার আগেই চলে গেলেন তিনি!

—সবই ভাগ্যের বাবা, সবই ভাগ্যের...

—আমারই কপাল মন্দ, নইলে এতদিন চঞ্চল আমাদের ছেড়ে থাকে।

—কি করবে বলুন, ওকে কলকাতায় কাজ করতে হয় যে, আর চঞ্চলের বাবা কি এখানে আসতে চাইতেন?

—তা যা বলেছ দীপক, ঠিক ঠিক। তিনি যা দেমাক নিয়ে থাকতেন। গুরুগিরিতে তেমন কিছু আয় হয় না তবু গ্রামের ঘরে গুরু গুরু হয়ে বসে থাকলেন।

—থাক গোঁসাই দিদি, থাক ও সব কথা। এখন চঞ্চলের সঙ্গে কথা বলুন, আমি একবার রান্নার কি করছে ঠাকুরটি দেখে আসি। যে দিকে দৃষ্টি না দেবো সে দিকেই একটা-না-একটা কিছু ঘটিয়ে বসাতে আমাদের রাঁধুনে ঠাকুরের সে গুণে ঘাট নেই! আপনার আর আমার রান্নাটুকু বাছবিচার মতো করছে কিনা দেখি ...

—চঞ্চল মায়ের সঙ্গে তুই কথা বল, আমিও দেখি আবার চেম্বারে বসি। যত সব আধাবিকৃত মস্তিষ্কের সঙ্গ করার কারবারি তো আমি।

—সেটা কি রে চঞ্চল?

চঞ্চলের মা প্রশ্ন করলেন দীপককুমারের দীর্ঘশ্বাস ফেলা কথায়।

—সে তুমি বুঝবে না। মানুষের মনস্তাপ থেকে অসুখ হলে তারই চিকিৎসায় থাকে তো দীপক, তাই বলছে।

—ও তাই, আমি তো···

—না না, তুমি আর জানবে কি করে?

—দেশের ঘরে থেকেছি দীপক, এখেনে কি যে আড়ষ্ট ভাবে থাকি।

—না না, আড়ষ্ট ভাবে থাকবেন কেন? নিজের মতো মন নিয়ে থাকুন। চঞ্চল মাকে একটু বল আড়ষ্ট ভাবটা কাটাতে। চঞ্চল যেমন, আপনি কিছু ভাববেন না, মায়ের সঙ্গে থাকুন মন বসিয়ে।

—সেতো রয়েই গিয়েছি একমাসের কাছাকাছি হবে না কি, চঞ্চল···

—তা তো হবেই মা।

এমন সময় ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রাখাল এসে বললে—মাসিমা, একটু দুধ আর মিষ্টি পাঠালেন মা; খেয়ে নিন।

—সেকি বাছা? দেখো দীপক, দেখ চঞ্চল? আমি কি কচিখুকি যে দুধ মিঠি খেয়ে এখেনে সন্ধে কাটাবো। এ রাখাল বাছারো কাজ বেড়েছে আমার জন্তে। দীপক বাবা তোমার মা যে আমায় কত আদরে রাখছেন কি ভাবে কিতগ্‌তা জানাবো তাই ভাবছি। সব তিনি দেখছেন। তোমাদের মঙ্গল করুন, আরো বড়ো হবে।

—এ সব কেন ভাবছেন! রাখাল এনেছে সামান্তই একটু, এখানে সবাই বিকেলের পর কিছু না কিছু খেয়ে থাকি আমরা, আপনি নিন, খেয়ে নিন। দে রাখাল তোর মাসিমাকে।

—দীপকের মায়ের আদর এখন দেখছি শুধু আমাদের ওপরই নয়, তোমাকে পেয়েও তিনি পুরোদমে নিজের মনে আপ্যায়ন করাচ্ছেন। মাকে নিয়ে আমাদের তো তিনি···

চঞ্চলের কথার মালা আর বাড়তে না দিয়ে দীপককুমার তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ঠিক আছে, আসি। তোরা কথা বল চঞ্চল।

দীপককুমার সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নিচের ঘরের দিকে এগিয়ে চলে।

পুরোনো দিনের বাড়ির কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামলে ভালো ভাষায় বললে বলা চলে যে পদধ্বনি শোনা যায়। ধপ্‌, ধুপ্‌, ধপ্‌...

সেদিন দীপককুমার তার ঘরে এসে দেখলে, শর্মিলা একদৃষ্টিতে চেয়ে পুরবীর ছবিটা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর মাঝে মাঝে পাশের দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজের মুখ দেখছে। দীপককুমার যে এ ঘরে ঢুকে এসেছে সে খেয়ালই এতক্ষণ শর্মিলার হয় নি।

লক্ষ করছে দীপককুমার এখন শর্মিলার নতুন ভাবান্তর কিছু হচ্ছে কিনা এবং একবার ভাবলে ঘরের বাইরে থেকে পর্দার আড়ালে গিয়ে দেখে যে শর্মিলা কি করতে থাকে। কারণ এতক্ষণ সে এসেছে ঘরে অথচ শর্মিলার কোনো খেয়ালই নেই, সে একবার পুরবীর ছবির দিকে তাকিয়ে দেখছে আবার আয়নায় নিজের চেহারা দেখছে।

আজ যেন দীপককুমারের মনে হল শর্মিলা বেশ জমকালো কাজের বাটিকের ব্লাউজ আর বাটিকের শাড়ি পরিপাটি করে পরিধানে নিয়ে এসেছে পিঠের লাল আর হলুদের বড় কল্‌কার কাজটা দীপককুমার প্রত্যক্ষ করলে। নিখুঁত ভাবে বাটিকের করা বর্ণাঢ্য নক্সি কাজ।

আঁচলটা সুন্দর ভাবে গোছানো পিঠের ওপর দিয়ে নিটোল নিতম্বে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে পাখার হাওয়ায়। সরু কোমড়ের ওপর ব্লাউজটা চেপে বসেছে। শাড়িটার বাটিক রেখার সাঁপখেলানো হলুদী ভাবটা ঝল্‌মল করছে দীপককুমারের চোখের ওপরই।

হঠাৎ পাশের দিকে ছোট টিপয়ের সঙ্গে দীপককুমারের পা লেগে একটা ঠকাস-করে আওয়াজ হল। দীপককুমার নীরবে পর্দার আড়াল থেকে শর্মিলার ভাব গতিক দেখতে যাবে ভেবে ঘর থেকে বাইরে যেতে গিয়ে টিপয়ে পা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে শর্মিলা চম্‌কে ওঠে।

—এই যে আপনি এসেছেন।

বলতে হয় দীপককুমারকেই কারণ শর্মিলা আওয়াজ পেয়ে তার দিকেই মুখ ঘুরিয়েছে, সামনা-সামনি দুজনার চোখ।

দীপককুমার ভাবছে আজকের শর্মিলার মুখ ঘোরানোটা যে কেমন কেমন মনে হচ্ছে। বারবার পুরবীর ছবি দেখছে আর শর্মিলা নিজের চেহারা দেখেছে আয়নায়।

শর্মিলা তো আজ যেন বিশেষভাবে সেজেছে। বেশ ভালোই দেখতে লাগছে। চোখের পাতায় সরু সুর্মার টান, কপালে লাল টিপ, ঠোঁটে হাল্কা রঙের প্রলেপ, ঘাড়ের ওপর দুলছে খোঁপা। কানে কিছু নেই, হাতে শুধু সোনার ব্যান্ডেল ঘড়ি। গলায় সরু সোনার হার, তাতে ছোট লকেট ঝুলছে। বুক ঢাকা এক ফালি আঁচলের ফাঁকে উঁকি দেয় স্থির যৌবনের তির্যক উচ্ছ্বাস।

দীপককুমার চোখ তুলে চেয়ে নিলে পূরবীর ছবির দেওয়ালে। যেন মনে হল সে হাসছে ঠোঁট টিপে। হাসছে দেখে দীপককুমারের চোখের তারায় নতুন যৌবনের দূত নতুন ঋতুর হাওয়া বইয়েছে বুঝি। জীবনটা তবে কি পাল তোলা নৌকো, হাওয়ায় ফুলে উঠছে গতির ছন্দে?

ঢেউ উঠছে শর্মিলার বুকের সাগরেও।

—আচ্ছা বলতে পারেন, সত্যি কিছু মনে করবেন না কিন্তু, আজ খোলাখুলিভাবেই জিজ্ঞেসা করছি, পূরবীদির ছবির দিকে অমন করে সুবর্ণবাবু চেয়ে চেয়ে দেখে চলে যান কেন অধিকাংশ দিনই?

দীপককুমার বেশ চমকে ওঠে কথাটা শুনে।

—হ্যাঁ, সেটা কি রকম ব্যাপার?

—এই তো কদিনই দেখেছি।

—তাঁকেই সেটা তা হলে জিজ্ঞেসা করলেন না কেন?

—কি রকম সংকোচ হয়।

—এখনো সংকোচ আছে তা হলে?

—অর্থাৎ, কি বলতে চাইছেন বলুন তো?

—খুবই স্বাভাবিক কথা। আপনি এ কথাটুকু সুবর্ণবাবুকে জিজ্ঞেসা করতে এখনো সংকোচ বোধ করছেন—এইটুকু তো কথা।

—কথা এইটুকু কিন্তু ভীষণ কথা। আপনি যা ভাবছেন তা মোটেই কিছু নয়। আমার দীপ্তেন্দু, হ্যাঁ আমারই দীপ্তেন্দু সে এলো না বা আসা তার হলো না; তাই সুবর্ণবাবু ঘটনাচক্রে আমাদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমাকে সুচিকিৎসায় রেখেছেন। দেখুন তার ফলে আমি বেশ ভালো হয়ে উঠেছি। এখন তো আর মাথাটায় তেমন যন্ত্রণার ভাব নেই। আমি বেশ খোলা হাওয়ায় মনটাকে আর শরীরটাকে নিয়ে ফিরছি। তবে কেবল কেমন যেন মনে হচ্ছে সুবর্ণবাবুর এই ভাবে পূরবীদির ছবিটাকে গভীর মনে অনুক্ষণ দেখতে থাকাকে। কি জানি তাঁর মনটার কি ভাব?

---কিছুই না তেমন, ভালো লেগেছে তাই দেখেছেন।

--অতো সহজ ভাবছেন কেন। ভালো লাগার মতো তো তাঁর অনেক কিছুই চোখের সামনে থাকে কিন্তু সেদিকে তো দৃষ্টি দিতে দেখি না।

—সে কি? এযে দারুণ অভিযোগ?

—অভিযোগ?

—না না, ভুল হয়েছে বলি অভিমান!

—কার সঙ্গে অভিমান? সে শুধু দীপ্তেন্দুর ওপর···

দীপককুমার বিচলিত হয়েছে এবার বেশ। কারণ শর্মিলা তার সামনের চেয়ারটায় বসে টেবিলে মাথা রেখে বসে থাকলো। এবং একটুক্ষণ এইভাবে থাকার পরই দীপককুমার লক্ষ করলে যে শর্মিলার পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। বাটিকের ব্লাউজটার কল্‌কাটা ফেনিল সমুদ্রের ঢেউ যেন। শর্মিলা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তখন, কেবল কাঁদছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে দীপককুমার বসে থাকলো। শর্মিলা এর আগেও অনেকবার কান্নাকাটি করেছে কিন্তু এমনভাবে ভেঙে পড়তে আর কখনো দীপক দেখে নি। আজ বেশ বিচলিত হয়েছে দীপককুমার। এবং বেশ বিব্রতও হয় তো বোধ করছে সে। কারণ সে যুবক মনোবিজ্ঞানী এবং তার মনে হচ্ছে সে বিপত্নীক।

তবু মনকে শক্ত করে রোগিণীর পরিচর্যায় মন দিতে হয় দীপককুমারকে। প্রথমে বলতে থাকে—খুবই মনে কষ্ট হয় যখন কিছু পাবার সময় হয়ে এসেও তা হাত ছাড়া হয়ে যায়। পেতে চলেছি অথচ শেষপর্যন্ত তা আর পাওয়া হল না। সব ঠিক অথচ কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেল। রোদ ঝল্‌মল্‌ করছে হঠাৎ কোথা থেকে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসে ঝম্‌ঝমাঝম্‌ বৃষ্টির বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া যেন। অদৃশ্য হাতের লীলা।

এত কথাতেও কিন্তু শর্মিলার মুখ টেবিলের থেকে উঠলো না। তখনো পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দীপককুমার কি করবে ভাবছে। ভাবছে পূরবীর ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে। কেন এমন লাগছে আজ পূরবীর হাসিটা দীপককুমার বুঝতে পারছে না আর। সামনে টেবিলে মুখ গুঁজে কাঁদছে শর্মিলা।

—দুঃখটা স্বাভাবিক তবে নিয়তি তো আছেই। কার যে কখন কি ভাবে

নিয়তির শাসন কার্যকরী হয় কে বলতে পারে। আমাদের সবটুকুই মেনে নিয়ে তারই মধ্যে সুখের সন্ধান করতে হবে।

দীপককুমারের এই কথায় যেন আরো কান্নার আওয়াজ জোর হল। নীরব থেকে হঠাৎ মৃদু সরবে। তখন দীপককুমার নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বাটিকের কল্কা ভরানো ব্লাউজের পিঠে হাত রাখলো।

এদিকে চঞ্চল এই সময় তার মায়ের সঙ্গে কথা শেষ করে নেমে এসেছিল দীপককুমারকে কয়েকটা কথা বলে যেতে। পর্দার ফাঁক থেকে সে দেখলে শর্মিলার পিঠের ওপর হাত রেখে দীপককুমার দাঁড়িয়ে রয়েছে। চঞ্চল তখন আর কিছু না বলে সোজা যেমন এসেছিল তেমনি নীরবেই এবং নিঃশব্দেই চলে গেল।

দীপককুমার তা বুঝতেই পারলো না। চঞ্চল এলো এবং গেলো।

শর্মিলা এবার ধীরে ধীরে তার মাথাটা তুললে। দীপককুমারের মুখের দিকে যখন সে চাইলে তখন তার দুচোখে জল ভরা যেন বৃষ্টি ছাটে ভেজা সার্সি থেকে দেখছে। একটু ঝাপ্‌সা।

হ্যাঁ, এখনো ঝাপ্‌সা শর্মিলা। ঠিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে না সুবর্ণ ও শর্মিলার মন। কোথায় যেন অদৃশ্য হাতের খেলায় ঠিক সব বেঠিক হয়ে যাচ্ছে। রঙ ফুটছে কিন্তু মনে ধরছে কি?

—যে গেছে সে গেছে। মন শক্ত করে এবার নতুন করে জীবনটাকে বাঁধবার চেষ্টা চালাতে হবে যে? এবং তা হবেই।

দীপককুমার বেশ জোর দিয়ে কথাটা শেষ করলেন শর্মিলার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতেই।

—কেমন করে হবে? হবে না, কখনোই আর হবে না। আপনি কিছুই বোঝেন না। সবাই অন্যদিকে এখন চোখ দিচ্ছে।

—সে কি?

—একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছেন যে? সবাই সমান, আমি চলি···

—না না, একটু বসে গেলে ভালো হত। এমন মন নিয়ে কি রাস্তায় পা বাড়াতে আছে। বসে সব কথা হোক তবে তো।

—আর কিছু কথায় কাজ নেই। আমি চলি···

শর্মিলা চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠছিল। দীপককুমার কাঁধে হাত দুটো দিয়ে বসিয়ে দিলে। শর্মিলা আবার চেয়ারে বসলে।

—কেন এত অশান্ত হয়ে ওঠা হচ্ছে ? একি ? এতো ঠিক নয়।

—মাথাটা কেমন কেমন করছে।

দীপককুমার একটা বড়ি-ওষুধের রাস্তা থেকে বড়ি একটা আর এক গেলাস জল খেতে দিলে তখন শর্মিলাকে।

—এটাতে একটু আরাম বোধ হবে।

—আর আমার আরাম ?

—একটু ধৈর্য ধরতে হবে যে—সময় আসছে, সময়ের জন্তে তো সমানে সামনে চেয়ে এগিয়ে চলতে হয়। মুছড়ে পড়লে চলবে কেন ?

—থামান আপনার উপদেশের কথা। আর সহ্য হয় না। বাড়িতে মা বলছেন তার সঙ্গে ছোট ভাইটা সুযোগ পেলেই সহানুভূতি দেখায়। আবার আপনি, না আর ভালো লাগে না।

—আচ্ছা আচ্ছা, এই আমি উপদেশ থামাচ্ছি, কেমন তো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে কথা বলি আপনার সঙ্গে।

—তা কথা হবে। তবে আজ আর বেশি কথা নয়। এখন বাড়িতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে বসে রাত্রির খাওয়া দাওয়া একটু করেই ঘুমিয়ে নিতে হবে।

—বেশ তাই হবে। তা হলে আজ আসি।

—হ্যাঁ, কিন্তু স্বর্ণবাবু াসবেন না।

—না, আর তাঁকে আসতে হবে না। আমিই চলে যাচ্ছি।

—কখন আসবার কথা ছিল ?

—কথা আবার কি থাকবে ? তিনি তো জানেন যে সোমবার সন্ধের সময় আমার আপনার চেম্বারে আসার কথা। গত কদ্দিন হয়ে গেল তো বাড়িতেও আসেন নি। আর আজও না।

—কবে দেখা হয়েছে ?

—গত সোমবার এখান থেকে ফেরার সময়।

—কি কথা হয়।

—কিছুই না।

—কিছুই না মানে কি ? দুজনে কি মুখ বন্ধ করে পথ হাঁটা হচ্ছিল ?

দীপককুমারের এই কথায় শর্মিলার ঠোঁটে হাসি ফোটে। সে বলে উঠলো শুধু—কিন্তু সে তেমন একটা কিছু নয়।

কিছু—তেমন নয়টাই-বা কি, শুনি ?

—আমি তাঁকে উষাদেবীর বাড়িতে যাওয়ার বিষয় নিয়ে একটু বিদ্রুপ করি এই যা। আর তো কিছু বলি নি।

—শুধু ওইটুকুই ?

—না ঠিক তা নয়। আরো বলি যে পূরবীদির ছবিটার দিকে চোখ গেলে যে আর চোখ অন্যদিকে ফেরে না।

—হ্যাঁ, সে কি ? এমন কথা, ইস্। না না, এত্তোটা বলা ঠিক হয় নি।

—যাই হোক আমি আসছি। আপনি আবার ভুল বুঝলেন না তো আমায়। আজ চলি ··

শর্মিলা শেষ কথাটা বলেও যেন অপেক্ষা করছিল বাইরে আসার দরজার কাছ পর্যন্ত এসে। দীপককুমার যদি কিছু বলে। নাঃ, সে পাত্র দীপককুমার নয়। শর্মিলা চলে যায় ঘরের বাইরে। পূরবীর ছবির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দীপককুমার এগিয়ে যান শর্মিলার পিছন পিছন সদর দরজা পর্যন্ত সৌজন্যমূলক তার স্বভাব সুন্দর ভঙ্গিমায়।

বাইরের দরজায় অপেক্ষা করছিল একটা টুলে বসে রাখাল। সে বললে—দাদাবাবু, আপনাকে মা একবার বাড়ির ভেতরে ডেকেছেন।

—আচ্ছা যাইরে। অন্য কেউ এলে বাইরের বসার ঘরে বসাবি, কি রে বুঝলি ?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, তাই হবে।

—যদি কেউ শর্মিলা দেবীকে খুঁজতে আসেন, বলবি যে তিনি নিজেই চলে গেছেন।

দীপককুমার কথাটা বলে ফেলেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পথের দিকে তাকিয়ে। যে পথ দিয়ে চলে গেল এই মাত্র শর্মিলা।

ভাবতে ভাবতে একটু সময় কাটে দীপককুমারের।

সময় কাটছে কিন্তু মনের আকাশ ফর্সা হচ্ছে না। মেঘ তো কাটছে না। এই শ্রাবণ আকাশ ঘন মেঘের ঘনঘটায় ভরা।

বিদ্যুৎ খেলবে—আলোর ঝিলিক দেওয়া তড়িৎরেখার।

রাখাল টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে তার দাদাবাবুর স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে।

দীপককুমার বাহ্যজ্ঞান হারায় না সহজে তবু আজ ক্ষণিকের জন্যে যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। বলে উঠলো—কেউ এলে বাইরের বসার ঘরে বসাবি।

মনের মধ্যে কেমন যেন কুটাই ধরে বসে। শর্মিলা বললে যে, স্বর্ণবাবুর চোখ আর ফিরতে চায় না পুরবীর ছবির দিক থেকে। মরুকগে সে কথা, যত সব বাজে ভাবনা শর্মিলার। দীপককুমার মায়ের কাছে চলে যায় বাড়ির ভেতর দিকে দোতলায়।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে আওয়াজ হয়— ধপ্ ধুপ ধপ্…

ইন্দু ধূপ কাঠিটি জ্বালিয়ে নিয়ে সন্ধের মুখে মনীষের বসার ঘরে আসছে। মনীষকে দেখে বললে—সে কি এখনো সেই ভাবে বসে আছো, কখন এসেছ। আশ্চর্য ?

—ঠিক তো, কি আশ্চর্য ব্যাপার ?

মনীষ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে বসলো।

চমকে গিয়ে ইন্দু প্রশ্ন করে উঠেছে—আশ্চর্য কিসের ?

ইন্দুর প্রশ্নের মুখেই পাল্টা প্রশ্ন করে উঠছে মনীষ তখনই—আশ্চর্যের নয় তো কি ?

ইন্দু বেশ রঙ্গরসিকতার ঢঙে দুটো হাত নেড়ে বলে দিলে—সবেতেই অমনি আশ্চর্য হবার কি আছে, তাতো বুঝি না বাবা ?

শান্তভাবে মনীষ বললে তখন ইন্দুকে—আর তোমার বুঝেও কাজ নেই।

একটু অভিমান ক্ষুণ্ণ স্বরে ইন্দু বলে—তা আর বলবে না তুমি।

—সব দেখে শুনে চুপ করে আর থাকতে পারছি কই ?

ইন্দু খুব বিজ্ঞের মতো জবাব দেয়—একটু চেষ্টা করলেই পারবে।

—আর কি রকম করে চেষ্টা করতে হবে বল ? তোমার মহাননদিনী তো মেয়ের বিয়ের সন্ধান করে দিতে ডাকলেন শেষে মেয়েই চম্পট দিলে নিজে নিজে বিয়ে করে।

—হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি ? যাঁদের পছন্দ হয়েছে সে বিয়ে করেছে।

—কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই তো শেষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আরো একধাপ ওপরেও যে।

ইন্দু সবেতেই যেমন আগ্রহ দেখায় তেমনি ভাবে বললে—কি রকম ? তার মানে ?

মনীষ একটু কপট তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলে—তবে আর তুমি কি বুঝলে ?

—তোমাদের হেঁয়ালি সব সময় বোঝা যায় না।

—কি করে আর বোঝাই।

—আমার কাছে তবে এবার বোঝো।

মনীষ বেশ হেসে হেসেই বললে—হাড়ে হাড়ে বুঝছি, আরো ?…

—এখনি এই কথা, এই তো সবে কলির শুরু…

—কলির শুরুই হোক আর যাই হোক, উষাদির কিছু ব্যাপার বলছো কি ?

—তা আর নয়! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না বলতে তো আমার ক্ষেত্রে আর এখন নিজে ন্যাকা সাজছো।

মনীষ কিছু না বোঝার সুরে প্রশ্ন করে—কেন ?

—আমরা যখন উষাদেবীর বাড়িতে গিয়েছি তখন তো বাইরের ঘর থেকেই চলে এসেছি। আজ আমরা কি দেখলুম।

—কি আর ? তিনি আর ঐ যে ভদ্রলোক, কি নাম যেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বর্ণবাবু পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে বসলেন।

একটু বিরক্তিভাবে মনীষ বললে—হ্যাঁ, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল শুনি।

ইন্দু স্বামীর সঙ্গে রসিকতার ছলে বলে—অন্দর মহলের মানুষ হয়েছেন এখন স্বর্ণবাবু তাই বলছি, আর কিছু বলছি না।

—তা যদি হতে পেরে থাকেন তিনি হন-না, তোমার তাতে কি ?

—আমার আর কি ?

ইন্দু খুব মজার মেজাজ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে তখনই—তোমার আর কি ? তোমারই অন্দর মহলের মানুষ হওয়া হল না বলে আফ্‌সোস হচ্ছে, তাই বল না বাবা খুলে। একটু ঝেড়ে কাশো।

মনীষ বেশ রাগত ভাবে বলে—দেখো বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে এ ব্যাপারে। আর নয়, থাক ও প্রসঙ্গ।

—সেই ভালো। বীথির সন্ধান এনে দিয়েছেন স্বর্ণ বাবু এবং মহাননদিনীকে দেখাশোনা করছেন। তাতে উভয়ের মন জানাজানি যদি হয়ে থাকে তাতে তো আমাদের বলার কিছু নেই।

—না তা অবশ্য নেই। তবে…

—আবার তবে কেন ? থাক না।

সেই ভালো থাক। কেবল তুমি আশ্চর্য ব্যাপার বললে কি না আমাদের

চলে আসার পরই স্বর্ণ বাবুর ওখানে থাকার কথায় তাই এত কথা বলেছি, না হলে আর আমার এত কথা বলার কি আছে বল।

—তা তো বটেই। এমনি এমনি পুরুষমানুষ এত কথা বলে না মশাই প্রাণের কোণে বেশ ছোঁয়াচ লেগেছে বলেই এত মুখখোলা হয়েছে। শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকে লাভ নেই। এখন মনটাকে ঠাণ্ডা করো বেহাত যখন হয়েই গেছে তখন আর আফসোস না করাই ভালো।

মনীষ বেশ একটু বিরক্তি ভাব দেখিয়েই বলে—বড় বাজে কথা বলো দেখছি তুমি।

—হ্যাঁ, এখন তো আমার কথা বাজেই লাগবে।

—থাক, খুব হয়েছে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই।

—কথায় কথা বাড়ে সেটা তো জানোই।

—তা জানি বলে কি মুখবুজে থাকবো।

—আজ্ঞে না, চোখ বুজে থাকো।

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে মনীষ যেন মনের মতো কথা শুনেছে তাই বলে—তা যা বলেছো।

—ইন্দুর বেশ গর্বের ভাব নিয়ে প্রশ্ন হয়—তা হলে কথাটা মানলে বল?

—না মেনে আর উপায় কি?

—এখনো দেখছি মনের ক্ষোভ রয়েছে?

—ক্ষোভ! ক্ষোভ কিসের?

—তা নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করো কেন? উত্তর পাবে গো, ঠিকই এর উত্তর পাবে!

মনীষীমোহন মৈত্র বেশ বিরক্ত ভাবে স্ত্রীকে বলে ওঠেন—আর ভালো লাগছে না তোমার কচলানো। খালি কথার কচকচি!

—সে তো জানি মশাই, সে তো জানি। মন যে উড়ু উড়ু…

—বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। রুচিতে বাধা উচিত এরকম একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে।

মনীষের কথায় কিছু মাত্র রাগ না করেই ইন্দু বললে—তা তো বলবেই মশাই। স্ত্রীলোকের আলোচনা করলেই যত দোষ। আর জানি পুরুষদের বেলায় সাতখুন মাপ!

—রাখো তোমার মহিলাসমিতির ভাষণ।

পুরুষচক্রের আসন যে গো আমরাই।

—তা তো সবাই জানে, নতুন কি ?

—নতুন পুরোনোর কথা নয় গো মশাই। শেষ পর্যন্ত মহিলা সমিতির কাছেই আশ্রয় নিতে হয়, তাই বলছি। সুবর্ণবাবুকেও হল।

কথাটা শুনে মনীষ আর কোনো কথা বলতে পারলে না। শুধু কানে তার বাজতে লাগলো শেষ কথাটা—সুবর্ণবাবুকেও হল।

কথাটায় কেমন যেন অন্য সুর ধ্বনিত হল মনীষের মনে। যে সুর মনীষকে যেন প্রশ্ন প্রবল করে তুললে—তাই তো সুবর্ণবাবুর মতো পরহিতব্রতী মানুষকেও কি উষা দেবী প্রলুব্ধ করলেন।

নিজের মনে চিন্তা করেও চম্‌কে ওঠে কিম্বা আশ্চর্যই হয়।

তবু দুজনের মনের কোণে এটাই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে বীথি নতুন বিবাহিত জীবনের স্বাদ পেয়েছে কিন্তু উষাদেবী অতবড় বাড়িতে একক জীবনের হাহাকার নিয়ে রয়েছেন। নতুন হাওয়ার স্পর্শ যেন অবশ্যম্ভাবি।

মনীষ আর ভাবনা না করে বা ভাবনা ঢেকে রেখে বলে উঠলো—না, ওসব চিন্তা থাক, রাত্রির খাবারটার ব্যবস্থা করো তো গিন্নী এবার। বড় বেশি পরচর্চা হয়ে যাচ্ছে। এতে সময় নষ্ট হয় তা ছাড়া আর কোনো কিছু নয়।

—হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। তাই করি। এখুনি হয়ে যাবে। খানিকটা কাজ দুপুরে এগিয়ে রেখেছি—একটু গরম করেই পাতে দেবো আর কি।

—তাই দাও।

কথাটা বলেই মনীষ চুপ করে বসে থাকলো। সামনে ওপাশের দেওয়ালে টাঙানো মহামনীষী অনেকের ছবি। একটা ধূপ কাটি দিয়ে তখনো লিক্‌লিকে ধুঁয়োর শিষ হেলেদুলে ওপরে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। চন্দনের গন্ধে ঘরটা ভরভর করছে। মনীষের বেশ লাগছে সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চেয়ারে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে।

—বাবা খাবে চলো মা ডাকছে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই মনীষের। ছেলের ডাকে হুঁশ হল। অবশ্য বেহুঁশ হয়ে মনীষ ছিল না। কারণ ইন্দুর সঙ্গে এমন একটা সরস প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়ে গিয়েছে যার শেষ পরিণতি কি পর্যন্ত হতে পারে তা ভেবে নিতে তার মন ব্যস্ত হয়ে না উঠে পারে নি। সে তো ভেবেই নিয়ে

ছিল বেশ অনেকখানি। বিশেষ করে এবার সুবর্ণবাবুর কথায় এমন একটা উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ ছিল যাকে কোনো মতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। দারুণ দারুণ কথা বলছিলেন সুবর্ণবাবু।—মনীষ ভাবছে। নিশ্চয় ঊষা দেবীর সাহচর্যের মধ্যে দিয়েই বোধ হয় সুবর্ণের কথার ফুলঝুরি ফুটছিল। তার কথায় যেন রঙ্ ধরেছিল, যেন রূপের লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ছিল।

সত্যি সুবর্ণের কথা সুন্দর, সুবর্ণের স্বভাব সুন্দর।

শর্মিলা ভাবছে।

ভাবছে, কারণ মা যে এই ভাবনাটা কদিন থেকেই তার মাথায় ভালো করে গেঁথে দিতে চাইছেন। তিনি সুবর্ণকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না শর্মিলার জন্তে।

শর্মিলা মায়ের এমন একটা আধুনিক মর্জি দেখে অবাক হয়ে নিজেরই মনকে মেলে ধরে ভাবতে বসছে। ভাবতে বসছে নিজের মনের গতিপ্রকৃতিকে, নিজের চেতনার চৈতন্ত লোককে। যেখানে দীপ্তেন্দু, তার স্বপ্নের স্বামী পুরুষ দীপ্তেন্দু রয়েছে, রয়েছে অশরীরী! কিন্তু শরীরী। হ্যাঁ, দেহে মনে, তার হৃদস্পন্দনে, তার স্পর্শে আঘ্রাণে, তার নিবিড় বাহু বন্ধনে সে কই? না না, কেউ নেই, একেবারে ফাঁকা! ভাবতে আর ভালো লাগে না ফাঁকা থাকা! কিন্তু দীপ্তেন্দু কি আসবে না? ভাবছে শর্মিলা তা হলে কি ট্রেনের গুণ্ডাদলের হাতেই দীপ্তেন্দুর শেষ? তাদের শেষ করতে গিয়ে নিজেই নিঃশেষ!

প্রতীক্ষা। দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার শেষ সংবাদ দীপ্তেন্দুর দাণ্ডাধারী হয়ে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য যারা তাদের হাতেই দাণ্ডার আঘাতে নিহত হওয়া। উঃ কি ভীষণ খবরটা যে এলো সে দিন, এখনো শর্মিলার মনে করলে গাটা ছম্‌ছম করে ওঠে। কি দরকার ছিল ছিনতাই দলকে শায়েস্তা করতে যাওয়ার? একা কি সমাজের সব দুষ্ট ক্ষত সারাতে পারা যায়, না কেউ সারাতে পেরেছে! আশ্চর্য দীপ্তেন্দুর আদর্শবাদী মন! আশ্চর্য তার মানসিকতা! কত যাত্রীই তো ট্রেনের কামরায় ছিল কেউ তো এগোয় নি, তা নাই এগোলো বীরপুরুষ দীপ্তেন্দু এগিয়ে গেল। ঝাপিয়ে পড়লো এক সন্ন্যাসীর হাতের লাঠি নিজের হাতে নিয়ে। অবাক কাণ্ড, ভাবতে গেলেই মনটা কেমন কেমন করে ওঠে, আর যেন কিছু ভালো লাগে না। শর্মিলা শুয়ে পড়লো দুপুরের খাঁ খাঁ করা রোদ্দুরের জানলা দিয়ে শরতের আকাশ দেখতে দেখতে।

শরতের নীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মতো হাল্কা মেঘ ভেসে চলেছে। শর্মিলার মনও কি এমনি করে ভেসে বেড়াতে পারে না?

স্বর্ণ রায় সহজ ভাবেই আলাপ করেছে। শর্মিলার মনের গভীর বেদনার কথা শুনে পর্যন্ত সহানুভূতিতে নিজেকে সহযোগী করেছে, শর্মিলার সংসারের একজনই হয়ে সত্যি। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা ফাঁক থেকেছে, একটা তফাৎ তফাৎ ভাব থেকেই গিয়েছে স্বর্ণ রায়ের মধ্যে শর্মিলার দিক থেকে। শর্মিলার এ কথা ভাবতে কিছুমাত্র সংকোচ হচ্ছে না। কারণ সে বোধ কেবল তাঁরই হয়েছে, যা তারই হাওয়াটাই সম্ভব আর কারো নয়। মায়ের মন দিয়ে মা ভেবেছেন। তিনি তো ঠিকই দরদী পুরুষ পেয়েছেন স্বর্ণকে। সংসারের সব বিষয়ে দরদ দিয়ে দেখা। আর শুধু দরদী কেন? সুবিবেচক এবং সুপুরুষ, প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিভাদীপ্তও।

শর্মিলা বেশ মনে করতে পারছে দীপ্তেন্দুকে। কত কাছে কাছে ছিল সে। কত ঘনিষ্ঠভাবে। একেবারে যেন নিজস্ব করে তার পাওয়াই হয়েগিয়েছিল দীপ্তেন্দুকে। আর শর্মিলা ভাববে নাই-বা কেন সেই যে দুর্গাপুজোর সময় ভিড়ের মধ্যে গা ছোঁয়াছুঁয়ি করে ঘুরে ঘুরে কত ঠাকুর দেখা, কতরকম রসিকতা করে আইসক্রিম খাওয়া, ফুঁচকাই খাওয়া। কোনো সংকোচ ছিল না দীপ্তেন্দুর। কত কাছে টেনে নিয়ে আদরে আদরে সময় বইয়ে দেওয়া হয়েছে দুপুরের পর দুপুর। ইশ, কি কাণ্ডটাই না হয়ে যেতো, মা যদি ঘুম থেকে তখনই উঠে আসতেন? বেজায় দামাল মন ছিল তখন দীপ্তেন্দুর। শুধু তার কেন? হয় তো শর্মিলা ভাবছে তারও। তা না হলে দীপ্তেন্দুর সঙ্গে একাই চলে যায় যুবতী মেয়ে দীঘার সমুদ্র সৈকতে, মা বা সুশোভন ঘরের মধ্যে ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউ গুনে ফিরে এলো সে এবং শর্মিলা। শর্মিলার সাহস আছে কিন্তু হ্যংলামো নেই, একটা আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে। সে শিক্ষয়িত্রীর আদর্শ নিয়েছে। সে তাই জীবনে প্রেমকে বড় করে দেখেও কিন্তু রতিবিলাসী হয়ে ওঠে নি। একনিষ্ঠ প্রেম নিয়ে জীবনযাত্রাকে গতিময় করতে চেয়েছে, স্থিতিশীলতা চায় নি। মন ভেঙেছে কিন্তু চলমান জীবন-ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে।

স্বর্ণ রায়কে আন্তরিকতা সম্পন্ন দেখে তারও ভালো লাগলো। ভারী ভালো লাগলো—শর্মিলা অসংকোচে সে কথা এখন ভাবছে। কারণ দীপ্তেন্দু আর নেই, সে আর এলো না। বিধির বিধান কে খণ্ডাবে? পুনর্মিলন আর

হলো না। বৈতরণী পারে তার তরী পৌঁছিয়েছে। তীর ছেড়ে এখন হয়তো অনেক দূরে, অনেক দূরে ছুটে চলেছে—তার মনে কি শর্মিলার কথা উদয় হবে? না, সাগর পারের পরীদের কথা—কে জানে? শর্মিলা এ চিন্তায় মন নিমগ্ন রাখতে চায় না তবু বারবার এমনি ভাবনা মনের মধ্যে আসে। মনকে তখন বেজায় উতলা করে। মাথাটা কেমন কেমন করে তখন, কিছু আর ভালো লাগে না। শুয়ে থাকে একাকী দুপুরের অলস বিছানায়।

কত দিন দীপককুমার মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গিয়েছে শর্মিলাকে স্বর্ণ রায়। শর্মিলা কত কাছে কাছে হেঁটেছে, ভিড়ের ট্রামে-বাসে বা ট্যাক্সিতেও তো কতদিন গিয়েছে। কি সংযমী, সুভদ্র পুরুষ সে—এ কথা শর্মিলার বেশ মনে হয়েছে। বাইরের লোকের চোখে এটাতেই কত কিছু ভাবা হয় তো হয়ে যায় বা তাদের সম্বন্ধে ভাবাও হয়ে গিয়েছে। শর্মিলা ভাবছে মা এমনি কিছু আন্দাজ করেই বলছেন হয় তো—আর দেরি করবি কেন শর্মিলা ভেবে দেখ। স্বর্ণ রায় সুন্দর পুরুষ, তোর উপযুক্ত এবং তুইওতো তার উপযুক্তা।

মার কথাটা খুব সোজাসুজি শর্মিলার মনে এসেছে। বা বুকের মধ্যে বিঁধে গিয়ে সেই কাল সন্ধে থেকে এই আজ দুপুর পর্যন্ত ছটফটিয়ে তুলছে। যন্ত্রণা কি? না, একে ঠিক যন্ত্রণা বলা চলবে না। এ যেন প্রাণের মন্ত্রণা দিয়েছেন মা। সেই জন্তেই অনর্গল সেই মন্ত্র জপ করছে শর্মিলা।

অবশ্য গুরুর দেওয়া মন্ত্রের মন্ত্রণা নয় যে নির্বিচারে গ্রহণীয়, বিচারের জন্তে ধরানো মায়ের মন্ত্রণা। মা ভেবে দেখতে বলেছেন। মেয়ে বড় হয়েছে তার ওপর নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে—কাজেই মেয়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছেই বড় কথা।

প্রথম দিকে শর্মিলা তো স্বর্ণ রায়কে পেয়ে ভেবেছিল অথৈ জলে ডুবতে ডুবতে আশ্রয় পেলো। বেশ সহজভাবে সরল মনেই চলাফেরা করছিল। স্বর্ণ রায়ও এসেছে সংসারের খোঁজ খবর নিয়েছে, যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে তখনই তার ব্যবস্থা করার চেষ্টায় থেকেছে। শর্মিলার মাথাটা কেমন যেন নিঝুম হয়ে থাকতো, কোনো কাজে তার উৎসাহ তেমন আর বোধ হত না। কথাও বিশেষ না বললেই হয় এমন একটা ভাব। তখন দীপককুমার মনোবিজ্ঞানীর কাছে শর্মিলাকে নিয়ে যাওয়া সে তো স্বর্ণ রায়েরই নিজস্ব ইচ্ছায় হয়েছে।

শর্মিলা ভাবছে কি স্নিগ্ধ আন্তরিকতা পূর্ণ সান্নিধ্য লাভ হয় দীপককুমারের

কাছে। কত ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলা চলে, কত কিই-না আবদার করা চলে সহজভাবে। ভারী মিষ্টি স্বভাব, ভারী আকর্ষণ বোধ হয় দীপককুমার নাম শুনলেই বা নাম মনে এলেই। মুখের মধ্যে কি প্রসন্নতা অথচ অন্তরে তাঁর পূরবী বিয়োগের জন্তে কান্না জমানো। না, এমন মানুষ আর হয় না।

—শর্মি, শর্মি, মা আয়, চা খাবি তো?

মায়ের গলা পেয়ে তরাক করে লাফিয়ে উঠলো বিছানা ছেড়ে শর্মিলা। উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে। বেজায় লজ্জা লজ্জা করছে শর্মিলার। হোক রবিবারের বিকেল, তবু তো চারটের মধ্যে উঠে চায়ের ব্যবস্থা তারই করা উচিত ছিল। এ কাজটুকু তো সে বাড়িতে থাকলে প্রতি ছুটির দিনই সকাল বিকেল করতে চেষ্টা করেছে। অবশ্য মা কোনো মতেই তা করতে দিতে চান না। তবু এগিয়ে যায় শর্মিলা। কিন্তু আজ? সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল ভাবনায় ভাবনায়—নিজের মনের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে একেবারে মনের অতলে প্রায় তলিয়ে গিয়েছিল শর্মিলা।

ডুব দিয়ে উঠতে গিয়ে যার মুখ ভেসে উঠছে তার দুচোখে তার কথা চেপে গিয়ে মায়ের কাছে চলে আসে শর্মিলা। বিকেলের চায়ের কাপ চোখের সামনে বাস্তব হয়ে উঠলো। বললে মাকে—বড় দেরি হয়ে গেল আসতে। দেখো দেখি ছুটির দিনেও সংসারের মধ্যে থেকে তোমার একটুও কাজে লাগতে পারি নি। ভারী খারাপ লাগছে।

—না না, শর্মি, খারাপ তোর কেন লাগবে আমারই যে লাগার কথা। আমিই তো তোর জন্তে তেমন কিছু করতে আর পারলুম কই?

—তুমি কি যে সব বাজে চিন্তা করো, থাক ও কথা। আচ্ছা সুশোভনের জন্তে পুজোর একচোট হয়েছে এবার ভাইফোঁটায় জামাটামা কি লাগবে? এবারে তো করতে দিতে হবে মা। ওকে জিজ্ঞেস করবো, দেখি কি বলে।

হ্যাঁ তা তো লাগবেই। আর তুই তো সবই করছিস ওর জন্তে।

—না, না, সে কোনো কাজের কথা নয়। তেমন কিছু হচ্ছে না একটা করার মতো করা। পড়ছে ঠিকই তবে আর একটু এবার দেখবো আমি পরীক্ষায় ফল যাতে ভালো হয় সুশোভনের।

—হ্যাঁ সে তো বলার নয়। দেখিস তো তুই সময় পেলেই।

—আরো দেখতে হবে যে মা, এখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে।

—তা বটে শর্মি, এবার একটু ভাইকে তো দেখবি ঠিকই, নিজের দিকেও

তো দেখতে হবে। আমি আর কদিন? দুহাত এক করে যেতে পারলেই যে আমার শান্তি হয় শর্মি, তুই কি তা বুঝবি না?

—কেন আবার ঐ সব কথা বলছো? কাল তো যথেষ্ট বললে। আজ আবার সেই একই কথা বলবে তো? আমি মা একটু বাইরে যাব। তুমি বিশেষ কিছু রেঁধো না। আমি এসে যা হয় করে নেবো।

—কি বলছিস?

—আজ দীপককুমার বাবুর সঙ্গে একজায়গায় নিমন্ত্রণ আছে সেখানে খাওয়া হবে, তাই বলছি। যদি খাওয়া না হয় তো এসে যা হয় একটু খাবো।

—কে দীপককুমার বাবু।

—ডাক্তার বাবু তিনি।

—ও, বুঝেছি; যার কাছে স্বুবর্ণ নিয়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁগো।

ঠাণ্ডা গলায় শুধু এইটুকু বলেই শর্মিলা চায়ের কাপটা রান্না ঘরের মেঝের রেখে উঠে যায়।

মা চেয়ে থাকেন শর্মিলার দিকে অবাক দুচোখে।

রান্নার ঘরেই বসেছিলেন। রাত্রির জন্তে রুটি কখানা ভাবছেন করেই রাখবেন। স্বশোভন এলে বিকেলের জলখাবার দিয়ে দিলেই এ বেলার মতো নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভাবনা হচ্ছে শর্মিলার জন্তে। কই এতদিন তো কখনো শোনেন নি দীপককুমার বাবুর কথা। ডাক্তারের কাছে তো স্বুবর্ণ ই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য এখন শর্মিলা যেন একাই যায় বলে মনে হচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। স্বুবর্ণ তো আসেও নি অনেকদিন। আচ্ছা দেখি আজ স্বশোভেন এলে খবর নিতে বলবো স্বুবর্ণের।

এই সব সাতপাঁচ ভাবনায় শর্মিলার মা রান্নাঘরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাঁটু দুটো তুলে দুহাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরে নিজের মনেই সদর দরজা পানে তাকিয়ে বসেছিলেন। শর্মিলা তো সেজেগুজে একটু ক্ষণ আগেই এই দরজা পেরিয়ে গেল। সদরদরজাটা সে ভেজিয়ে গেল কিন্তু মায়ের আর খিল দিয়ে আসতে মন চাইলো না। বসেই রইলেন তখন থেকে। একভাবে।

কড়ানাড়ার শব্দে সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। বলে উঠলেন—কে?

এই 'কে' বলাটায় কেমন যেন অস্বাভাবিক জোরে স্বর উচ্চারিত হল। শর্মিলার মা নিজেই সামলে'নিয়ে বললেন—দরজা খোলাই আছে।

সদরদরজা ঠেলে প্রবেশ করলো স্বর্ণ। শর্মিলার মা তাকে দেখেই সানন্দে বলে উঠলেন—তোমার কথাই ভাবছিলুম স্বর্ণ। বেঁচে থাকো, এসো ভেতরের ঘরে বসো।

স্বর্ণ বেশ ইতস্তত করে বললে—আজ ভাবছিলুম যে আপনাদের খবর নিতে আসবো। তবে একটু দেরি হয়ে গেল আসতে। কোচিং ক্লাস থেকে ফেরার পথে আসছি তো।

হ্যাঁ, সে তো হবেই তুমি কোচিং ক্লাসের দায়িত্বে রয়েছ। কত ছাত্রের যে উপকার তোমার দ্বারা হয় তা তো বলার নয়। কতজনের বেতন তো তুমিই জুগিয়ে যাচ্ছো বারোমাস।

—কি যে বলেন মা আপনি। এ সব কোত্থেকে শুনলেন বলুন তো?

—স্বশোভন তো তোমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তোমার মতো এমন মানুষ···

—না, না, এসব কিছু বলবেন না আপনি। আপনারা কেমন আছেন বলুন?

স্বর্ণ নিজের কথা থামিয়ে দিতে উল্টো প্রশ্ন করে বসলো যাতে শর্মিলার মা যেন আর প্রশংসাবহুল কথা না বলতে থাকেন।

শর্মিলার মা ঘরে এসে বসেছেন স্বর্ণকে নিয়ে। বললেন উত্তরে—আর আমার থাকা না থাকা। শর্মির একটা ঠিকমতো ব্যবস্থা না দেখলে দুচোখের পাতা এক করতে আর পারি না। হ্যাঁ তুমি এসে যাওয়ায় ভালোই হল।

—আপনি বাবার কাছে গিয়েছিলেন?

স্বর্ণ প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। তোমায় তো রাজি হতেই হবে। দুজনের এমন মিল আর কোনো কথা চলে কি?

—দেখুন আপনারা আপনাদের দিক থেকে ঠিকই ভাবছেন। আমি বুঝছি মা হয়ে আপনার মনের ভাবনার কথা কিন্তু মেয়ের দিকটাও তো ভাববেন।

—তার মানে? তুমি কি বলতে চাইছ? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—দেখুন আমার দিক থেকে যা অসম্ভব তা আমি সম্ভব করতে শত অনুরোধ-উপরোধেও চেষ্টা করলে হবে না। কারণ ভবিতব্য বলে একটা

কথা আমাদের সমাজে চালু আছে না, তা ঠিকই। এক সময় আমি তা কিছুমাত্র বিশ্বাস করি নি। কিন্তু কিছু না কিছু মানতেই হয়।

—এবার তুমি একটু খুলে বলো তো আমি ঠিক ঠিক তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

—দেখুন শর্মিলার মন দীপ্তেন্দুর জন্যে বেশ···

—না না, সে তো কবে চুকেবুকে গিয়েছে, তার কথা আবার কেন আসছে? সে তো তোমার উপস্থিতিতেই খবর এলো, শুনলে।

—হ্যাঁ ঠিকই, তবু একটু অপেক্ষা করুন।

—আমি এর আর কোনো প্রয়োজন দেখি না। তুমি এ কথা এত দিন পর বলতে আরম্ভ করলে। আমার শরীর কেমন করে তার দুর্ভোগের কথাটা মনে এলেই। আহা, কি কাণ্ড ঘটালো দীপ্তেন্দু। ইশ···

—আমি বলি কি আপনি এত অস্থির হবেন না। দেখি না এই মাসের মধ্যে কিছু একটা যদি না হয় তখন নতুন চিন্তা করা যাবে।

—নতুন চিন্তা! আচ্ছা তাই।

শর্মিলার মা কথা কটা বলেই কি যেন ভাবতে লাগলেন। তার পর বললেন —দেখো স্বর্ণ, আজ বিকেলে শর্মি বললে যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কোথায় যেন নিমন্ত্রণ আছে যাবে, খেয়ে ফেরার কথা সেখানে। কিছু জানো কি?

—না আমি তো কিছু জানি না। তবে আপনি কি কিছু জানতে চান?

—হ্যাঁ, তা তো চাইবোই। কি জানো বলোই না?

—তা হলে আমি যাই সেখানে। গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবো।

—তুমি আবার কষ্ট করে যাবে, সেটা কেমন হবে?

—তাতে কি আছে? আমি ঠিকই খোঁজ আনবো।

শর্মিলার মা বললে—আচ্ছা তাই।

—তা হলে এখন আসি মা।

—বেশ তাই, তবে তোমায় যে চা দেওয়া হল না। কথায় কথায় একেবারে ভুলে গিয়েছি। মাথাটা আমার কেমন যেন হয়েছে এখন। বসো বসো আমি এখনই নিয়ে আসছি।

—কি যে বলেন মা, আমি আর একদিন চাটা খাবো। আজ আসি।

—আচ্ছা তাই, আর একদিন চাটা হবে। দেখো শর্মি আবার কি যে করছে!

স্বর্ণ রায় একটু দাঁড়িয়ে বললে—শুভক্ষণকে শর্মিলা আপনার ঠিক ধরে ফেলবে আশা করে আছি।

—সেই আশাই করো স্বর্ণ।

শর্মিলার মার কথা শেষ করার আগেই উঠে সদরদরজা দিয়ে এগিয়ে চলেছে স্বর্ণ রায়।

শর্মিলার অবাক লাগলো তখন দীপককুমারের বসার ঘরে তাকে না দেখতে পেয়ে। অথচ আজ সন্ধের সময় কোনো রোগী দেখার নেই এক মাত্র তাকেই আসতে বলেছে। বলেছে অনেক কথা হবে কিন্তু বাড়িতে নয় একটা রেষ্টুরেন্টের নির্জনে। এ ভাবে তার আর ভালো লাগছে না। শর্মিলার বেশ মনে আছে দীপককুমার বলেছে যে, তার বাড়িতে বন্ধুর মা এসেছেন কাজেই বন্ধুও ঘনঘন আসে তাই একটু নিরিবিলি বসতে হবে। যেন শর্মিলা বাড়িতে খাবার না করার কথা বলে আসে। দীপককুমার তো রবিবার বিকেলের পর তার জন্যে অপেক্ষা নিয়েই থাকবে বলেছিল।

তবে কি রোগিণীকে আশ্বাস দেওয়ার ছল এটা ডাক্তারী কায়দায়। কি জানি কি ব্যাপার? ঘরে তো কেউ নেই। বাইরেও সদরদরজায় যে লোকটা বসে থাকতো সেও নেই। গেলো কোথায়? কড়া নাড়া দেবে ভাবছে শর্মিলা এমন সময় একজন ঝিকে দেখতে পেলে ভেতর বাড়ির থেকে বাইরে আসতে। শর্মিলা ভেতর বাড়িতে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে একবার ডাকলে—কে আছেন?

—কে মা? বাবু তো হাসপাতালে গেছেন। অন্যদিন আসবেন।

—হ্যাঁ, কি বলছেন?

ঝি বাইরের ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে এসে বললে তখন—বাবু হাসপাতালে গিয়েছেন।

—কেন?

—আজ স্নানের ঘরে পিছলে গিয়েছেন। খুব লেগেছে বাবুর।

—তার পর?

—তার পর মা, বাবুর বন্ধু চঞ্চলবাবুকে ডেকে ব্যবস্থা করিয়েছেন। সব সেই হাসপাতালেই গিয়েছেন।

—কোন হাসপাতালে?